যাদু-কাহিনী

মঞ্চে, মহলে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা।

এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর ভেলকিওয়ালা, মাদারি। এদের তাক লাগানো খেলাগুলোরও নানা রকম নাম—ম্যাজিক, যাদু, ভেলকি, ভানুমতীর খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘ দিন অন্তরঙ্গ বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই কিছু কিছু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

অজিত কৃষ্ণ বসু

ব্যঙ্গ ও কৌতুক রস পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) তাঁদের অন্যতম। কেবল কবি নন, গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধকার হিসাবেও সমান যশের অধিকারী ইনি। বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই এ র কলম সমান চলে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে অজিত কৃষ্ণ বসুর জন্ম হয়। এঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিল অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত ঢাকা জেলায়। পিতা শৈলেন্দ্রমোহন বসু সাহিত্য-রসিক এবং বিভিন্ন ভাষাবিদ। স্কুল জীবন থেকেই ইনি যাদুবিদ্যায় উৎসাহী। তাঁর যাদু-বিষয়ক রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি দশম শ্রেণীব ছাত্র। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের বিখ্যাত যাদু-বিষয়ক মাসিক 'দি ম্যাজিসিয়ান মান্থলি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মৌলিক যাদুক্রীড়া সম্পর্কিত প্রবন্ধ যাদুকব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। যাদুজগতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের এবং দীর্ঘকালেব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁব এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। ভারতীয় ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ এই সর্বপ্রথম। অজিত কৃষ্ণ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা আবম্ভ করে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংবাজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। বর্তমানে ইনি কলকাতার আশুতোষ কলেজেব ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রজ্ঞাপারমিতা	উপন্যাস
বাতাসী বিবি	,,
সানাই	,,
শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম	,,
পাগলা গারদের কবিতা	কবিতা
নে-তে-তেরি-তোম	,,
এক নদী বহু তরঙ্গ	,,
খামখেয়ালী ছড়া	,,
প্রফেসার হোঁদারামের ডায়েরী	কিশোর সাহিত্য
শহরতলির শয়তান	অনুবাদ

[বারট্রাণ্ড রাসেল-এর গল্পসংগ্রহ]

যাদু-কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু
[অ কৃ ব]

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২
১৩৬১

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

যাদুর কাহিনীই দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোনো কাহিনী, আর ঈশ্বরই হচ্ছেন দুনিয়ার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। তাঁরই যাদুতে অনন্ত শূন্যের বুকে সৃষ্ট হয়েছিলো বিস্ময়ে ভরা এই বিশ্ব। ঈশ্বর-সৃষ্ট বিস্ময়গুলো যুগের পর যুগ দেখতে দেখতে ক্রমে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলো মানুষের চোখ থেকে আর মন থেকে। ঈশ্বরের যাদু ভুলে মানুষ তখন মানুষের যাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করলো।

মানুষের সমাজে প্রথম যাদুকরেরা ছিলেন পুরোহিত, পূজারী, 'প্রফেট' বা গুরু-জাতীয় অ-সাধারণ ব্যক্তি। সাধারণের অনধিগত বিশেষ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ লৌকিক উপায়েই এঁরা যে-সব রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতেন, সে-সব কিছুই সাধারণ মানুষ ভীতি এবং শ্রদ্ধা-মেশানো বিস্ময়ের চোখে দেখে ভেবে নিতো এঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ঐশ্বরিক যাদু-ক্ষমতার অংশীদার। এই যাদু-করদের যাদু প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিলো মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদন নয়, অলৌকিক রহস্যময় শক্তির অভিনয়ে অভিভূত এবং বশীভূত করে সাধারণ মানুষদের ওপর আধ্যাত্মিক বা অন্যপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা। তারপর যাদুবিদ্যা ক্রমে ক্রমে অলৌকিকতার এলাকা ছাড়িয়ে চলে এসেছে লৌকিক মনোরঞ্জনের এলাকায়। যাদুবিদ্যার ইতিহাস এই ক্রমবিবর্তনেরই ইতিহাস। যাদুকরের আশ্চর্য কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা বিস্মিত হলেও তাঁকে অলৌকিক বা ভৌতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবি না, মনে মনে জানি তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে আমাদের চোখ আর মনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছেন মাত্র ; যা সত্যি সত্যি ঘটেছে (অথচ ঘটেছে বলে আমরা বুঝতে পারিনি) এবং যা চোখের সামনে ঘটতে দেখলাম বলে আমাদের মনে হয়েছে (অথচ সত্যি সত্যি ঘটেনি)—এ দুয়ে অনেক তফাৎ। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি ঠিক কোথায় সেই তফাৎটা। "নিজের চোখে দেখলাম, অবিশ্বাস করি কি করে ?" এ-ধরনের উক্তি করা যে কত বড়ো বোকামি, সেইটে বুঝতে পারি যাদুকরদের যাদুর খেলা দেখে।......

আমার দেখা প্রথম যাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'—বাংলা তর্জমায় যার মানে 'অতীন্দ্রিয়বাদী রায়'। তাঁকে প্রথম দেখলাম এক সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে রেলওয়ে

ইনস্টিটিউট হলে। তিনি ঘণ্টা দুয়েক যাদু-খেলা দেখালেন পাশ্চাত্ত্য পোশাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। বছরটা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু সেই সুদূর সন্ধ্যার স্মৃতি এমন মধুর স্বপ্নময় বিস্ময়ে ভরা যে, এখনো মন থেকে মুছে যায়নি। নয়ন-মনোহারিণী রূপসী সহকারিণী ছিলো না তাঁর, শুধু অপরূপ যাদু-প্রদর্শনের আকর্ষণে তিনি হল-শুদ্ধ সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। যে খেলাগুলো দেখিয়েছিলেন তাদের কয়েকটি হচ্ছে বিলিয়ার্ড বলের খেলা (মাল্টিপ্লায়িং বিলিয়ার্ড বল্‌স্), চাইনিজ লিংকিং রিংস্ (দশ-বারো ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কতকগুলো বড়ো রিং আলাদা আলাদা দেখিয়ে একটির ভেতর আরেকটি রহস্যজনকভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন করা), শূন্যে ভাসমান বল, মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটনের বিখ্যাত 'রাইজিং কার্ডস্' (বাঁ হাতে ধরা প্যাক থেকে পর পর কয়েকটি তাসের ধীরে ধীরে শূন্যপথ বেয়ে ডান হাতে উঠে আসা), 'এরিয়্যাল সাসপেনশন' (একটি বালিকাকে হিপ্‌নোটাইজ করে শুধু একটি খাড়া লাঠির ডগায় কনুই ভর করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা এবং তারপর ঐ লাঠিটিও সরিয়ে নিয়ে একেবারে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা), মেণ্টাল টেলিপ্যাথি বা সেকেণ্ড সাইট (দর্শকদের ভেতরে দাঁড়ানো যাদুকরের হাতে দর্শকেরা যে কোনো জিনিস দিলে মঞ্চে চোখ বাঁধা অবস্থায় সহকারীর দ্বারা সে জিনিসটির বিশদ বর্ণনা) ইত্যাদি। পর্দা ওঠবার পরই আমাদের অভিবাদন করে একটির পর একটি এমন সব তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়ে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিলেন যে, তারপর মনে হতে লাগলো এই মায়াবী লোকটি যা খুশি তাই অনায়াসে করতে পারেন, নাপোলেয়ঁর মতো এর অভিধানেও 'অসম্ভব' শব্দটি অনুপস্থিত।

যে খেলাগুলো তিনি দেখাচ্ছিলেন তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা শুধু আমার কেন—আমি তো তখন বালক মাত্র, সবে স্কুলের ছাত্রগিরি শুরু করেছি—আমার আশেপাশের বড়োদের মাথায়ও আসেনি; তাঁরা হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন। তবু কিন্তু 'রয় দি মিস্টিক'-কে অলৌকিক, ভৌতিক বা 'তান্ত্রিক' ক্ষমতার অধিকারী বলে আমার মনে হয়নি।

এর একটি কারণ হচ্ছে যাদুকরের বেশভূষা এবং যাদুপ্রদর্শনের স্টাইল সম্পূর্ণ আধুনিক, ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ। মুখে অলৌকিক রহস্যময় গাম্ভীর্যের বদলে ছিলো সকৌতুক হাসির আলো। কথায় কথায় আমাদের হাসাচ্ছেন—আমাদের আনমনা করে দিয়ে সেই ফাঁকে ফাঁকির কাজ চুপি চুপি হাসিল করে নেবার

জন্যেই বোধহয়—আর আমাদের সঙ্গে যেন আমাদেরই একজন হয়ে প্রতিটি খেলার তামাশা আমাদেরই মতো রসিয়ে-বসিয়ে উপভোগ করছেন। তিনি আমাদের ঠকিয়ে মজা পাচ্ছেন, আর আমরা ঠকে মজা পাচ্ছি ; ওঁর ঠকানো, অতএব আমাদের ঠকার মাত্রা যতো বাড়ছে, আমাদের দুপক্ষেরই মজার মাত্রাও যেন ততোই বেড়ে উঠছে। এ আবহাওয়ায় অলৌকিকতা বা ভৌতিকতার ঠাঁই কোথায়? যাদুকর ভদ্রলোকের যা কিছু গুরুগম্ভীরত্ব ছিল ঐ 'মিস্টিক' বিশেষণেই।

আরেকটি কারণ, যাদুবিদ্যার সমস্ত বিস্ময়ই যে সম্পূর্ণ 'লৌকিক' কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাদুবিদ্যায় অলৌকিক কিছু নেই, এ-জ্ঞান আগেই পেয়েছিলাম 'গ্যামাজিক' (Gamagic) নামক একটি পুরোনো বৃহদায়তন সচিত্র ক্যাটালগ গ্রন্থ থেকে। আবোল-তাবোলের 'হাঁস ছিলো সজারু, হয়ে গেলো হাঁসজারু'র মতো গ্যামাজ আর ম্যাজিক একসঙ্গে জুড়ে লণ্ডনের বিখ্যাত গ্যামাজ কোম্পানির ম্যাজিক বিভাগের ক্যাটালগটি নাম নিয়েছিল 'গ্যামাজিক'। আমার এক কাকা বিদেশ থেকে এটি নিয়ে এসেছিলেন। তার পুরোনো কাগজপত্রের ভাণ্ডার থেকেই এই অমূল্য রত্নটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। ক্যাটালগটির প্রচ্ছদপট জুড়ে ছিলো ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সেন্ট জর্জেস হলে রাজ-দম্পতির সম্মান-প্রদর্শনীতে ('রয়্যাল কম্যাণ্ড পারফর্ম্যান্স') যাদু-প্রদর্শনরত ইংলণ্ডের সেরা যাদুকর ডেভিড ডেভান্টের পূর্ণাঙ্গ ফোটোগ্রাফ এবং ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে ছিল ছোট মাঝারি আর বড় নানা ধরনের যাদুক্রীড়ার বিবরণসহ বিভিন্ন যাদু-দ্রব্যাদির এবং যন্ত্রপাতির মূল্যতালিকা। ঠাণ্ডা ছাপার হরফে রাগ-রাগিণীর রূপবর্ণনা পড়ে তারপর গুণী সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে তাদের সুন্দর রূপায়ণ শুনলে যেমন হয়, 'গ্যামাজিক' পড়ার পর ছাপার হরফে বর্ণিত একাধিক যাদুর খেলাকে গুণী যাদুকর 'রয় দি মিস্টিকে'র হাতে রূপ নিতে দেখে আমার তেমনি অবস্থা হলো। যাদুবিদ্যাকে একটি জীবন্ত শিল্পরূপে ভালবেসে ফেললাম।

'রয় দি মিস্টিক'-এর বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে এবং 'গ্যামাজিক'এর সচিত্র পৃষ্ঠাগুলোর মাধ্যমে ডেভিড ডেভান্ট, হাউয়ার্ড থার্সটন, হ্যারী হুডিনি, 'চুং লিং সু', 'লাফায়েৎ', কার্ল হার্টজ, ওকিতো, নিকোলা, হারম্যান, নেলসন ডাউনস, প্রমুখ পাশ্চাত্য যাদু-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—যদিও সে পরিচয় নিতান্তই পরোক্ষ এবং একতরফা—আমারও প্রাণে শখ জেগেছিল

অন্তত একজন যাদু-জোনাকি হবার। তাই ডাকযোগে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত হলাম পূর্বোল্লিখিত গ্যামাজ কোম্পানীর যাদুবিভাগের সঙ্গে এবং পরে লণ্ডনের আরো দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—হ্যামলি ব্রাদার্স এবং ড্যাভেনপোর্ট লিমিটেড—যাদের ছিল শুধু যাদু নিয়েই কারবার। যাদু-সাহিত্যে এবং যাদু-সংক্রান্ত অনেক কিছুতে আমার পড়ার ঘর ভরে উঠতে লাগলো। তারপর চলে গেলাম লণ্ডন থেকে লস এঞ্জেলস (কালিফোর্নিযা), সিনেমাতীর্থ হলিউডের কাছাকাছি থেয়ারের বিখ্যাত যাদুতীর্থে, অর্থাৎ তখনকার দিনের পৃথিবীর বৃহত্তম যাদু-কারখানা থেয়ার্স ম্যাজিক স্টুডিওতে (অবশ্য ডাকযোগে)। তার সচিত্র ক্যাটালগ-খানার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিলো প্রায় দেড়শো—ক্ষুদ্রতম 'পকেট ট্রিক' থেকে বৃহত্তম 'স্টেজ ইলিউশন'এর বিবরণ এবং মূল্যতালিকা ছিলো তাতে। এর ওপর থেয়ারের স্টুডিও থেকে মাসে অন্তত একটি করে চমৎকার সচিত্র বুলেটিন পেতে লাগলাম, যাতে থাকতো যাদু-শিল্পে এবং যাদু-সাহিত্যে নূতন সংযোজনের বিবরণ। থেয়ারের ঐ যাদু বুলেটিনগুলো দেখে যাদু-দুনিয়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে ওয়াকিবহাল থাকা যেতো। এ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প এবং ব্যবসারূপে যাদুবিদ্যার যে বিরাট সমাদর এবং প্রসার, তার তুলনায় আমাদের দেশে প্রায় কিছুই নয়।

লণ্ডনের 'ম্যাজিশিয়ান' নামক যাদু-বিষয়ক মাসিকপত্রে (বিখ্যাত গ্যামাজ লিমিটেডের যাদুবিভাগ থেকে প্রকাশিত) সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সংখ্যায় এবং তার পরে যাদুসংক্রান্ত আমার কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। তাতে আমার পরিকল্পিত কয়েকটি যাদুর খেলার কৌশল ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম। আমার সেই লেখাগুলো বিশ্বের যাদুজগতে যুগান্তর এনেছিলো বলে খবর পাইনি, কিন্তু আজও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি লণ্ডনের বিশিষ্ট যাদু-মাসিকে একজন বাঙালী যাদু-শৌখিনের লেখা হিসেবেই হয়তো আমার সেই লেখা বাংলার অতুলনীয় যাদুকর রাজা বোস দেখেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন, এবং কতকটা হয়তো এরই ফলে তাঁর মৃত্যুর (১৯৪৮) পূর্বের কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তরুণ বয়সে বিলেতে চামড়ার কাজ শিখতে গিয়ে সেখানে যাদুর চর্চা এবং সমাদর দেখে উৎসাহিত হয়ে লেদার এক্সপার্ট হবার রাস্তা ছেড়ে তিনি বেছে নিলেন যাদুর রাস্তা। অবশ্য দেশে থাকতেই যাদুবিদ্যা কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। পেশাদার যাদুকররূপে বছর কয়েক

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় ঘুরে-ঘুরে যাদু প্রদর্শন করে তারপর বাঙলার ছেলে বাঙলায় ফিরে আসেন এবং বাকি জীবনটা যাদুর চর্চাতেই কাটিয়ে দেন। জীবনের শেষ কযেক বছর অবশ্য তিনি পেশাদারি যাদু-প্রদর্শন থেকে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন শারীরিক এবং অন্যান্য কারণে। বাঙলার যাদুচর্চার ইতিহাসে যাদুকর পি. সি. সরকারের আগে বাঙলার যাদু-জগতে জনপ্রিয়তম দুটি নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী আর রাজা বোস। এঁদের দুজনের স্টাইল বা খেলা দেখাবার ভঙ্গি ছিলো আলাদা, এবং নিজ নিজ স্টাইলে এঁরা দুজনই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঁদের সমসাময়িক আরেকটি জনপ্রিয় নাম প্রোফেসর বিমল গুপ্ত (পুরো পদবি দাশগুপ্ত)। ইনি শুধু সুদক্ষ যাদুকর ছিলেন তাই নয়, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের বিশিষ্ট গায়ক এবং বাঙলার অন্যতম প্রধান কৌতুকশিল্পী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিলো অসামান্য। রাজা বোসের যাদু-প্রদর্শন, চলাফেরা এবং কথার গতি ছিলো দ্রুত—বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হোরেস গোল্‌ডিনের (Horace Goldin) মত ; প্রোঃ গুপ্তের এই তিনটির গতিই ছিল শান্ত ধীর—অবিস্মরণীয় ইংরাজ যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্টের (David Devant) মতো। যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে এঁর সংস্পর্শে এসে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন বাঙলার দুজন বিশিষ্ট যাদুকর—অশোক রায় (Osak Rae) এবং বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী (Becaire)।

যাদুকর রাজা বোসের সঙ্গে যাদু-সম্পর্কিত আলোচনার সময তাঁর মুখে তাঁর যাদু-জীবনের কিছু বিচিত্র কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যাদুকর-রূপে দেশে-বিদেশে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি 'যাদুকরের স্মৃতি-কথা' লিখতে, যেমন লিখে গেছেন ডেভিড ডেভাণ্ট, চার্লস বারট্রাম, হাউয়ার্ড থার্স টন-প্রমুখ বিখ্যাত বিদেশী যাদুকরেরা। সাহিত্য রচনায় তিনি তাঁর অক্ষমতা জানালে আমি বললাম, "আপনি শুধু খসড়া আকারে আমাকে মালমশলা যোগান। তাকে 'সাহিত্য' রূপ দেবার ভার আমি নেবো"। তিনি সানন্দে রাজী হযে পৃষ্ঠাকয়েক খসড়া তৈরি করলেন, আমাকে দেখালেন। বললাম, "চমৎকার হচ্ছে। এভাবেই খসড়া করে যান"। কিন্তু খসড়া বেশি দূর অগ্রসর হবার আগেই একদিন মৃত্যু এসে হঠাৎ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। তাঁকে দিয়ে স্মৃতিকথা লেখাবার কথাটা যে আমার আরও আগে মাথায় আসেনি, এ দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না। বাঙলার স্মৃতি-সাহিত্য একটি বিচিত্র অসাধারণ গ্রন্থ থেকে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত

থেকে গেলো। তাঁর মুখে একাধিক বিচিত্র কাহিনী যা শুনেছি তা লিখে রাখবো, কিন্তু তিনি যে-সব কাহিনী বলে যেতে পারেননি, সেগুলো তা কোনোদিনই আর বলা হবে না।

তাঁর মুখ থেকে শোনা একটি কাহিনী বিশেষ করে মনে পড়ছে। কোনো একটি থিয়েটারে তাঁর যাদু-প্রদর্শন কিছুদিন ধরে চলছে। তিনি লক্ষ্য করলেন সামনের সারিতে একজন ভদ্রলোক চোখে রঙীন চশমা পরে প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে ঠিক একই আসনে চুপচাপ বসে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যাদুকরের কৌতূহল হলো। তিনি একটি তাসের প্যাক পাখার মতো করে ছড়িয়ে ধরে বললেন, "এর ভেতর থেকে যে কোনো একটি তাস দেখে মনে রাখবেন কি" ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "দুঃখিত। সে ক্ষমতা আমার নেই"

যাদুকর শুধালেন "সে কি ? আপনি মনে রাখতে পারেন না" ?

ভদ্রলোক বললেন, "আমি চোখে দেখতে পাইনে। আমি সম্পূর্ণ অন্ধ"।

যাদুকর বিস্মিত। তাঁর মনে নীরব প্রশ্ন জাগল, "তবে রোজ আসেন কেন" ?

বোধ করি তাঁর নীরব প্রশ্ন মনে মনে শুনতে পেয়েই অন্ধ ভদ্রলোক বললেন, "কিছুদিন আগেও আমি চোখে দেখতাম। তখন আপনার যাদু দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আমার প্রিয় যাদুকর। এখন আমি অন্ধ। তবু আপনার যাদু-প্রদর্শনীতে আসি, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দ পাই। চোখে যা দেখিনে, তা অতীতে দেখার স্মৃতির আলোয় মনের চোখে দেখি"।

এ কাহিনী যখন আমাকে শোনান, তখন সজল হয়ে উঠেছিলো যাদুকরের দুটি চোখ।...

কাহিনীর কথায় যখন এসে পড়া গেলো, তখন বলি, যাদু-রহস্যের চাইতে যাদু-কাহিনীই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। প্রথমে অবশ্য রহস্যের দিকটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, জানতে প্রবল আগ্রহ হয়েছিল একটা আস্ত মানুষ কেমন করে শূন্যে ভাসে, খালি টুপি থেকে জিনিসের পর জিনিস বার করে যাদুকর স্টেজ ভরে ফেলেন কি করে, চোখের পলকে যাদুকর কি করে বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে যান......অর্থাৎ যাদুকরেরা নানা রকমের অসাধ্য কি কৌশলে সাধন করেন। দীর্ঘদিনের চর্চায় যাদুর অনেক রহস্য জেনেছি, ফলে রহস্য-না-জানা বিস্ময়ের যে আনন্দ সেটি অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু যা এতোটুকুও হারাইনি, কখনো হারাবোও না, সেটি হচ্ছে বিস্ময়-

সৃষ্টির এই অসাধারণ আকর্ষণীয় পেশা এবং নেশা যাঁরা জীবনে একান্ত করে গ্রহণ করেছিলেন এবং করে রয়েছেন, তাঁদের যাদু-জীবন কাহিনী, তাঁদের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁদের ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, হাসি-কান্নার কাহিনী সম্বন্ধে পরম কৌতূহল। যাদু-শিল্পের আড়ালে শিল্পীর অন্তরঙ্গ মানবিক পরিচয় পেতে এবং পরিচয় দিতে আমার আগ্রহের অন্ত নেই।

ছেলেবেলায় একবার পূর্ব বাঙলার একটি গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' মনে করিয়ে দেবার মতো। তখন যে চোখ ছিলো সে চোখ আর নেই, তখন যে মন ছিলো সে মনও আজ নেই, শুধু রয়ে গেছে তখনকার অনেক স্মৃতি—কিছু ঝাপসা, কিছু পরিষ্কার। সেই গ্রামে যাদের দেখেছিলাম তাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে সেখানকার শিব-মন্দিরের সন্ন্যাসী বাবার কথা। মন্দিরের ধারে বট গাছের তলায় একটা বেড়ার ঘরে থাকতেন তিনি এবং তাঁর একজন চেলা। গুরুর ঐকান্তিক সেবা ছাড়া চেলাটির জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্য বা বাসনা ছিল বলে মনে হতো না। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী বাবা একবার নিদারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে সম্পূর্ণ একা তাঁর সেবা করে চেলাটি তাঁকে সারিয়ে তুলেছিল, অপর কাউকে বসন্ত-আক্রান্ত গুরুদেবের সেবায় লাগতে দেয়নি। সম্ভবত অপর কারও জীবন পাছে বিপন্ন হয় —বসন্ত ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—সেইজন্য, অথবা হয়তো গুরুদেবের সেবার পুণ্য আর গৌরবে অপর কেউ এসে ভাগ বসাবে, এ কল্পনাও তার সয়নি। যাই হোক, মায়ের দয়া থেকে সন্ন্যাসী বাবাকে সে সারিয়ে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, গুরুর বসন্তের ছোঁয়াচে চেলার বসন্ত হয়নি, একটি ফুসকুড়িও দেখা দেয়নি তার গায়ে। এতে গ্রামশুদ্ধ সবাই বিস্মিত হয়েছিল, এবং এ-বিষয়ে গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছিলেন যে, অমন সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত বসন্ত রোগীর সেবা করেও যে চেলাটি বসন্তর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকেছিল, এ সন্ন্যাসী বাবারই অলৌকিক শক্তির ফল; আসলে ঐ চেলার ওপরই মা দয়া করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক ক্ষমতা বলে তা টের পেয়ে তেমনি অলৌকিক ক্ষমতা বলেই মায়ের দয়াকে নিজের দেহে টেনে নিয়েছিলেন শিষ্যকে বাঁচাবার জন্য। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের একটিমাত্র নামই গ্রামের লোকের জানা ছিলো, সে নাম.

সন্ন্যাসী বাবা। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই নামেই ডাকতো তাঁকে, এই নামেই চিনতো। চেলাটির নাম ছিলো শিবদাস। এ নাম পিতৃদত্ত নয়, গুরু-দত্ত। সন্ন্যাসী বাবা নাকি বলেছিলেন, "তুই শিবের দাস, তাই তোর নাম হলো শিবদাস"। চেলা বলেছিল, "গুরুদেব, আমি আর কাউকে চিনিনে, আমি শুধু আপনারই দাস, যেমন আছে কবীরের দোহায় :

'গুরু গোবিন্দ দৌউ খড়ে, কাকে লাগোঁ পাঁয।
বলিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিযো বতায।"

অর্থাৎ "গুরু এবং গোবিন্দ দুজন সামনে খাড়া, এখন কার পায়ে আমি প্রণাম করবো ? হে গুরু, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনিই গোবিন্দকে লাভ করবার পথ আমাকে বাতলে দিয়েছেন, আপনার কৃপা ছাড়া এ পথ আমি কিছুতেই পেতাম না। সুতরাং প্রণাম আমি আপনাকেই করবো।'

সন্ন্যাসী বাবা হেসে বলেছিলেন, "ওরে ব্যাটা, তোর গুরুভক্তি সাচ্চা তা আমি জানি। তোর গুরুই তোর নাম দিচ্ছে শিবদাস"। সুতরাং শিবদাস নামই শিরোধার্য করে নিয়েছিল সেই চেলাটি।

আমি গ্রামে যেদিন পা দিয়েছিলাম সেদিনই এ-সব কথা শুনেছিলাম, সন্ন্যাসী বাবার সম্বন্ধে আরো নানারকম লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে। শুনেছিলাম এ গ্রামে সন্ন্যাসী বাবা যখন প্রথম এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন বটগাছের তলায়, সঙ্গে তাঁর এই চেলা শিবদাস, এবং মুখে মাঝে মাঝে উচ্চারিত "ব্যোম ভোলা শিব মহেশ্বর" মন্ত্র, তখন তাতে সামান্য কয়েকজন মাত্র উৎসাহিত হয়েছিলেন ; তাও সাধারণভাবে, তেমন জোরালোভাবে নয়। তারপর একদিন এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটলো। গ্রামের অনেকের চোখের সামনে একদিন সন্ন্যাসী বাবার অলৌকিক শক্তির যাদুতে এক ডজন তামাক ধরাবার টিকে পরিণত হয়ে গেলো এক ডজন খাঁটি বাতাসায়। উপস্থিতদের ভেতর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিজ মুখে খেয়ে দেখলেন সেগুলো সত্যিই বাতাসা, চোখের ভুল নয়। খবরটা জঙ্গলে দাবানলের মত গ্রামময় দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল : সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, টিকেকে মন্ত্র-বলে বাতাসা বানিয়ে দিয়েছেন !

এতোদিনে যা হয়নি, একদিনের ঐ যাদুর খেলায় তাই হয়ে গেলো। দ্রুতবেগে সারা গ্রামের পরমপূজ্য হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী বাবা, ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। গ্রামের অনেকে এসে সন্ন্যাসী বাবার পায়ে ধরে পড়লো, আশ্রয় দিতেই

হবে শ্রীচরণে। আশ্রয় মানে আধ্যাত্মিক আশ্রয়, মন্ত্র-দীক্ষা। ভক্তের পর ভক্ত নাছোড়বান্দা। তাদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে দীক্ষা দিতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী বাবা। মন্ত্র হয়তো অন্য কিছু নয়, প্রত্যেক শিষ্য বা শিষ্যাকেই হয়তো ঐ একটি মন্ত্র তিনি জপ করতে উপদেশ দিতেন : "ব্যোম-ভোলা শিব মহেশ্বর।"

আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সন্ন্যাসী বাবাকে। যে-বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, তার পাশের বাড়ি সন্ন্যাসী বাবার শিষ্যবাড়ি। বাড়ির বড়ো কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গ্রামের অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তার এসে জিভ দেখে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, পেটে টোকা মেরে আর নাড়ি টিপে প্রেসক্রিপশন করে গেছেন; তাঁর ডিস্পেনসারি থেকে ছয় দাগ মিক্‌সচার আনিয়ে দু'দাগ খাওয়ানোও হয়ে গেছে, কিন্তু কর্তা তবু অশান্ত। তাঁর দেহ যতো ছটফট করছে, মন ছটফট করছে তার চাইতে বেশি। তাঁর মন বলছে এ-যাত্রা অ্যালোপ্যাথি-ফ্যালোপ্যাথির কর্ম নয়, ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এ ফাড়া কাটিয়ে উঠতে হলে একমাত্র ভরসা গুরু-কৃপা এবং তাঁর মন যা বলছে সেইটে যথাসাধ্য জোর গলায় মুখে বলে তিনি বাড়ি-শুদ্ধ সবাইকে শোনাচ্ছেন।

কর্তার কথা শুনে গৃহিণী বিশেষ উদ্বিগ্ন। কর্তার মতো তিনিও গুরুভক্ত। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে কিচ্ছু হবে না, কর্তার এই কথাটা শেলের মতো বিঁধছে অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তারের বুকে। এ গাঁয়ের সবাই তাঁকে বলে ধন্বন্তরী—না বলে উপায়ও নেই, কারণ এ গাঁয়ে তিনিই একমাত্র ডাক্তার—তাঁর ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এমন কথা এ গাঁয়ের আর কেউ কখনো বলেনি। এ কথা বলে ক যেন একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মেরেছেন কৃতান্ত ডাক্তারের মুখের ওপর। কৃতান্ত ডাক্তারও তাই পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে গেছেন, তিনি যে মিক্‌সচারটি দিয়েছেন সেটি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই, তাতে যদি 'কিচ্ছু' না হয় তা হলে তিনি দু হাতে চুড়ি পরবেন।

কর্তা বলেছেন "গিন্নি, আমি টেঁসে গেলে তারপর কেতান্ত ডাক্তার দু হাতে চুড়ি পরলেই বা তোমার কি ফায়দা" ? গিন্নি ভেবে দেখেছেন কথাটা কর্তা মন্দ বলেননি।

কর্তার বড়ো ছেলে উচ্চশিক্ষিত, অর্থাৎ ম্যাট্রিক ফেল।

উচ্চশিক্ষা লাভ করে তার একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছে। সন্ন্যাসী বাবার ওপর তার ভক্তির অভাব নেই। আধ্যাত্মিক ব্যামোতে তাঁর আধ্যাত্মিক

প্রভাব ফলপ্রদ হবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কিন্তু দেহের ব্যামোতে অ্যালো-প্যাথির চাইতে সন্ন্যাসী বাবার অধ্যাত্মোপ্যাথি বেশি কার্যকরী হবে এটা তার ম্যাট্রিক-ফেল মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পিতৃভক্তিরও অভাব নেই তার, কিন্তু পিতৃদেবের এই অ্যালোপ্যাথি-তাচ্ছিল্য এবং "গুরু কৃপাহি কেবলম্" তার ভালো লাগছে না। মা বলেছিলেন, "খোকা, আমার মনে হয় কেতান্ত ডাক্তারের মিক্‌চার বন্ধ করে বরং গুরুদেবের চরণামৃত—" আর খোকা মাকে প্রায় ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিলো, গুরুদেবকে খবর পাঠাতে রাজী হয়নি।

খোকা বিকেলবেলা কৃতান্ত মিক্‌সচারের তৃতীয় দাগ খাওয়াতে গেলো কর্তাকে। বড়ো ছেলের হাতে কর্তা তৃতীয় দাগ খেলেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, "এ ওষুধে কিচ্ছু হবে না। গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব"!

বড়ো ছেলে কিছুক্ষণ তৃতীয় দাগের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারপর বললে, "এখন একটু ভালো বোধ করছো তো বাবা"? কৃতান্ত ডাক্তার জোর গলায় বলে গেছেন, তিন দাগ ওষুধ খাওয়ার পর কর্তা যদি প্রচুর আরাম বোধ না করেন তা হলে মেটিরিয়া মেডিকা মিথ্যে, ফার্মাকোপিয়া মিথ্যে।

কর্তা অবসন্ন হতাশ-ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বললেন, "ভালো নয়, ভালো নয়, একেবারে ভালো নয়। অ্যালোপ্যাথির বাবাও এখন—কিছু করতে পারবে না। এখন শুধু—গুরু কৃপাহি কেবলম্! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু"।

এমন সময় অলৌকিক ব্যাপার। বড়ো কর্তা তৃতীয়বার "জয় গুরু" উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জলদ-গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হলো, "ব্যোম ভোলা শিব মহেশ্বর। ব্যোম ব্যোম ব্যোম"!

চমকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখা গেল দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী। রোগশয়ান বড়ো কর্তা বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "গুরুদেব! গুরুদেব! গুরুদেব! ভক্তের ডাক আপনি শুনতে পেয়েছেন"!

গুরুদেব অর্থাৎ সন্ন্যাসী বাবা স্নিগ্ধ প্রশান্ত-কণ্ঠে বললেন, "পেয়েছি"।

শুনে আমার নাবালক মন সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বড়ো কর্তার বাড়ি থেকে সন্ন্যাসী বাবার আস্তানা বেশ কিছুটা দূর। রোগশয়ান বড়ো কর্তার ডাক অতো দূর থেকে কি করে তিনি শুনতে পেলেন, আর শুনতে

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতোটা পথ পেরিয়ে কি করে এসে হাজির হলেন, তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।

মনে হলো বড়ো কর্তার বড়ো ছেলেও বিস্মিত হযেছে; অন্তত বিব্রত তো বটেই।

আবদেরে ছেলে তার আবদার-সহিষ্ণু বাপকে দেখে যেমন করে থাকে, অনেকটা তেমনি করে বড়ো কর্তা কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললেন "আমি আর বাঁচবো না। এ-যাত্রা আমি বাঁচবো না গুরুদেব"।

চৌকাঠ পিছনে ফেলে রোগীর শয্যার দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবা। দুই চোখে আশ্চর্য করুণা-মধুর দৃষ্টি। মুখে অতুলনীয় হাসি। বললেন, "আরো অনেকদিন বাঁচবি"।

বড়ো কর্তা বললেন, "যদি আপনি দয়া করে বাঁচান, গুরুদেব"।

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, "বাঁচাবো"।

"কিন্তু গুরুদেব—" বললেন বড়ো কর্তা।

"কিন্তু নয়," বললেন সন্ন্যাসী বাবা, "বাঁচবি"।

বড়ো কর্তা বললেন, "গুরুদেব, আর খাবো না কেতান্ত ডাক্তারের ঐ মিক্স্চার"।

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, "আলবৎ খাবি"। শুনে খুশি হযে উঠলো কর্তার বড়ো ছেলে। কারণ গুরুদেবের হুকুম বাবা তামিল না করে পারবেন না।

বড়ো কর্তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে অভয় দিয়ে চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা। যাবার পথে বড়ো গিন্নি একটি পাত্রে জল নিয়ে সন্ন্যাসী বাবার ডান পায়ের কাছে ধরে প্রার্থনা জানালেন, "শ্রীচরণের বুড়ো আঙুলটা জলে একটু ডোবান বাবা"।

ডোবালেন সন্ন্যাসী বাবা। সবটা জল চরণামৃত হয়ে গেল। চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা।

কর্তাকে এক চামচ চরণামৃত সেবন করিযে দিলেন গিন্নি। তারপর দুদিনে পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেন বড়ো কর্তা। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কৃতান্ত ডাক্তার বুক ফুলিযে বললেন, "বলেছিলাম না, ঐ মিক্স্চার যদি মোক্ষম না হয় তা হলে দু-হাতে চুড়ি পরবো"?

বড়ো কর্তার ম্যাটিক-ফেল বড়ো ছেলেও কৃতান্ত ডাক্তারের কৃতিত্বে কৃতজ্ঞ

এবং মুগ্ধ। কিন্তু বাড়ির গিন্নিমার নিশ্চিত বিশ্বাস কর্তাকে সারিয়ে তোলার পুরো কৃতিত্ব যদি কেউ দাবি করতে পারে তো সে সন্ন্যাসী বাবার চরণামৃত।

কর্তা বললেন, "ঐ যে গুরুদেব বলেছিলেন 'বাঁচবি', ব্যস, ঐতেই যমের মুখে লাথি। ওঁর শ্রীমুখের বাণী তো মিথ্যে হবার নয়। চরণামৃতটা হলো তারপর উপলক্ষ মাত্র। তবে হ্যাঁ—চরণামৃত খেয়েই এতো তাড়াতাড়ি সেরে উঠলুম বটে"।

গিন্নি বললেন, "আমার তো মনে হয় এ গাঁয়ে বাবা থাকতে কেতান্ত ডাক্তারের কোনো দরকারই নেই। বাবার চরণাম্মেত খেলেই সব ব্যামো ভালো হয়ে যায়"।

কর্তা বললেন, "গুরুদেব রাজী হবেন না। জানো তো ওঁর কি-রকম দয়ার শরীর? দেখলে তো আমায় জোর হুকুম করে কেতান্ত ডাক্তারের মিক্‌স্‌চার পুরো খাইয়ে ছাড়লেন? নইলে কেতান্ত ডাক্তার খাবে কি"?

আজ মনে হচ্ছে বড়ো কর্তা যে অতো তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছিলেন তার মূলে কৃতান্ত ডাক্তারের ওষুধের গুণ থাকা অসম্ভব নয়। অথবা ওটা হয়তো বিশ্বাসের ফলে আরোগ্যের (ইংরাজিতে যাকে বলে 'ফেইথ কিওর') একটি উদাহরণ। কিংবা হয়তো অসুখ ঠিক ঐ সময় এমনিতেই সারতো, শুধু ঐ যোগাযোগের ফলে 'ঝড়ে কাক মরলো, আর ফকিরের কেরামত বাড়লো'।

কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা কি করে শুনতে পেয়েছিলেন কর্তার ডাক? আর কি করে অতো তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডাকের মুখোমুখি? আমার মনে হয় গিন্নিই গোপনে তার অনেকক্ষণ আগে সন্ন্যাসী বাবাকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, কর্তাকে বা বড়ো ছেলেকে না জানিয়ে।...

পাশের বাড়িতে সেই প্রথম দেখার পর আরো কয়েকবার সন্ন্যাসী বাবাকে দেখেছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনেছিলাম, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের এবং নিঃস্বার্থ মহত্ত্বেরও অনেক প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং আদর্শে সেই গ্রামের বহু উন্নতি, বহু উপকার হয়েছিলো। তিনি 'মহাপুরুষ' ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু মহৎ লোক ছিলেন সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি সেই গ্রাম থেকে ফিরে আসবার বছর-কয়েক পর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। সামান্য কয়েকটা দিন তাঁকে দেখেছিলাম, তবু এতো বছর পরেও আমার স্মৃতি থেকে তিনি মুছে যাননি। তাঁর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে করে কৌতুক বোধ করি যে, তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছিল এই

একটি পরিচয় যে, তিনি টিকেকে বাতাসা বানাবার যাদু জানেন। তাঁর পসারের (পসার কথাটা এখানে শ্রেষ্ঠতম অর্থে ব্যবহার করছি) পত্তন করে দিয়েছিল একটি সাধারণ যাদু বা ভোজবাজির খেলা, যার ভেতর অলৌকিক কিছুই ছিলো না। অথবা হয়তো যে সময়ে যে পরিবেশে যে আবহাওয়ায় তিনি টিকেকে বাতাসায় পরিণত করেছিলেন, তাতে বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে—সাধারণ লৌকিক যাদুর খেলাকেই অসাধারণ, অলৌকিক যাদু বলে মনে হয়েছিল সবার। সন্ন্যাসী বাবা কোনকালে হয়তো শখ করে যাদুর খেলা দুটো-চারটে শিখেছিলেন, আমরা বিদেশী ভাষা থেকে ধার করে আজকাল চলতি কথায় যাকে 'ম্যাজিক' বলি। হয়তো তিনি একদিন (অথবা এক রাতে) তামাশা করে একটি টিকেকে বাতাসা বানিয়েছিলেন, তখন হয়তো ভাবতেও পারেননি তাঁর অলৌকিক (?) শক্তির ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল অমন সুদূরপ্রসারী হবে। অর্থাৎ কৌতুকছলে যে হাত-সাফাই-এর খেলা দেখিয়েছিলেন, তাকে নিছক কৌতুকের ব্যাপার মনে না করে সবাই ব্যাপারটাকে অমন 'সিরিয়াস'ভাবে নেবে তা তিনি ভাবেননি।

আমার অনুমান (অর্থাৎ 'হয়তো') কিন্তু এখানেই থেমে না থেকে আর একটু দূরে এগিয়ে যায়। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী বাবা যখন দেখলেন তাঁর ঐ নিতান্ত লৌকিক যাদুর খেলাটিকেই গ্রামের লোকেরা অকৃত্রিম অলৌকিক যাদু বলে নিঃসন্দেহে পরম শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়ে মুগ্ধ হয়েছে, তখন ভাবলেন সাধুতা করে রহস্যটি ভেদ করে দিয়ে তাদের প্রিয় ভুলটিকে ভেঙে দেওয়াটা সহৃদয়তার, সুবুদ্ধির বা সুবিবেচনার কাজ হবে না। নিজের এই ফাঁকির খেলাটাকে নিজেই ফাঁক বলে ধরিয়ে দিলে তারপর এরা তাঁর সব খাঁটি জিনিসগুলোকেও ফাঁকি, মেকি বা ধাপ্পা বলে মনে করবে, নির্ভেজাল সদুপদেশ বা হিতোপদেশ দিলেও ভাববে এর ভেতর কোথাও মস্ত ফাঁকি বা ফাঁক লুকিয়ে আছে। সেই ভয়েই—এবং এ-ভয়টা কিছু অস্বাভাবিক বা অনুচিতও নয়—সন্ন্যাসী বাবা এ ব্যাপারে মুখ খোলার বাসনা জোর করেই চেপে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বিলেতের একটি গ্রামের গির্জার একজন সহৃদয় পাদরির কাহিনী। পাদরিটি ভোরাই বা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে মাঝে মাঝে গরিব মধ্যবিত্ত বাড়িতে হঠাৎ হানা দিতেন। তাঁর হাতে থাকতো ভ্রমণ করবার লাঠি, যাকে বলে 'ওয়াকিং স্টিক'। উনুনের ওপর চাপানো শূন্য পাত্রে পাদরি সাহেব তাঁর লাঠির ডগাটি ঢুকিয়ে পাত্রের ওপর নাড়তে থাকতেন। কিছুক্ষণ বাদে দেখা

যেতো পাত্রের ওপর যেন যাত্নুমন্ত্রে ডিমের একটি ওমলেট তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ির লোকদের বিস্ময়ের সীমা থাকতো না, বিশেষ করে সেই যাত্নু ওমলেট যখন তারা সত্যি-সত্যি খেয়ে দেখতেন।

এ ব্যাপারের গোপন রহস্যটুকু এই যে, পাদরি সাহেবের লাঠিটি ছিলো ফাঁপা, এবং নীচের মুখটি খোলা। সেই খোলা মুখ দিয়ে তিনি ফাঁপা লাঠির ভেতরে আগে থেকেই ভরে রাখতেন বেশ পুরুষ্টু একটি ওমলেট বানাতে যা যা দরকার। তারপর মুখটি আটকে দেওয়া হতো মোম দিয়ে, যেন ফাঁপা লাঠির ভেতরে লুকানো জিনিস যথাসময়ের আগেই বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে।

যথাসময়ে গরম পাত্রের সংস্পর্শে এসে লাঠির ডগার মোম গলে গিয়ে ভেতর থেকে ওমলেট তৈরির জিনিসগুলো পাত্রের ওপর এসে পড়তো এবং ওমলেট তৈরি হতো। এমনিতেই তাঁর মহৎ চরিত্রের জন্য তিনি গ্রামের সবারই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার ওপর তাঁর এই অলৌকিক (?) ওমলেট তৈরির যাত্নুতে সবাই আরো মুগ্ধ হয়েছিল। পাদরি সাহেবের পসারও—বলাই হয়তো বাহুল্য—অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

আধ্যাত্মিক ধর্মোপদেষ্টারাই বলেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মার উৎকর্ষ বা চরিত্রের মহত্ত্বই প্রধান কথা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ নিম্নস্তরের 'বুজরুকি' মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে ধর্ম বা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারে অলৌকিক (?) যাত্নু কম কাজ করেনি। মানুষ বরাবরই—সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক—'মিরাক্‌ল্'-এর মহাভক্ত। সাধারণ বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে যা অসম্ভব, তাকেই অলৌকিক উপায়ে সম্ভব হতে দেখলে মানুষের মন রোমহর্ষণের আনন্দে আত্মহারা হয়। মহত্ত্বের চাইতে অলৌকিক ক্ষমতার মর্যাদা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক, অনে—ক বেশি। অথবা সোজা কথায়, সাধারণ মানুষের কাছে খাঁটি মহত্ত্ব বা উৎকর্ষের চাইতে যাত্নুর দাম বেশি। মানুষের মন থেকে ম্যাজিকের এই মোহ কোনোদিন দূর হবে কি?

তাই ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম-প্রচারক এবং গুরুদের জীবনে অলৌকিক যাত্নুর বা 'মিরাক্‌ল্'-এর প্রাচুর্য। মানুষ যখন নানারকম অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলো, প্রকৃতির অনেক সাধারণ নিয়ম বা তথ্য তখন ছিলো অসাধারণ রহস্যময়, বিজ্ঞান তখনও অনগ্রসর, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোবৃত্তি অবৈজ্ঞানিক। তাই

যাতে অলৌকিক যাদু বা 'মিরাক্‌ল্‌' নেই তাতে সাধারণ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা হতো না। এই কারণেই ধর্ম প্রতিষ্ঠায় বা প্রচারে যাদুর অমন প্রাধান্য ছিলো।

এখানে ব্র্যাকেটে একটি কথা বলি।

(বর্তমান যুগেও দেখা যায়, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুরুর ভক্ত-শিষ্যেরা তাঁদের নিজ নিজ গুরুর জন্মকেও অলৌকিক যাদু-মাহাত্ম্যে মণ্ডিত বলে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর। আমরা সাধারণ মানুষ যেভাবে পুরুষ ও নারীর মিলনে জন্মগ্রহণ করি, এই মহাপুরুষদের জন্ম—তাঁদের ভক্ত-শিষ্যদের মতে—সেভাবে হয়নি। এই মনোবৃত্তির মূলে সূক্ষ্মভাবে আমাদের অবচেতন মনের যাদু-প্রীতিই কাজ করছে না কি? আমরা সাধারণ গড্ডলিকা-প্রবাহের মানুষ কি লজিকের চাইতে ম্যাজিকের দ্বারাই বেশি অভিভূত হই না?)

'ম্যাজিক' বা যাদু-বিদ্যার ইতিহাসের গোড়ার দিকে ছিলো বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থা, মানুষের সমাজ মগ্ন ছিলো অজ্ঞানের অন্ধকারে, আর তারই ফলে সাধারণ মনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। (এখানে আবার একটা কথা ব্র্যাকেটে বলা দরকার মনে করছি। ইংরাজিতে 'সুপারস্টিশন' বলতে যা বুঝি, কুসংস্কার শব্দটি আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি অন্য কোনো যোগ্যতর প্রতিশব্দ না পেয়ে। কিন্তু ব্যবহার করে খুশি হতে পারছি না সংস্কারের আগে ঐ 'কু'-টা থাকার জন্য। কারণ সুপারস্টিশনের সবটুকুই 'কু' নয়, তাতে 'সু'-ও একেবারে অনুপস্থিত নয়।) মানুষ সহজে বিস্মিত হতো, সহজে শ্রদ্ধান্বিত হতো, সহজে অভিভূত হতো, সহজে বিশ্বাস করতো। সহজ কল্পনা-প্রবণতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতার ফলেই বুঝি বা ফাঁকি-ভরা বুজরুকি বা ভেল্কি-বাজিকে খাঁটি অলৌকিক যাদু বলে বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে সহজ, হয়তো অবশ্যম্ভাবীই ছিলো। সুতরাং মুষ্টিমেয় কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোক—এঁদের ভেতর অধিকাংশই পুরোহিত হতেন—সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানারকম অলৌকিক যাদু দেখিয়ে তাঁদের বিস্ময়ে (কখনো বা ভয়েও) অভিভূত করতেন।

বাইবেলের 'ওল্‌ড টেস্টামেন্ট' অংশে (এক্‌সোডাস, সপ্তম অধ্যায়) বর্ণিত একটি কাহিনী থেকে প্রাচীন মিশরে যাদু-বিদ্যার প্রচলন সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাই। কাহিনীর একটি অংশ এইরকম :

"আরন তাঁর হাতের দণ্ডটি মিশরাধিপতি ফারাও-এর এবং তাঁর ভৃত্যদের সামনে মাটিতে ফেলে দিতেই সেটি একটি সাপে পরিণত হলো।

ফারাও তখন মিশরের জ্ঞানীদের এবং যাদুকরদের ডেকে আনালেন। তাঁরাও এসে তাঁদের যাদুবলে ঠিক তাই করে দেখালেন। তাঁরাও প্রত্যেকে যাঁর যাঁর হাতের (কাঠেব তৈরি) দণ্ড মাটিতে ফেলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি দণ্ড সাপে পরিণত হলো।* কিন্তু আরনের দণ্ড থেকে তৈরি সাপটি এইসব সাপ-গুলোকে এক এক করে গিলে ফেললো।"

এইভাবে স্থরু হলো আরনের যাদুর সঙ্গে মিশরের যাদুকরদের যাদুর লড়াই। একদিকে মিশরে অবরুদ্ধ ইজরায়েলীদের নেতা-প্রতিনিধি আরন, অন্যদিকে মিশরী যাদুকরের দল। ইজরায়েলীদের মুক্তি নির্ভর করছিল প্রতিযোগিতায় আরনের জয়লাভের ওপর। স্থতরাং ইজরায়েলী এবং মিশরী দু' পক্ষই মনে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে এই যাদুর লড়াই দেখেছিল, এটা অনায়াসেই কল্পনা করে নেওয়া যায়।

এরপর আরন মিশরের নীলনদের জলকে তার যাদুময় দণ্ডের আঘাতে লাল করে দেখালেন। মিশরী যাদুকররাও তাঁদের যাদুদণ্ড দিয়ে তাই করে দেখালেন। ইজরায়েলী পুরোহিত আরন তারপর কয়েকবার হাওয়ায় দোলালেন তাঁর যাদু-দণ্ড। সেই যাদুর আকর্ষণে কোথা থেকে এসে হাজির হলো ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙ। এ ব্যাপারে মিশরী যাদুকররাও কম গেলেন না—তাঁরাও তেমনি যাদুদণ্ড দুলিয়ে ব্যাঙ-এর আমদানী করে দেখালেন। এভাবে পর পর কয়েক বাজি যাদুকর আরনের সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত যাদুর লড়াইতে হেরে গেলেন মিশরী যাদুকরেরা।

সেই স্থদূর অতীতের মিশর দেশ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা শহর অনেক দূর, তবু যাদুর লড়াই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ১৯৩১ সালের ১৫ই নভেম্বর

* গত শতাব্দীর বিখ্যাত যাদুকর রবার্ট হেলার (১৮৩৩-১৮৭৮) তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণকালে কায়রো শহরে দরবেশদের এই যাদুর খেলাটি দেখাতে দেখেছেন। আসলে তাঁদের যাদুলাঠিগুলোই ছিলো এক-একটি ছোট সাপ, বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্মোহিত করে তাদের ঐ-রকম অজ্ঞান, সোজা আর শক্ত করে রাখা হতো যেন সোজা ডাণ্ডার মতো দেখায়। মাটিতে আছড়ে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্মোহন-মূর্ছা ভেঙে গিয়ে সাপগুলো জীবন্ত হয়ে নড়ে-চড়ে উঠত। হেলার বলেছেন, "আমি এ ব্যাপার দেখেছি সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়। কিন্তু খোলা জায়গায় না হয়ে এ খেলা যদি আধো অন্ধকার গৃহ বা মন্দিরের অভ্যন্তরে রহস্যময় পরিবেশে দেখানো হয়, তবে আসল রহস্যটুকু যাদের জানা নেই, তাঁরা যাদুদণ্ডের সর্পে রূপান্তরকে অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি"?

বৌবাজার অঞ্চলের এখন যেখানে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, সেখানে একটি স্বদেশী মেলা বসেছিলো। এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ৺জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। সেই মেলায় একদিন সন্ধ্যায় একটি যাদু-সম্মেলন (যাদুকরদের কুম্ভমেলা) অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই সম্মেলনে বিখ্যাত যাদুকর গণপতিও (শ্রী গণপতি চক্রবর্তী) ছিলেন। 'যাদু' এবং 'গণপতি' আমাদের কাছে তখনকার দিনে প্রায় সমার্থবোধক ছিলো। তাঁর যাদু ক্ষমতার অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত—এমন কি কখনো কখনো লোমহর্ষক-কাহিনী প্রচলিত ছিলো যাদের ভেতর অনেকগুলিকে গাঁজাখুরি গল্পের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলতেন তিনি ছিলেন ভূতসিদ্ধ, এবং তিনি যে সব অদ্ভুত খেলা দেখাতেন তা ভৌতিক সাহায্য ছাড়া দেখানো কখনোই সম্ভব হতে পারে না। খেলা দেখাবার স্টাইল বা ভঙ্গি একটু সেকেলে হলেও যাদুপ্রদর্শনে বাস্তবিকই তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা ছিলো। বিশেষ করে বিভিন্ন রকম বন্ধন বা বন্দী অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্ত হয়ে আসবার খেলাগুলো তিনি প্রায় নিখুঁতভাবে দেখাতেন।

এই সম্মেলনে গণপতি দেখালেন তাঁর পলায়নী খেলা। ইংরেজিতে এই ধরনের খেলাকে বলা হয় 'এসকেপস' (escapes)—যাদুবিদ্যার এই বিভাগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর রূপে বিখ্যাত হয়ে আছেন ইহুদী যাদুকর হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini)। এই অসাধারণ রহস্যময় যাদুকরের বিস্ময়কর অনেক কাহিনী পরে বলা যাবে। বর্তমানে ফিরে আসা যাক গণপতিতে।

গণপতি দেখালেন একটি কাঠের বাক্সের ভেতর তাঁকে পুরে বাক্সটি তালাবন্ধ করে দিলেও কত অনায়াসে এবং কত তাড়াতাড়ি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, আবার তার ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন; অথচ একবার বেরিয়ে এসে তারপর চট করে তিনি বাক্সের ভেতর ঢুকে গেলে দেখা যায় বাক্স তেমনি নিখুঁতভাবে তালাবন্ধ এবং দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা আছে। তালা খুলে বাক্সের ডালা তুলতে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন গণপতি, যিনি একটু আগেই বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে রহস্যময় ভাবে বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। গণপতিকে বাক্সে ঢোকাবার আগে যেমন দর্শকদের তরফ থেকে তন্ন তন্ন করে বাক্স এবং তালা পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তালা খুলে তাঁকে বার করে আনার পরও বাক্স এবং তালা তেমনি করে পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু দেখা গেলো বাক্সে বা তালায় কোনোরকম কারসাজি নেই। তাহলে যাদুকর

গণপতি অমন অনায়াসে বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে যেতেন কি করে? সেইটেই ছিলো রহস্য।

খেলাটি আমাকে—এবং মনে হয় উপস্থিত সবাইকেই—বিস্ময়মুগ্ধ করেছিলো। আমার আশেপাশে দু-চারজনকে বলতে শুনেছিলাম ভূতসিদ্ধ না হলে অমন ভুতুড়ে কাণ্ড করা যায় না। পরে এই খেলাটিই একাধিক যাদুকরকে দেখাতে দেখেছি, কিন্তু সে রাতে গণপতিব খেলাটি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, তেমন মুগ্ধ পরে আর কখনো হইনি।

সে রাতের প্রতিযোগিতায শ্রেষ্ঠ যাদুকর বলে বিবেচিত হলেন যাদুকর রাজা বসু, তাঁর বিস্ময়কর পিপের খেলা (Barrel Illusion) দেখিযে।*

খেলাটি এই রকম। স্টেজের ওপর একটি পিপে দাঁড়িযে আছে। তার ওপরে বাক্সেব ডালার মতো একটি ডালা, সেটি তালা দিযে আটকে দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রথমে যাদুকরের অনুরোধে কয়েকজন দর্শক এসে পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলেন যে পিপেতে, ডালায বা তালায কোনোরকম চালাকি করা নেই, এবং কাউকে পিপের ভেতরে পুরে দিযে (পিপের ভেতবে একজন মানুষেব কোনোরকমে বসে থাকবার মতোই জাযগা মাত্র ছিলো) ডালা চেপে তালাবন্ধ করে দিলে সে ব্যক্তির পক্ষে পিপের ভেতর থেকে বেরিযে আসা কোনো লৌকিক উপাযেই সম্ভব নয।

যাদুকর রাজা বসু তখন তাঁর সহকারীকে পিপের ভেতব ঢুকতে বললেন। সহকারীটি পিপের ভেতর ঢুকে গেলে পিপের ডালা চেপে তালাবন্ধ কবে দেওয়া হলো। চাবি রইলো দর্শকদের কাছে।

রাজা বসু—বরং রাজা বোসই বলি, ঠিক যেভাবে তাঁব নামটি উচ্চারণ করা হতো—তখন পিপের ডালার ওপর উঠে দাঁড়ালেন একটি চাদর হাতে। চাদব

* বয়োবৃদ্ধ সর্বমান্য যাদুকব গণপতিকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ধরা হয়নি। তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে একটি স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হযেছিল। উক্ত যাদু-কুম্ভমেলায় আরও যে সব যাদুকর যাদুপ্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম অমর গাঙ্গুলী, গোলোক বিহারী ধর, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কে. এল. গোস্বামী, প্রোঃ রেনন (রণেন্দ্র দত্ত), এ. মজুমদার এবং প্রোঃ জি. কুমার। জনপ্রিয় কৌতুকরসিক এবং সংগীতজ্ঞ যাদুকর প্রোঃ বিমল গুপ্ত যোগ দেননি; তিনি তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রোঃ জি. (গীতেন্দ্র) কুমার দ্বিতীয়, এবং নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তৃতীয় হন।

দিয়ে নিজেকে ঢেকেই তিনি পিপের ওপর বসে পড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটি ফেলে দিলেন স্টেজের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে এক সেকেণ্ড দর্শকেরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন বিস্ময়ে। তারপর হাততালির উল্লাস-অভিনন্দন। রাজা বোস আর রাজা বোস নেই, হয়ে গেছেন সেই সহকারী, যাকে একটু আগে পিপের ভেতরে বন্দী করে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল!!! তালা খুলে পিপের ডালা তুলতেই দেখা গেলো পিপের ভেতরে কুঁকড়ে বসে আছেন যাদুকর রাজা বোস!!!

একজন যাদুকরের কথা

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর ?"

স্বামী বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত উক্তিটি আবৃত্তি করলেন যাদুকর রাজা বোস। সঙ্গে-সঙ্গে যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর দুটি চোখ। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা, কিন্তু স্মৃতিকথা লিখতে বসে সে ছবি আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

কথা বলছিলাম যাদুকর রাজা বোসের সঙ্গে কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে।

"আশ্চর্য এই কথাটুকু।" বললেন তিনি। "একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। ঈশ্বর মানুষের রূপেই নানাভাবে রয়েছেন আমাদের চোখের সামনে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি রয়েছেন, কিন্তু অন্ধ আমরা তা দেখেও দেখছি না, খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় ঈশ্বর ? কোথায় ঈশ্বর ?"

শুনে বিস্মিত হলাম। এতো বিস্মিত বোধকরি স্টেজে তাঁর ম্যাজিক দেখেও কখনো হইনি। এ আলাপের সময় তিনি ম্যাজিক দেখানো একরকম ছেড়েই দিয়েছেন, বিদায় নিয়েছেন যাদুকর জীবন থেকে। কিন্তু অবসর-প্রাপ্ত যাদুকরের মুখেও এ ধরনের দার্শনিক বচন আশা করিনি।

আমার বিস্ময় বুঝতে পেরেই হয়তো তিনি হাসলেন একটু। বোধহয় কথাটা যে তিনি অযাদুকরোচিত বা অবান্তর বলেননি সেইটে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করেই বললেন, "বিলেতে থাকতে একটা কথা শুনেছিলাম : 'ওযান্‌স্ এ ম্যাজিশিয়ান, অল্‌ওয়েজ এ ম্যাজিশিয়ান।' যাদুকর একবার হওয়া মানেই চিরজীবনের জন্যে হওয়া। কথাটা মিছে নয় বুঝতে পারছি। সেই কবে ম্যাজিক দেখানো থেকে অবসর নিয়েছি, তবু এখনো বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, চেনা-শোনা মহলে মাঝে-মাঝে হঠাৎ ফরমায়েস আসে : ম্যাজিক দেখাও। প্র্যাকটিস নেই ; অনভ্যাসে শুধু বিদ্যা হ্রাসই হয়নি, নিজের ওপর আস্থাও হ্রাস পেয়েছে ; তবু উপায় নেই, দাবি মানতেই হয়। কারণ দাবিওয়ালাদের বিশ্বাস সাঁতার আর
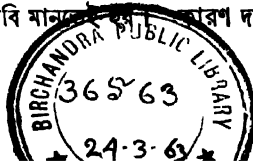
ম্যাজিক একবার যে শেখে সে আর ভোলে না। অগত্যা ছোটো-ছোটো খেলা দেখাই, যাকে ইংরেজিতে বলে ইমপ্রম্‌চু কনজ্যুরিং (impromptu conjuring), অর্থাৎ এমন খেলা যাতে খুব বেশি আগাম তৈরি বা সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ দরকার হয় না। যেমন লম্বা একফালি কাগজকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে যাত্নমন্ত্রে ফের আস্তো ফালি করা, এক টুকরো দড়িকে কেটে দু টুকরো করে ফের আস্তো বানানো, রুমালের রং বদলানো, যাত্নমন্ত্রে রুমালের গেরো খোলা, অদৃশ্য টাকাকে দৃশ্য আর দৃশ্য টাকাকে অদৃশ্য করা, এমনি সব ছোটোখাটো ভেলকি আর ভোজবাজি।"

"তার ফলে…?"

"তার ফলে আমার দর্শকদের বিস্ময়ে অবাক হওয়াটা খাঁটি না জাল তা জানি না।" বললেন যাত্নকর রাজা বোস। "ধরে নিলাম তাঁদের সেই বিস্ময়টা খাঁটি, তাতে এতোটুকু ভেজাল নেই। কিন্তু তাঁদের সে বিস্ময় যেন সমুদ্রে শয্যা করে শিশিরের ছোঁয়ায় চমকে ওঠা। প্রতিদিন চোখের সামনে আমরা বিরাট রহস্যের খেলা দেখছি: চাঁদ-সূর্যের উদয়-অস্ত; রাতের আকাশে অগুনতি তারার ঝিকিমিকি, জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন লীলা; বিরাট ত্নুনিয়াকে দেখা ছোটো ত্নুটি চোখের তারা দিয়ে; সবার ওপর কী আশ্চর্য এই আমি, মানে যে-কোনো আমি, আর কী অসীম আশ্চর্য আমার, মানে যে কোনো মানুষের মনের সমুদ্র। বিরাট রহস্য পাইকারীরূপে আমাদের সম্মুখে, তাতে যে আমাদের এতোটুকু বিস্ময়-বোধ নেই, সেই আমাদের বিস্মিত করছে কিনা ছেঁড়া কাগজের ফালি কি করে আস্তো হলো, অথবা শূন্য টুপির ভেতর থেকে কি করে পাখির খাঁচা বেরলো, তারই খুচরো রহস্য।"

অর্থাৎ:

> "বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছো বিস্ময়?"

এই প্রশ্ন করতে চাইছেন যাত্নকর রাজা বোস।

মনে পড়লো ভিক্‌টোরিয়ান যুগের মনীষী কার্লাইলের একটি কথা। তিনি বলেছেন, আগুন ভগবানের একটি মিরাক্‌ল্ (miracle), এককালে আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিলো, যখন আমরা অসভ্য অথবা প্রায় অসভ্য ছিলাম। আমাদের সেই বিস্ময়ে মিশে ছিলো ভীতি আর শ্রদ্ধা। আমরা তখনো তাকে কোনো নামের বাঁধনে বাঁধিনি। সভ্য হয়ে আমরা সেই বিস্ময়ের বস্তুটির নাম-

করণ করলাম : 'ফায়ার' (fire), আগুন। তারপর থেকে আগুন সম্বন্ধে আর আমাদের সেই বিস্ময়-বোধ নেই, যেন ঐ নামকরণেই আমাদের কাছে আগুনের রহস্য ফুরিয়ে গেছে।" এ কথা বললাম যাতুকর রাজা বোসকে।

"এ বিষয়ে কার্লাইলের সঙ্গে আমি একমত।" বললেন তিনি। "যদিও কার্লাইল আমি পড়িনি। জানেন তো পড়াশুনোর ধার খুব বেশি ধারিনি আমি। আঠারো বছর বয়সে বিলেতে গিয়েছিলাম চামড়ার কাজ শিখতে, কিন্তু বিশ্বের আদি যাতুকর যাকে যাতুকরই বানাবেন, তার সাধ্য কি চামড়া-বিশারদ হবার? শেষ পর্যন্ত চামড়াকে প্রণাম জানিয়ে আমি লেদার এক্‌সৃপার্ট না হয়ে হলাম ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিকের নেশা ছিলো ছেলেবেলা থেকেই। এ নেশা প্রথম জাগিয়েছিল বাড়িব রাঁধুনি বামুন। ছোটো দু'চারটে ভোজবাজির খেলা তার জানা ছিলো, আর চমৎকার দেখাতো। আমার যাতুজীবনের দীক্ষাগুরু সেই পাচক ঠাকুর অনেকদিন হলো ইহলোকে নেই, কিন্তু এখনো তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।"

"এদেশে যা ছিলে নেশা," একটু থেমে বলতে লাগলেন রাজা বোস, "বিধাতার বিধানে বিলেতে তাই পেশায় পরিণত হলো। অবশ্য একলাফে নয়, 'আই অ্যাওক ওয়ান মর্নিং অ্যাণ্ড্ ফাউণ্ড্ মাইসেল্‌ফ এ প্রফেশন্যাল'—এমনটি হয়নি। ও দেশে এমন হয়ও না। আপনাকে বলেছি তো বিলেতে চামড়ার কাজ শিখতে গিয়েছিলাম? তখনকার দিনে বিলেত যাওয়াটা এখনকার মতো জলভাত হয়ে ওঠেনি। অসমসাহসিক ব্যাপার না হলেও তার ভেতর বেশ রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ ছিলো। মনে করুন, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সুদূর ইংলণ্ডে আঠারো বসন্তের এক তরুণ বাঙালী আমি রিপেন বোস—"

"রিপেন বোস?" প্রশ্ন করলাম যাতুকর রাজা বোসকে।

"হ্যাঁ ওটাই আমার পিতৃদত্ত নাম," বললেন তিনি। "সে যুগের বড়লাট লর্ড রিপনের কথা ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছেন। রিপন সাহেবকে বাবা পছন্দ করতেন, তাই ঐ নামের গন্ধ নিয়েই আমার নাম রাখলেন রিপেন্দ্র; তার নৃপেন্দ্র যেমন নৃপেন হয়, তেমনি রিপেন্দ্র হলো রিপেন।"

"কিন্তু রিপেনকে রাজা বানালো কে?"

"ম্যাজিক।" বললেন রাজা বোস। "নাম-মাহাত্ম্য মানেন তো?"

"মানি।"

"তাহলেই এও মানবেন যে বিলেতি রঙ্গমঞ্চে পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হয়ে দাঁড়াবার জন্যে রিপেন বোস নামটা খুব হ্যাপি নয়, মানে যথেষ্ট শৌখিন নয়, জোরদার নয়, জাঁকালো তো নয়ই।"

চোখের পলকে ভেবে শিহরিত হলাম বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের নাম যথাক্রমে বিশ্বম্ভর, বাঞ্ছারাম আর ভজহরি হলে কী কেলেঙ্কারিই না হতো!

"আরেকটু আগে থেকে বলি, নইলে পরিস্থিতিটা আপনি ঠিক বুঝবেন না।" বলতে লাগলেন যাত্নকর রাজা বোস। "ওদেশে দেখলাম ম্যাজিকের ভারি কদর, চর্চাও খুব ভদ্রসমাজে; আমাদের দেশের মতো ও জিনিসের চর্চা প্রধানত ছোটো জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নেশা চেপে গেলো, পুরোদমে ম্যাজিকের চর্চা শুরু করলাম। আর মাঝে-মাঝে এখানে-সেখানে ছাত্র-ছাত্রী মহলে, ঘরোয়া বৈঠকে, রেস্তোরাঁয়, পার্টিতে শখের যাত্নকর হয়ে দেখাতে লাগলাম নানা রকমের খেলা— তাসের, রুমালের, টাকার, ঘড়ির, ডিমের, আংটির, গ্লাসের, টুপির। অ্যামাটিওর ম্যাজিশিয়ান হিসেবে বেশ একটু নামডাকই হলো রাজা-মহারাজার দেশ হিন্দুস্থান থেকে আসা এই যুবক যাত্নকরের। রাজা-মহারাজার দেশ বলে হিন্দুস্থানের খ্যাতি আছে ওদেশে, জানেন নিশ্চয়? 'রাজা' আর 'মহারাজা' এই দুটো শব্দই বিলিতি দর্শকদের অনেকখানি অভিভূত করবে, এবিষয়ে সন্দেহ ছিলো না। মহারাজা একটু বাড়াবাড়ি মনে হলো, তাছাড়া উচ্চারণের পক্ষে ওটি রাজার ডবল লম্বা, তাই ভেবেচিন্তে রাজাই বেছে নিলাম। ব্যক্তিগত জীবনের রিপেন বোস হয়ে গেলাম যাত্নকর জীবনের রাজা বোস। 'রাজা' নামটি আমার মঞ্চ-নাম (Stage-name) হিসেবে রেজিস্টি. করে নিলাম, ১৯০৯ সালে। তারপর —ঐ যে আপনাকে বলেছি 'ওয়ান্‌স্ এ ম্যাজিশিয়ান অলওযেজ এ ম্যাজিশিয়ান'— আমার পেশাদারি ম্যাজিশিয়ানি নামের তলায় চাপা পড়ে গেলো আমার পিতৃদত্ত নাম।"

"সত্যি, আমিও আপনাকে বরাবর শুধু রাজা বোস বলেই জেনে এসেছি।" বললাম আমি। "আপনার আসল নাম যে রিপেন বোস সেটা আজ এই প্রথম জানলাম।"

যাত্নকর হাসলেন একটু। বললেন "নামের কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল কে জানে? কে বলবে কোন্‌টা আসল আমি? যাত্নকর-আমি? না অন্য আমি? যাক সে সব দার্শনিক তত্ত্বকথা। আপনাকে এইখানে বলে রাখি, চট

করে সরাসরি বিলেতের বড় বড় পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ম্যাজিক দেখাবার সুযোগ বা কনট্র্যাক্ট্ পেয়েছিলাম ভাববেন না যেন। সাফল্য অতো সহজ হলে তাতে এতো রোমান্স থাকতো না।"

"কি করে সুযোগ পেয়েছিলেন তাহলে?"

"সরাসরি কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগই পেতো না আমার মতো এক আনকোরা নযা শিল্পী। যোগাযোগ করবার একমাত্র উপায ছিলো এজেন্টরা। থিযেটার কর্তৃপক্ষ আব শিল্পীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হতো এদেরই মাধ্যমে। এদের সহাযতা বা অনুমোদন ছিলো আমার মতো নতুন শিল্পীদের পক্ষে অপরিহার্য। আমি যে এজেন্টকে ধরলাম তিনি বললেন, শখের যাদুকরগিরি এক কথা, আর পেশাদাব যাদুকর হওযা সম্পূর্ণ আরেক কথা, সুতরাং আমি তাঁর অনুমোদনের যোগ্য কিনা সে বিষযে তিনি আমাকে প্রথমে বেশ ভালোভাবে যাচাই করে নিতে চান। আমি তাতে রাজী আছি কি? আমি তখন বললাম······"

রাজা বোস তখন বললেন, "রাজী।"

এজেন্ট বললেন, "বেশ, তৈরি হও। প্রথমেই বড় শহরে বড় রঙ্গমঞ্চে নয়, কোনো শহরতলির শস্তা রঙ্গমঞ্চে ভ্যারাইটি প্রোগ্রামে তোমাকে সিকি ঘণ্টা ম্যাজিক দেখাবাব ব্যবস্থা করে দেবো। সেই সিকি ঘণ্টার পরীক্ষায যদি পাশ করতে পারো, তাহলে তারপর তোমাকে শহরের ভালো রঙ্গমঞ্চে সুযোগ দেবার কথা চিন্তা করবো।"

এজেন্ট মারফৎ মফস্বলের এক শস্তা রঙ্গমঞ্চে একটি অবিরাম বিচিত্র প্রদর্শনীতে (Non-stop revue) পনেরো মিনিট ম্যাজিক দেখাবার কন্ট্রাক্ট্ পেলেন রাজা বোস। তারপর রাজা বোসেরই ভাষায়:

"কন্ট্রাক্ট্ পেযে আত্মহারা হয়েছিলুম—শুধু আনন্দে নয়, দুরু দুরু হৃৎকম্পেও বটে। কারণ ঐ সব পাঁচমিশেলি বিচিত্রা দেখতে যে-সব দর্শক যেতো, তাদের বর্ণনা যা শুনলাম, তাতে নিরুদ্বিগ্ন থাকা শক্ত। টিকিটের দাম যেমন শস্তা, তেমনি টিকিট কিনে যারা দেখতে আসতো, টিকেটের পুরো পয়সা উশুল করতে তারা তেমনি ব্যস্ত। সঙ্গে তারা নিয়ে আসতো পচা ডিম, পচা টোম্যাটো ইত্যাদি, প্রোগ্রামে কোনো শিল্পীর খেলা অপছন্দ হলে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবার জন্য। আমি যে রাতে প্রথম ম্যাজিক দেখালুম, সে রাতে আমার পালা শুরু

হবার আগের শিল্পীকে পচা ডিম আর পচা টোম্যাটোর আক্রমণে নাস্তানাবুদ হতে দেখে তো ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম।"

"তারপর ?"

"আত্মারামকে দিলুম না খাঁচা-ছাড়া হতে। বললুম, খবরদার, ঝাণ্ডা উঁচা রাখতে হবে। বাঙালীর বাচ্চা, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে হিম্মৎ হারালে চলবে না। উইথ ফ্লাইং কালার্স, যাকে বলে বিজয়-নিশান উড়িয়ে বুক উঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।...আপনি একে পাগলামি বলবেন কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মনে হতে লাগলো আমার ঐ অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে বাংলার প্রেসটিজ।"

বললাম, "শিল্পীর জীবনে এই পাগলামিবই তো পরম প্রয়োজন।"

"ঠিক এই কথাটাই আপনার কাছে আশা করেছিলাম।" বললেন রাজা বোস। "সিচুয়েশনটা আপনি খানিকটা বুঝে নিয়েছেন। তারপর শুনুন, লম্বা কাহিনী ছোটো করে বলি। শখের যাদুকর হিসেবে এর আগেই পসার জমিয়েছিলুম, আগেই বলেছি আপনাকে। শখের যাদু-প্রদর্শনে নানা বিচিত্র দর্শকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে অনেক রকমের বেকায়দায়। আর নানা কায়দায় ঐ সব নানা বেকায়দা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। গুরুদেবের কবিতায় পড়েছেন তো: 'আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা।' আমার বিপদজাল আমি আপনি কাটতুম বটে, কিন্তু নিজে গড়ে তুলতাম না, গড়ে তুলতো আমার দর্শকরাই। যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদই বলুন, আর ভগবানকে এর ভেতর না টানতে চাইলে আমার বরাতগুণে বা বুদ্ধির জোরেই বলুন, জব্দ খুব বেশি হইনি। এমন বেকায়দায় বেশি পড়িনি, যার জাল কেটে পুরো বাহাদুরি বজায় রেখে বেরিয়ে আসতে না পেরেছি। এর প্রধান কারণ কি জানেন ?

"জানি না।"

"কোনো যাদুর খেলাই— তা সে আপাতদৃষ্টিতে যতো সোজাই হোক না কেন, গোপনে প্রচুর অভ্যাস করে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে পাকাপোক্ত না হয়ে আর ভালোরকম রিহার্শাল না দিয়ে কখনও প্রকাশ্যে দেখাইনি। এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে, মনে রাখলে ভবিষ্যতে কাজ দেবে। কোনো সোজাকেই সোজা ভেবে অবহেলা করবেন না, হাতের পাঁচ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না।

কারণ সময়-সময় অনেক শক্ত পার হযেও সোজায় এসে ধাক্কা খেতে হয়। একটা ছোটো ঘটনা (anecdote) বলাও অবান্তর হবে না, তাই বলি। ইংল্যাণ্ডের অদ্বিতীয় যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট-এর (David Devant) কাছে একজন শৌখিন যাদুকর গিয়েছিলেন তালিম নিতে। ডেভাণ্ট তাকে প্রশ্ন করলেন 'আপনি ক'টা খেলা জানেন ?' ভাবী শিষ্য জবাব দিলেন 'শ তিনেক।' ডেভাণ্ট দুচোখ কপালে তুলে মহা বিস্ময়ের ভান করে বললেন 'সর্ব্বনাশ ! ! ! বলেন কি ? আমি তো জানি মাত্র ডজন খানেক। বুঝলেন তো কথাটার মানে ? শ'তিনেক খেলা জানা শখের ম্যাজিশিযান ভদ্রলোক ঐ শ'তিনেক খেলার গোপন কৌশল হয়তো ঠিকই জানতেন, কিন্তু খেলাব কৌশল জানা এক জিনিস, আর খেলা সত্যি সত্যি আসবে সাফল্যেব সঙ্গে দেখাতে জানা সম্পূর্ণ আবেক জিনিস। এই শেষের জানাটাই আসল জানা, ডেভাণ্ট বিনযের ছলে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ যে জানাকে বাস্তবে রূপ দিতে পাববো না, সে জানার মূল্য কতটুকু ? কি যে বলছিলাম ?"

"বিলেতের শস্তা রঙ্গমঞ্চে আপনার সর্বপ্রথম পেশাদাবি আবির্ভাবেব কথা।"

"হ্যাঁ, সেইটে এবাবে বলি। তার আগে আরেকটা কথা আপনাকে বলে নিই। কাজে লাগবে আপনার। কোনো কাজের সম্মুখীন হয়ে নিজের মনকে কখখনো বলবেন না এ আমি পারি নে, এ আমি পারবো না। বলবেন এ আমি নিশ্চয পারি, এ আমি আলবাৎ পাববো।" বললেন রাজা বোস।

আমি বললাম, "এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। গীতার আদর্শ মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারি আর না পারি, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? বেটার ট্রাই অ্যাণ্ড ফেল ছান নেভার ট্রাই অ্যাট্ অল।"

রাজা বোস বললেন, "এই সর্বনাশ ! ঐখানেই তো 'পারবো না'-র ছুঁচটুকু ঢুকিয়ে রাখলেন আপনি। অসাফল্যের এতোটুকুও সম্ভাবনা আছে এ কল্পনাকে মনের ভেতর এক তিল জাযগাও দেবেন না। মনের চৌবাচ্চাকে একেবারে টইটম্বুর করে রাখবেন নির্ভেজাল সাফল্য-কল্পনা দিযে ; আমি পারবো, আমি পারবো, আমি পারবো। কারণ 'নাও পারতে পারি'-কে একবার দাঁড়াবার জায়গা দিলে সে বসে পড়ে বলবে 'হয়তো পারবো না', তাবপর 'হযতো' খসিয়ে ফেলে শুয়ে পড়ে বলবে 'পারবো না'। সুতরাং মনকে রাখতে হবে সাফল্য বিশ্বাসে একাগ্র। দ্বিধা রাখলে চলবে না। আমার পূর্ববর্তী শিল্পী পচা ডিম

আর পচা টোম্যাটোর ঘায়ে মাঝপথে ঘায়েল হয়ে পালিয়ে এসেছেন। আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে শূন্য মঞ্চ আর পাঁচমিশেলি দর্শকদের হাতে এবং পকেটে অগুনতি পচা ডিম আর পচা টোম্যাটো। কলকাতায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ঢোকবার পথের ধারে জানোয়ারদের খাওয়াবার জন্য ভিজে ছোলা, কলা, বাদাম, এই সবের দোকান দেখেছেন তো? বোধহয় আমার জীবনের প্রথম পেশাদারি অভিজ্ঞতার ঐ পাঁচমিশেলি রঙমহলটির বাইরে তেমনি পচা ডিম আর পচা টোম্যাটোর কারবার ভালোই চলতো। প্রোগ্রাম পরিচালক আমায় বললেন, এবার স্টেজে যাও, তোমার পালা শুরু করো।

শৌখিন স্টেজে খেলা দেখাতে যেমন সহজভাবে ঢুকতাম, প্রথম পেশাদারি স্টেজেও তেমনি ঢুকে গেলাম।"

"ধীর পদক্ষেপে?"

"সর্বনাশ! পদক্ষেপ ধীর হলে পচা ডিম বীরের দল ভাবতো ভয় পেয়েছি, পা চলছে না; আর অমনি পচা ডিম ছোঁড়া শুরু হয়ে যেতো। আবার অধীর হলেও ভাবতো তড়বড় করে স্মার্টনেসের ভান দেখিয়ে ভয় লুকোবার চেষ্টা করছি। আর অমনি—"

"পচা ডিম আর টোম্যাটো ছোঁড়া শুরু হয়ে যেতো?"

"যেতো। ওরা সব টিকিটের পয়সা উশুল করার দল—যার খেলা দেখে পয়সা উশুল হবে না, তার ওপর পচা ডিম ছুঁড়ে হাতের সুখ করে পয়সা উশুল করবো, ওদের ছিলো এই নীতি, এর ভেতর মিনমিনে দয়া-মায়ার প্রশ্ন নেই। আমি বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে সহজভাবে খেলার পর খেলা দেখিয়ে চললুম।"

"কিন্তু পচা ডিম? পচা টোম্যাটো?"

"এদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। আর আমার সেই ভুলে যাওয়ার ছোঁয়াচ লেগেছিলো গোটা অডিটোরিআমের সবার মনে। তাদের হাতের টোম্যাটো রইলো হাতে, পকেটের ডিম পকেটে। তারা খুশি-মনেই দেখতে লাগলো আমার খেলা। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো তাদের হাততালি আর উল্লাসধ্বনি। ঝাণ্ডা উঁচু রেখে, অক্ষত-দেহে পরিষ্কার পোশাকেই স্টেজ থেকে ফিরে এলুম আমার প্রোগ্রামের শেষে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পাসপোর্ট পাওয়া হয়ে গেলো। পেশাদার যাত্বকর রূপে আমার যোগ্যতা এবং সাফল্য নিশ্চয়তা সম্বন্ধে এজেন্টের আর সন্দেহ রইল না। তারপর ইংল্যাণ্ডের

বিভিন্ন শহরে, আর ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা অনেক দেখিয়েছি· পেশাদার যাদুকর রূপে। সেই বিদেশে, তারপর ফিরে এসে এদেশে, যাদুকর-জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র অনুভূতি লাভ করেছি। জীবনের শেষ অঙ্কে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা যখন নতুন করে ভাবি, তখন মনে হয় মানুষের বানানো কাহিনার চাইতে বিধাতার ঘটানো ঘটনা কত বেশি বিচিত্র—ফিক্‌শনের চাইতে ট্রুথ কতো বেশি স্ট্রেঞ্জ্!”

একটু থেমে বললেন, “কিন্তু বিলেতের শহরতলিতে পেশাদারি মঞ্চে আমার সেই সর্বপ্রথম যাদু প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অতুলনীয়, অনির্বচনীয় হয়ে আছে। থাকবেও।”

আমার সঙ্গে উক্ত আলোচনার মাস কয়েকের ভেতরই মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে রাজা বোস পরলোকে চলে যান। সে বছরই (২২শে মার্চ, ১৯৪৮) সন্ধ্যায় কলকাতার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে “উইজার্ডস্ ক্লাব” (Wizards' Club) নামক যাদু সংস্থা (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) যে একটি যাদু-প্রধান বিচিত্র অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন, তাতে ক্লাবের সভাপতি রূপে তিনি শিল্পীদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং নিজেও যাদুপ্রদর্শন করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেই তাঁর সর্বশেষ যাদুকরের ভূমিকায় অভিনয়। পেশাদারি যাদুপ্রদর্শনের জগৎ থেকে তার অনেক আগেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

এ দেশ থেকে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের পেশাদারি মঞ্চে যাদুকর রূপে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সর্বপ্রথম তিনিই। সেখানে তিনি একজন ইংরেজ তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন; ইনিই তাঁর সুযোগ্যা যাদু-সহকারিণী “মিস্ হাইডী” (Miss Hydee), ভারতে এসেও বিভিন্ন স্থানে রাজা বোস তাঁর সঙ্গে যাদুপ্রদর্শন করে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিদেশিনী পত্নীর সঙ্গে যে সব খেলা তিনি দেখাতেন তাদের ভেতর সব চেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় ছিলো “রিটার্ন অফ শি” (Return of She) অর্থাৎ “সুন্দরীর প্রত্যাবর্তন” এবং ভালুক (Teddy Bear) ও শিকারীর খেলা। প্রথম খেলাটিতে একজন শিল্পী (রাজা বোস)· শোকবিহ্বল চিত্তে তাঁর লোকান্তরিতা প্রিয়ার ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে তন্দ্রায় ঢলে পড়তেন এবং তন্দ্রার ঘোরে দেখতেন প্রিয়া এসেছে। তাঁর সেই স্বপ্ন রূপ ধারণ করতো মঞ্চে, আঁকা ছবি যেন যাদুমন্ত্রে প্রাণ পেয়ে প্রিয়ার দেহ ধারণ করে এগিয়ে আসতো শিল্পীর দিকে। (বলা বাহুল্য প্রিয়ার ভূমিকায় আবির্ভূত হতেন

সুন্দরী মিস হাইডী)। এই শুকনো কাঠামো থেকে বোঝা যাবে না নেপথ্য সঙ্গীতের করুণ মাধুর্যে, যাদুর বিস্ময়ে এবং যাদুকর-দম্পতির—বিশেষ করে শিল্পীর ভূমিকায় যাদুকর রাজা বোসের—অনবদ্য মর্মস্পর্শী অভিনয়ে এই খেলাটি কী অপরূপ রূপ নিয়ে ফুটে উঠতো, কী বিস্ময়-মাধুর্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করতো। বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্টের "শিল্পীর স্বপ্ন" (Artist's Dream) খেলাটির সঙ্গে এ খেলাটির প্রাথমিক সাদৃশ্য থাকলেও শেষের দিকে রাজা বোসের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিলো।

দ্বিতীয় খেলাটিতে দর্শকদের চোখের সামনে মঞ্চের ওপর ভালুকের খোলসের মতো পোশাক পরে মিস্ হাইডী ভালুক সাজতেন; শিকারীর পোশাক পরে শিকারী সাজতেন রাজা বোস, হাতে নিতেন নকল বন্দুক। মঞ্চের মাঝখানে একটা নকল গাছের গুঁড়ির চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভালুককে দ্রুতবেগে তাড়া করতেন শিকারী। চরকার মতো এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একবার থেমে দাঁড়িয়ে পড়তেন শিকারী আর ভালুক। দেখা যেতো ভালুকের পোশাকে চলে গেছেন রাজা বোস, আর শিকারীর পোশাকে মিস্ হাইডী। গাছের গুঁড়ির সামান্য আড়ালে এতো দ্রুত পরিবর্তন কি করে সম্ভব, এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে রহস্যের কিনারা পেতেন না দর্শকবৃন্দ। বন্দিদশা থেকে মুক্তির অর্থাৎ "পলায়নী" খেলার (Escapes) ভেতর তাঁর "পিপের খেলা" র কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া হুডিনি-প্রদর্শিত "স্ট্রেট জ্যাকেট এসকেপ" (Straight jacket escape) অর্থাৎ মারাত্মক পাগলদের যে মুখ-বন্ধ হাতাওয়ালা জামা পরিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়, তার সেই শক্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, এবং মুখে তালা বন্ধ করা বড়ো দুধের পাত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার খেলা (Milk Can Escape)-ও* তিনি দেখাতেন।

১৯২৮ সালে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ রাজা বোসকে মঞ্চ-উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করে তাঁদের মঞ্চে অভিনীত "ফুল্লরা", "বিদ্রোহিণী" প্রভৃতি পর পর কয়েকটি নাটকের কতকগুলি বিশেষ দৃশ্যে তাঁর যাদু-প্রতিভার সুযোগ গ্রহণ করেন। যাদুকর রাজা বোসের পরিকল্পনায় বিচিত্র যাদুকৌশলের প্রয়োগে সেই দৃশ্যগুলো দর্শকদের মনে অসামান্য বিস্ময় আর আনন্দের সৃষ্টি করেছিল।

---

* ৺রাজা বোসের সমসাময়িক যাদুকর ৺বিমল গুপ্ত এবং পরে যাদুকর ৺দুর্গাদাস সোমও (প্রোঃ সোম) এই খেলাটি দেখিয়ে গেছেন।

অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি

হ্যারি হুডিনি !!!

বিশ্বের যাদুবিদ্যার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মানুষের বিস্ময়বোধকে হুডিনির মতো এমন গভীরভাবে নাড়া দিতে আর কোনো যাদুকরই পারেননি।

আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি রক্তকণায় মিশে রয়েছে গভীর বন্ধন-বিতৃষ্ণা এবং মুক্তি-পিপাসা। বন্ধন-দশায় আমাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, আমরা চাই স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া। আমাদের বুকের রক্তে তাই দোলা লাগে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন :

"শিকল দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?"

যখন কাজী নজরুল হাঁকেন :

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফ্যাল, কর রে লোপাট।"

যখন প্যাট্রিক হেন্‌রি বলেন "গিভ মি লিবার্টি অর গিভ মি ডেথ", দাও আমাকে মুক্ত স্বাধীনতা, অথবা মৃত্যু। তাই পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনায় জীবন পণ করে যাঁরা শহীদ হন, মুক্তির পূজারী রূপে আমরা তাঁদের চিরদিন শ্রদ্ধা করি। এমন কি আমাদের গভীরতম আধ্যাত্মিক সাধনার মূলেও ঐ একই লক্ষ্য—বন্ধন থেকে মুক্তি, মোহ থেকে মুক্তি।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের মজ্জাগত সংস্কার, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের অবচেতন মনে সুপ্ত রয়েছে মুক্তির স্বপ্ন। সকল মানুষের সেই চিরন্তন স্বপ্নকে যাদুর খেলায় রূপায়িত করে যাদু-জগতে, তথা সমস্ত প্রমোদ-জগতে যুগান্তর এনে দিলেন হ্যারি হুডিনি, বিভিন্ন রকমের কঠিন বন্ধনদশা থেকে যাদু-শক্তিতে মুক্তি লাভ করার খেলা দেখিয়ে। এ-ধরনের যাদু-খেলার নাম 'এস্‌কেপ' (Escape) অর্থাৎ 'পলায়ন', কারণ এ ধরনের খেলায় যাদুকর তালাবন্ধ হাতকড়া থেকে, শেকলের বন্ধন থেকে, ডাণ্ডাবেড়ি থেকে, মুখ আটকানো থলের ভেতর থেকে, তালা-বন্ধ কাঠের বাক্‌সো বা পিপের ভেতর থেকে এবং অন্য নানা ধরনের

বন্দী অবস্থা থেকে যাদুর ক্ষমতায় মুক্তি লাভ অর্থাৎ 'পলায়ন' করে বেরিয়ে আসেন। যাদুকরের সেই বেরিয়ে আসা এমন অদ্ভুত, এমন রহস্যময়, যে দর্শকরা তা দেখে বিস্ময়ে অভিভুত হন, এ অসম্ভব ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো কিছুতেই তা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পাবেন না। ডিটেকটিভ শার্লক হোম্স-এর স্রষ্টা, বিখ্যাত লেখক এবং প্রেততত্ত্ব-বিশারদ সার আর্থার কোনান ডয়েল স্বচক্ষে হ্যারি হুডিনির 'পলাযনী' যাদুর খেলা থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, হ্যারি হুডিনি এক বিস্ময়কব অলৌকিক অতীন্দ্রিয় গুপ্ত (Occult) শক্তির অধিকারী ; এরই সাহায্যে তিনি তাঁর পঞ্চভুতে গড়া দেহটাকে শূন্যে পরিণত করে বন্ধনের ভেতর থেকে বাইরে পালিয়ে এসে সেই 'শূন্য' দেহকে আবার পূর্ণ পঞ্চভৌতিক দেহে পরিণত কবে ফেলেন।

হুডিনির অদ্ভুত রহস্যময় 'পলায়ন'গুলোর এই ব্যাখ্যা আজগুবিয়ানার চূড়ান্ত বটে, কিন্তু হ্যারি হুডিনি অলৌকিক ক্ষমতার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও কোনান ডযেল তবু নিজের আজগুবি বিশ্বাসেই অটল ছিলেন। বিশেষ করে তখন কোনান ডয়েল প্রেততত্ত্বের চর্চায় অনেক দূব এগিযেছেন, অনেক মিডিযামের চক্রে বসে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিক ভুতুড়ে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। বযসও বেশি হয়েছে, জীবনে শুরু হয়েছে ভাঁটার টান। তা ছাড়া যাদুবিদ্যার বিচিত্র ছলা-কলা সম্পর্কেও তিনি আনাড়ি ছিলেন বললেই চলে।

হুডিনির বিখ্যাত "মিল্‌ক্ ক্যান এস্‌কেপ" অর্থাৎ "দুধের ভাঁড়ের ভেতর থেকে পলাযন" খেলাটির ইতিহাস বলি। ১৯০৭ সালের শেযের দিকে হুডিনি [illegible] করলেন হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি, বাক্‌সো ইত্যাদি থেকে পলায়নের খেলা দর্শকদেব কাছে পুরনো হয়ে গেছে : প্রমোদপ্রিয জনসাধাবণ তাঁর খেলায আর আগের মতো অসামান্য উৎসাহী নেই। ঝিমিযে পড়েছে তাদের আগ্রহ। তারা চাইছে নূতন বিস্ময়, নূতন শিহরণ।

১৯০৮ সালের শুরুতেই আত্মসম্মানে একটি প্রচণ্ড ঘা খেলেন হুডিনি। যে রঙ্গালযে তিনি খেলা দেখাতেন, সেখানকার বহু বিচিত্র শিল্পীর ভেতরে তিনিই ছিলেন পয়লা নম্বর, রঙ্গালয়ের সেরা আকর্ষণ, তাই রঙ্গালয়ের শিল্পীদের নামের তালিকায় তিনি ছিলেন সবার ওপরে। হুডিনি দেখলেন হুডিনি" নামটি হয়ে গেছে দু'নম্বর—তার ওপর জল্‌জল্ করছে আরেকজন শিল্পীর নাম। সে-ই এখন এই রঙ্গালয়ের সেরা আকর্ষণ, হুডিনি তার তলায় !!!

খেপে গেলেন হুডিনি। এ পরাজয় মেনে নিলে চলবে না। সারা প্রমোদ-জগৎকে অচিরে এক নতুন বিস্ময় দিয়ে চমকে তুলে দেখিয়ে দিতে হবে হুডিনি অপরাজেয়। মরিয়া হয়ে লেগে গেলেন গবেষণায়। তারই ফলে আবিষ্কৃত হলো তাঁর বিখ্যাত খেলা "মিল্‌ক্ ক্যান এস্‌কেপ (Milk Can Fscape)।"

১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই এই নতুন খেলাটি দেখাতে শুরু করে জনচিত্ত জয় করে ফেললেন, আবার অদ্বিতীয় আকর্ষণ হয়ে উঠলেন হুডিনি। সংক্ষেপে এর বর্ণনা করা যাক। ধাতুব তৈরি, প্রমাণ সাইজ একজন মানুষ ধরবার মতো বড়ো একটি দুধেব 'ক্যান্' বা ভাঁড়। দুধারের হাতল ধবে দুজন সহকারী সেটিকে মঞ্চের মাঝখানে এনে খাড়া করে রাখলেন। খাড়া অবস্থায় ক্যান্‌টিব উচ্চতা ৪২ ইঞ্চি। কযেক বালতি জল ঢেলে দেওয়া হলো তার ভেতবে। স্নানের পোশাক পরা হুডিনিকে দুজন সহকারী দুদিক থেকে তুলে নামিযে দিলেন ভাঁড়টিব ভেতবে। জল উপচে পড়লো মঞ্চের ওপর বিছানো ক্যানভাসের ত্রিপলেব ওপরে। হুডিনি মাথা নিচু কবে নিলে পর ঢাকনাটা চেপে দিযে ছয দিকে ছয়টি তালা লাগিয়ে আটকে দিলেন দর্শকদেবই কযেকজন প্রতিনিধি। চাবিগুলো রইলো তাঁদেরই জিম্মায। দুধের ভাঁড়টিকে কাপড়ের পর্দা দিযে ঘিবে দেওয়া হলো। সেই তালাবন্ধ ভাঁড়েব ভেতরে বন্দী জল আর হ্যারি হুডিনি। ভাঁড়ের মাথায ছোটো ছোটো কযেকটি ছ্যাঁদা আছে বটে, কিন্তু তার মধ্য দিযে কতটুকু বাতাসই বা ভেতরে যেতে পারে? যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না আসতে পারলে হুডিনির দম বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রচুর।

এক মিনিট···দেড় মিনিট·· দু মিনিট···আড়াই মিনিট। এখনো বেরোচ্ছেন না হুডিনি। দর্শকবৃন্দ উদ্বিগ্ন···তিন মিনিট পার হযে গেলো। হুডিনির দেখা নেই। উদ্বেগে অধীর দর্শকমহল। শীগ্‌গির দেখা হোক কি হলো। কিন্তু না, দরকার হলো না দেখবার। হুডিনি বেরিয়ে এলেন পর্দা ঠেলে, তাঁর গা বেয়ে জল ঝরছে। দাঁড়িয়ে আছে দুধের ভাঁড়টি, যেমন ছিলো ঠিক তেমনি, আধ ডজন তালা দিয়ে আটকানো তার মুখ। আশ্চর্য!!! হুডিনি বেরিয়ে এলেন কি করে??

এ খেলাটি প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে সত্যি সত্যি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে-ছিলো হুডিনির জয়যাত্রার পথে, অগ্রগতিতে। প্রমোদ-জগতে আবার পয়লা নম্বর হলেন হ্যারি হুডিনি। যেখানে খেলা দেখান সেইখানেই দর্শকে দর্শকারণ্য, যে

রঙ্গালয়ে হুডিনির যাদু-প্রদর্শন, তার প্রেক্ষাগৃহে আর তিল ধারণের জায়গা থাকে না।

এ হলো ১৯০৮ সালের কথা। এর ছয় বছর পরের কথা বলি। ৬ই জুলাই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। নিউ ইয়র্ক শহরের ভিক্টোরিয়া রঙ্গালয়। স্টেজের ওপর একটি বড়ো গালিচা পাতা। তার ওপর বিছানো হয়েছে দর্শকদের পরীক্ষিত একটি মসলিনের চাদর। স্টেজের পাশে একধারে এক ফুট এবং লম্বায় দশ ফুট একটি ইস্পাতের বরগা, তলায় রোলার লাগানো। সেই বরগার ওপর অতি দ্রুত বেগে একটি ইঁটের দেয়াল গাঁথছে কয়েকজন অসাধারণ চটপটে রাজমিস্ত্রী। সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উৎসুক দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হচ্ছেন তাদের অসামান্য ক্ষিপ্রতা দেখে। দর্শকদের চোখের সামনে এই নাটকীয় ভাবে ইঁটের দেয়াল গেঁথে তোলার উদ্দেশ্য —দেয়ালের নিরেট বা 'সলিড' খাঁটিত্ব সম্বন্ধে যেন কারো মনে সন্দেহ না থাকে।

দেয়াল গাঁথা শেষ হলো। আট ফুট উঁচু, লম্বায় দশ ফুট, পাশে প্রায় এক ফুট। এইবার দেয়ালটিকে ঠেলে সরিয়ে এনে রাখা হলো স্টেজের মাঝখানে ঐ গালিচা আর মসলিনের চাদরের ওপর. দেয়ালের পাশের (এক ফুট) দিকটা দর্শকদের মুখোমুখি করে, যার ফলে দর্শকেরা দেয়ালের দুই ধারেই এক সঙ্গে সমানভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

স্টেজের পেছন দিকে এবং ডাইনে-বাঁয়ে দুই ধারে—এই মোট তিন দিকে দর্শকবৃন্দের প্রতিনিধিরা বিছানো চাদরের ওপর তিন দিকে কিনারা ঘেঁষে দাঁড়ালেন, তাঁদের পায়ের তলার চাপে বন্দী হয়ে রইলো সেই মসলিনের চাদর। সামনের দিকটা রইলো দর্শকদের দৃষ্টির পাহারায়। দেয়ালের দুই দিকে মাঝা-মাঝি জায়গা ঘেঁষে দুটি পর্দা-ঘেরা আড়াল তৈরি করা হলো।

দেওয়ালের এক দিকের পর্দার ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন হ্যারি হুডিনি। অদৃশ্য হয়ে গেলেন পর্দার আড়ালে। একবার ওপরে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে জানালেন "আমি এইখানে রয়েছি।" নামিয়ে নিলেন দুহাত। অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো মঞ্চের নেপথ্যে।

একটু পরেই……ওকি? হ্যারি হুডিনির দুহাত নড়তে দেখা গেলো দেওয়ালের উলটো দিকের পর্দার ওপরে। "এবার এইখানে এসে পড়েছি আমি" বলে পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দেখা দিলেন হ্যারি হুডিনি!

একি আশ্চর্য ভুতুড়ে ব্যাপার? ঠাসা গাঁথুনির দেওয়াল ভেদ করে এপার

থেকে ওপারে কি করে চলে গেলেন হুডিনি? নিজের চোখকেও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনো মুখে ফুটছে না উল্লাস বা অভিনন্দন, কোনো হাতে পড়ছে না তালি। অভাবনীয় বিস্ময়ে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। দেয়াল টপকে পার হননি; এপাশ বা ওপাশ দিয়েও ঘুরে যেতে পারেননি, চারদিকেই তো সতর্ক দৃষ্টির পাহারা। দেয়ালের তলা দিয়েও যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ দেযালের তলায় ইস্পাতের বরগা স্টেজের মেঝের থেকে মাত্র ইঞ্চি তিনেক উঁচু, তারই তলায় গালিচা আর মসৃলিনের চাদর পাতা; এই তিন ইঞ্চি ফাঁকের মধ্য দিয়ে একটা আস্ত মানুষ গলে যেতে পারে না। তাহলে হুডিনি দেযালের ওপারে পৌঁছলেন কি করে? সবার মনে এই প্রশ্ন, কিন্তু কোনো মনে কোনো সন্তোষ-জনক জবাব নেই। বিস্ময়ের চরম। এর আগে কযেক বছর ধরে নানা রকম বিস্ময়কর 'পলাযনী' খেলা দেখিযে এসেছেন যাদুকর হুডিনি। দড়ি দিযে অনেক রকমে জটিল কায়দায় বাঁধা হযেছে তাঁকে: সে বাঁধন থেকে পালিযেছেন তিনি। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরিযে তাঁকে আটকে রাখা যায়নি। তাঁকে থলির ভেতর পুরে থলির মুখ বেঁধে গেরোব ওপর শীল-মোহর করে দেওযা হযেছে; তিনি বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু থলের বাঁধন, শীল-মোহর যেমন ছিলো ঠিক তেমনই রয়ে গেছে। তাঁকে কাঠের প্যাকিং বাক্‌সে পুরে বাক্‌সেব ডালা পেরেক মেরে আটকে দেওয়া হয়েছে; বাক্‌সো যেমন পেরেক মারা ছিলো তেমনই রযে গেছে, হুডিনি পালিয়ে এসেছেন তার ভেতর থেকে। বন্ধ কফিন, লোহাব বযলার, দড়ি দিয়ে বাঁধা ট্রাঙ্ক, তালা দিযে মুখ বন্ধ করা জল ভরা দুধের ভাঁড়—কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, সব কিছুর ভেতর থেকেই তিনি রহস্যজনকভাবে পালিযে বেরিয়ে এসেছেন। তারপর তাঁর বিখ্যাত "চাইনিজ ওযাটার টরচার সেল" অর্থাৎ "চীন দেশীয় জল-নির্যাতন প্রকোষ্ঠ" নামক লোমহর্ষক খেলা। এ খেলায় পর্দা উঠতেই দেখা যেতো স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি কাঠের ক্যাবিনেট, তার সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কাঁচের দেয়াল। প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেটটি সামনে কাঁচ লাগানো একটি জলাধার বিশেষ। তাই ভেতর হোস-পাইপ দিয়ে কিছুটা উঁচু পর্যন্ত জল ভরে দেওয়া হলো। হুডিনি স্নানের পোশাকে স্টেজের ওপর শুয়ে পড়লেন। একটি কাঠের চৌকোর দুটি ছ্যাঁদার মধ্যে তাঁর দুটি পা ভালো করে আটকে দেওয়া হলো। দড়ির সাহায্যে স্টেজের ওপর দিকে চৌকো কাঠটিকে তুলে নিয়ে মাথা নিচু ঝুলন্ত অবস্থায় হুডিনিকে দেওয়া হলো ঐ জলপূর্ণ নির্যাতন প্রকোষ্ঠের ভেতর

ধীরে ধীরে নামিয়ে। জলের তলায় ডুবে গেলো তাঁর মাথা থেকে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি। কাঠের চৌকোটি তখন ক্যাবিনেটের ওপরের ফ্রেমে আটকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এই ক্যাবিনেটটিকে ঘিরে দেওয়া হলো কাপড়ের পর্দা দিয়ে। কিছুক্ষণ বাদেই পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ালেন হুডিনি, মুখে হাসি আর সারা গায়ে জল। দর্শকরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন "টরচার সেল" যেমন ছিলো তেমনই আছে, ওপরটা তেমনই তালা দিয়ে আটকানো, ভেতরটা তেমনই জলভরা। তাহলে তার ভেতর থেকে হুডিনি পালিয়ে বাইরে চলে এলেন কি করে? অসংখ্য মাথা ঘামলো এই রহস্য নিয়ে, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া গেল না।

এই ধরনের আরো নানারকম 'পলায়নী' খেলা দেখিয়ে এসেছেন হুডিনি এতোদিন। এবারে চোখের সামনে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন তিনি নিরেট ইঁটের দেয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।

এই খেলাটির কথা মনে করেই এখনো হুডিনিকে বলা হয় 'the man who walked through walls'—"যিনি দেয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতেন।"

অদ্ভুতকর্মা হুডিনির জীবনকালেই তাঁর সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত কিংবদন্তী চালু হয়েছিল; এবং এর অনেকগুলো চালু করেছিলেন হুডিনি নিজেই কায়দা করে। কৌশলে নিজের ঢাক জায়গা মতো এবং মওকামতো পিটতে এবং অপরকে দিয়ে পিটিয়ে নিতে চমৎকার জানতেন তিনি। জনগণের মনে কি ভাবে পাইকারি হারে শিহরণ জাগাতে হয়, নিজেকে কি কৌশলে বহুর আলোচনার বিষয়ে পরিণত করতে হয়, সে বিদ্যায় তাঁর ছিলো অসাধারণ সহজ-পটুত্ব।

জীবনে অতি সামান্য শুরু থেকেই অতি অসামান্য পরিণতিতে পৌঁছেছিলেন অবিস্মরণীয় হ্যারি হুডিনি। কি নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের জয়যাত্রা?—অদম্য সাহস, অসীম আত্মনির্ভরতা আর নিজের প্রতিভায় সীমাহীন বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তাঁকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল। আপন প্রতিভায় এই অটুট বিশ্বাসের জোরেই তিনি বহু বাধা, বহু ব্যর্থতা, বহু হতাশা, বহু বিপর্যয় অতিক্রম করে বিশ্বের যাদু-জগতে সাফল্যের চূড়ায় উঠেছিলেন।

'পলায়নী' যাদুর অদ্বিতীয় যাদুকর হুডিনি হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী মুক্ত আত্মার প্রতীক, কোনো বন্ধন যাঁকে বাঁধতে পারে না।

এপ্রিল, ১৮৭৪ থেকে অকটোবর ১৯২৬ পর্যন্ত সাড়ে বাহান্ন বছর বেঁচেছিলেন

হ্যারি হুডিনি। এরই ভেতরে তিনি প্রতিভা, কর্মশক্তি একাগ্র সাধনা ও সিদ্ধির যে প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য দেখিয়ে গেছেন তার তুলনা বিরল।

হ্যারি হুডিনিব আসল নাম ছিলো এহরিক ভাইস (Ehrich Weiss)। তাঁর বাবা ডাঃ মায়ার স্যামুয়েল ভাইস ছিলেন হাঙ্গেরির বুদাপেস্ত শহরের অধিবাসী একজন ইহুদী 'রাব্বি' বা পুরোহিত। সেখান থেকে তিনি সপরিবারে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন। ডাঃ ভাইস ছিলেন ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত এবং গরিব।

এহরিকের স্বাস্থ্য ছিলো ভালো এবং ছোটোখাটো হলেও তাঁর দেহটি ছিলো মজবুত, সুগঠিত, কষ্টসহিষ্ণু। নানারকম শারীরিক কসরতে, সাঁতারে, দৌড়ঝাঁপে আর দৈহিক শক্তির খেলায় তিনি পাকা হয়ে উঠতে শুরু করলেন অল্প বয়স থেকেই।

অভাবের সংসার। এহরিক কিছুদিন রাস্তায়-রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করে তারপর চাকরি নিলেন একটি নেকটাই তৈরির কারখানায়। তাঁর কাজ হলো নেকটাইর কাপড় কাটা। পাশের টেবিলের সহকর্মী জ্যাক হেম্যানের ছিলো যাদুবিদ্যার নেশা। এহরিকের যাদুবিদ্যার হাতেখড়ি হলো এরই কাছে।

কিছুদিন পরেই এহরিকের হাতে পড়লো উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁ-র (Robert Houdin) জীবনস্মৃতি গ্রন্থখানা। যাদু সম্রাটের আত্মকাহিনী পড়ে আত্মহারা হলেন এহরিক। তাঁর মনে হলো ফরাসী দেশের একজন সাধারণ ঘড়ির মিস্ত্রীর ছেলে, উকিলের কেরানি রবেয়ার উদ্যাঁ যদি যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসেবে নিয়ে জীবনে অমন বিপুল সাফল্যগৌরব অর্জন করতে পেরে থাকেন, তাহলে একজন পণ্ডিত 'রাব্বি'-র পুত্র তিনিই বা যাদু-সাধনা করে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারবেন না কেন?

বইখানা পড়ে মুগ্ধ হলেন এহরিক, নির্ধারিত হয়ে গেলো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন। উদ্যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাদুবিদ্যা সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে তিনিও হবেন বিখ্যাত, বরেণ্য, স্বনামধন্য, চিরস্মরণীয়।

সহকর্মী বন্ধু—নেক-টাই কারখানার সেই জ্যাক হেম্যান, যার কাছে এহরিকের যাদুবিদ্যায় হাতেখড়ি—বললেন উদ্যাঁ (Houdin) নামের শেষে একটি "আই" অক্ষর জুড়ে দিলে তার মানে হবে 'উদ্যাঁ-র মতো'। এহরিক এই পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। 'হুডিনি'—যার ফরাসী উচ্চারণ 'উদ্যাঁ'—নামের শেষে 'আই' বসিয়ে

হলো 'হুডিনি' (Houdini)। তখন আমেরিকার যাদু-জগতের দিক্‌পাল ছিলেন হ্যারি কেলার, এবং 'হ্যারি' নামটিও 'এহরিক' নামের বেশ কাছাকাছি। অতএব 'হুডিনি'-র আগে বসল 'হ্যারি'। এইভাবে এহরিক ভাইস হলেন 'হ্যারি হুডিনি' (Harry Houdini)।

আরেকখানা বইও হুডিনির জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয়। বইটি বেনামে একজন ভৌতিক মিডিয়ামের লেখা। বইটির নামের বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় "একজন ভৌতিক মিডিয়ামের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—ধাপ্পাবাজ মিডিয়ামদের ব্যবহৃত ফাঁকির কৌশলগুলির বিশদ ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়াম প্রণীত।"
(Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed—a Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums—By A Medium)

বইটিতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো ছিলো দড়ির বাঁধন এবং অন্যান্য বিভিন্ন রকমের বন্দিদশা থেকে কি কৌশলে মুক্তি পেয়ে ফাঁকিবাজ পেশাদার মিডিয়ামরা অন্ধকারে নানারকম ভৌতিক (?) কাণ্ড করে ভৌতিক চক্রে উপবিষ্ট সবাইকে ঠকাতেন। চক্রে যাঁরা বসতেন তাঁরা ভাবতেন মিডিয়ামকে যেভাবে আটকে রাখা হয়েছে, তাতে সেই বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে এতো সব কাণ্ড করা—যেমন বিভিন্ন রকমের বাজনা বাজানো, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা, ছবি আঁকা, টেবিলের ওপর আওয়াজ করা ইত্যাদি—তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব সত্যি সত্যি ভূত এসেই এসব কাণ্ড করছে। অবশ্য আলো জ্বলবার আগেই মিডিয়ামরা বন্ধন দশাতে ফিরে যেতেন ; এবং আলো জ্বলবার পর তাঁদের সেই অসহায় (?) বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করে দিতে হতো।

লোকান্তরিত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রিয়-বিয়োগবিধুর অনেকেই এই মিডিয়ামদের শরণ নিতেন। তাঁদের এই ব্যথা-বিধুরতার সুযোগ নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৌশলী ধাপ্পাবাজ মেকি মিডিয়ামরা এই ব্যথা-বিধুরদের পকেট থেকে প্রচুর টাকা নিজেদের পকেটে আনবার ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেকটি সেয়াঁস্ (Seance) বা ভৌতিক চক্রবৈঠকের জন্য তাঁরা ভালো দক্ষিণা নিতেন, কারণ পরলোক থেকে আত্মা নামিয়ে এনে তাদের দিয়ে চিঠি লেখানো, প্রশ্নের জবাব দেওয়া, বাজনা বাজানো, টেবিল শূন্যে তোলা বা নাড়ানো, টেবিলে

টোকা দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের কাজ করিয়ে নেওয়া প্রচুর সাধনা এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ বলেই তাঁরা দাবি করতেন। যে ব্যাপারগুলোকে এই মিডিয়ামরা অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় বা ভৌতিক বলে চালাতেন, সেগুলো আসলে কতকগুলো ভেলকি, ভোজবাজি বা যাদুর খেলামাত্র।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এ বইখানা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো ঘা দিলো পেশাদার মিডিয়ামদের। শোনা যায় পেশাদার মিডিযামরা যতোদূর পেরেছিলেন পাইকারি-হারে এ বই কিনে কিনে গোপনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বিধাতা কিন্তু এ বইও একখানা ফেললেন হুডিনির হাতে, যেমন ফেলেছিলেন রবেয়ার উদ্যাঁ-র স্মৃতিকথা। হুডিনি ভৌতিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামালেন না, উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বইখানার ভেতর বিভিন্ন রকমের বাঁধন থেকে তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার নানারকম 'পলায়নী' কৌশলের সচিত্র এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পড়ে। এ বই পড়ে হুডিনি শিখলেন দড়ির বিভিন্ন রকমের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার কৌশল, শিখলেন মুখ-বাঁধা এবং মুখের দড়ির গেরোগুলোর ওপর শীল-মোহর করা থলের ভেতর থেকে সব কিছু ঠিক সেই অবস্থায় রেখেই বেরিয়ে আসবার দুটি চমৎকার কৌশল, জানলেন এমন গুপ্ত কৌশলযুক্ত লোহার কলারের কথা যা গলায় পরিয়ে তালাবন্ধ করে আটকে দিলেও তা থেকে ইচ্ছে মতো গলা খুলে নেওয়া যায়।...আরো অনেকরকমের মুক্তিপন্থাও হুডিনি শিখলেন এ বইখানা পড়ে।

হুডিনির কল্পনার দৃষ্টিতে যাদু-জগতে একটা নতুন রাস্তা খুলে গেলো—'পলায়নী' যাদুর। এই বন্ধন-মুক্তি বা পলায়নী যাদুকে যাদুবিদ্যার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বিভাগের মর্যাদায় উন্নীত করবেন তিনি, আর তিনি স্বয়ং হবেন এই পলায়নী যাদুর খেলায় অদ্বিতীয় যাদুকর। সারা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে বলবেন, "কোনো রকমেই আটকে রাখতে পারবে না আমাকে—যে কোনো বন্ধন থেকেই আমি নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে আসবো।"

সতেরো বছর বয়সেই নিজের জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেললেন হুডিনি। ছেড়ে দিলেন নেকটাই কারখানার পাকা চাকরি। যাদুবিদ্যাকেই গ্রহণ করলেন জীবনের একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র পেশা বলে। নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত জীবন এবং জীবিকা ছেড়ে পা বাড়ালেন অনিশ্চিত, বাধা-বিঘ্নসংকুল ভবিষ্যতের দিকে।

এই সময় হুডিনির আলাপ হলো অস্টেলিয়া থেকে আগত জর্জ ডেক্স্টারের

সঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের দড়ির বাঁধন থেকে এবং হাতকড়া থেকে মুক্ত হবার বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন ডেক্স্টার; হুডিনি তালিম পেলেন তাঁর কাছে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সংসারের দায়িত্ব পড়ল হুডিনির ঘাড়ে। হুডিনি তখন শস্তায় এখানে-সেখানে যাদুর খেলা দেখিয়ে যা রোজগার করছেন তা অতি সামান্য।

কি ছিলো বিধাতার মনে, এমনি সময় একজন দুস্থ যাদুকর তাঁর একটি বাক্সের খেলা নামমাত্র দামেই বেচে দিতে চাইলেন; হুডিনি টাকা ধার করে সেই বাক্সো আর গুপ্ত কৌশলটি কিনে নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

কাঠের বাক্সোটি ছিলো আয়তনে একটি ছোটো ট্রাঙ্কের মতো। হুডিনি তাঁর ছোটো ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে—থিয়োডোরের ডাক নাম 'ড্যাশ'—এই খেলাটি এবং আগেকার কিছু কিছু খেলা "হুডিনি ব্রাদার্স" নামে দেখাতে শুরু করলেন। ড্যাশকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে বাক্সোটির ভেতরে পুরে দিয়ে বাক্সোটিকে তালাবন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি তখন বাক্সের সামনে পর্দা টেনে দিয়ে শুধু মুখটুকু পর্দার ফাঁক দিয়ে বার করে রেখে গুনতেন "এক···দুই···" আর মুখ সরিয়ে নিতেন পর্দার আড়ালে। "তিন" বলার সঙ্গে সঙ্গে যে মুখটি পর্দার এপারে বেরিয়ে আসতো, সেটি আর হ্যারির নয়, ড্যাশের। সঙ্গে সঙ্গেই পর্দাটি সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতো ড্যাশ। বাক্সের তালা খুলে দেখা যেতো ভেতরে রয়েছেন হ্যারি হুডিনি, তাঁর দুটি হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা।

উনিশ বছর বয়সে হ্যারি বিয়ে করলেন কুমারী বিয়াট্রিস রাহনার। তারপর থেকে বাক্সের খেলায় ড্যাশের বদলে হ্যারির সঙ্গিনী হতেন বিয়াট্রিস, ওরফে 'বেসি' হুডিনি। মেয়েদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অসাবধানে অ্যাসিড ফেলে বেসির গাউন পুড়িয়ে ফেলেছিলেন হ্যারি হুডিনি, আর তার ক্ষতি-পূরণ করেছিলেন মাকে দিয়ে একটা নতুন গাউন বানিয়ে দিয়ে। সেই গাউন পৌঁছে দিতে গিয়ে আলাপ, খাতির, বিবাহ। বিয়ের পরই 'বেসি' জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ যাদুকর স্বামীর হাত ধরে। হুডিনি দম্পতি খেলা দেখাতে শুরু করলেন ছোটোখাটো জায়গায়, প্রধানত বিভিন্ন পানশালায়। বেলা দশটা থেকে রাত দশটার ভেতর দিনে দশবার করে খেলা দেখিয়ে দুজনে মিলে দক্ষিণা পেতেন হপ্তায় কুড়ি ডলার মাত্র। পরে এঁরা কাজ পেলেন একটি সার্কাসে। নিজেদের খেলাগুলো তো দেখাতেনই, তার ওপর মাঝে মাঝে হ্যারিকে জঙ্গল থেকে ধরে

আনা একটি দুরন্ত জংলি মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে হতো। হ্যারি বিকট চেহারা জংলি মানুষের ছদ্মবেশে খাঁচার ভিতর বসে বসে কাঁচা মাংস খাবার ভান করতেন আর মাঝে মাঝে জংলি কায়দায় চিৎকার আর মুখভঙ্গি করতেন। হ্যারি হুডিনির সার্কাস জীবনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে. বাংলার বিখ্যাত যাদুকর গণপতিও প্রথমে তাঁর যাদুর খেলা দেখাতেন বোসের সার্কাসে ; স্বাধীন-ভাবে যাদু প্রদর্শন শুরু করেন তার পরে।

সার্কাসে খেলা দেখানো ভালো লাগলো না হুডিনির ; ছেড়ে দিলেন সার্কাস। নতুন ধরনের খেলায় তৈরি করে নিলেন 'বেসি'কে। মিডিয়ামের ভঙ্গিতে বসে চোখ বুজে বেশ তাড়াতাড়ি সমাধিস্থা হয়ে পড়বার অভিনয়ে পরম পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন বেসি হুডিনি। ছোটো ছোটো শহরে বা শহরতলিতে যেখানেই তাঁদের এই নতুন 'আত্মিক' বা সাইকিক শক্তির খেলা দেখাতে যেতেন হুডিনি দম্পতি, সেখানেই হ্যারি নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য সেখানকার সমাধি-ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সমাধিস্তম্ভের ওপর খোদাই করা লেখা পড়ে পড়ে মনে রেখে দিতেন, এখানে সেখানে আড্ডায় গল্পগুজব শুনতেন আড়ি পেতে, এমন কি ক্যান্‌ভাসার সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কথায় কথায় বিভিন্ন পরিবারের নানা কথা জেনে নিতেন। হ্যারির স্মরণশক্তি ছিলো অসামান্য প্রখর, বেসিও ছিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী। কখনো কখনো হ্যারি উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে একজন স্থানীয় লোককে নিযুক্ত করতেন ; লোকটির কাঁজ হতো প্রেক্ষাগৃহে যাঁরা মিডিয়ামের কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব বা 'বাণী' নিতে এসেছেন, হুডিনির কাছে গোপনে তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া।

গুরুগম্ভীর, অলৌকিক রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হতো হুডিনি দম্পতির মিডিয়ামি অভিনয়ে। একটু নমুনা দেওয়া যাক।

সমবেত সবাইকে সচকিত করে স্বপ্নের আবেশভরা চোখে তরুণ হুডিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন "এ সম্মেলনে একজন বৃদ্ধ মহোদয় উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। তাঁর নাম···তাঁর নাম ইলায়াস। তিনি কি যেন বলতে চাইছেন তাঁর ভাইপোকে। বলছেন, "অলিভার, মন খারাপ কোরো না। জমিটা তাড়াহুড়ো করে এখনি বেচে দিও না। পরে অনেক অনে—ক বেশি দাম পাবে। তোমার সুদিন আসছে, অলিভার।' এই কথা বলতে চাইছেন বৃদ্ধ ইলায়াস।···"

আশ্চর্য, এ ছোকরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন না হয়ে যায় না। ছোকরা

এখানে থাকে না, এসেছে বাইরে থেকে। আসরে উপস্থিত অলিভারকে তার চিনবার কথা নয়। ইলায়াস মারা গেছেন বছর দুয়েক হলো ; ঐ জমিটির ওপর তাঁর মমতা ছিলো অসামান্য। জীবিতাবস্থাযও জমি বিক্রির প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি খেপে উঠতেন। এসব পুরনো কথাও তো এই আগন্তুক ছোকরা'র জানবার কথা নয়। বৃদ্ধ ইলায়াসেব অশরীরী আত্মা কি আজ এই আসরে এসেছে ? তাকে দেখে তার মনের কথা শুনতে পাচ্ছে এই রহস্যময় তরুণ ? অলৌকিক, সত্যিই অলৌকিক। স্তম্ভিত বিস্ময়ের শিহরণ জাগলো সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে আসলে ধাপ্পা, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, আগে যা বলেছি তাই যথেষ্ট। অবশ্য এই ধাপ্পার সাফল্যের মূলে হুডিনির তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অদম্য সাহস এবং অনবদ্য অভিনয়। তাছাড়া হুডিনির চোখ দুটিতে ঈশ্বরদত্ত এমন একটি বিশেষত্ব ছিলো যা সহজেই অভিভূত করতো মানুষকে।

আরেক দিনের (অথবা সন্ধ্যার) কথা বলি। হুডিনি দম্পতির আত্মিক শক্তির খেলা দেখতে আসছে নানা রকমের মানুষ, নেপথ্য থেকে দেখছেন হ্যারি হুডিনি। তাঁর বিশেষ নজর পড়লো এক ভদ্রমহিলার দিকে, যিনি তার ছোটো ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন অমন করে দুটো হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে সাইকেল চালানো নিরাপদ নয়, হঠাৎ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

খেলার আসরে হুডিনি অলৌকিক দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দর্শনের ভান করে ভদ্রমহিলার উদ্দেশে বললেন "আপনার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি···ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি···একখানা হাত ভাঙা···না না, এ দৃশ্য বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের।"

বলা বাহুল্য, হুডিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঢিল ছুঁড়েছিলেন সম্পূর্ণ আন্দাজে। কিন্তু--কি ছিলো বিধাতার মনে—ঠিক তার পরদিনই দুটো হ্যাণ্ডেল ছেড়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ছোকরা হাত ভেঙে বসলো। ঝড়ে কাক মরলো, ফকিরের কেরামত বাড়লো। সারা শহরে তো বটেই তার চারধারেও অনেক দূর পর্যন্ত দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়লো হুডিনির বিস্ময়কর, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির খ্যাতি।

হুডিনি ঠিক করে ফেললেন আর নয়, এবার এই অলৌকিক ব্যবসা থেকে মানে মানে বিদায়। আন্দাজী ভবিষ্যদ্বাণী বারবার মিলবে না, অথচ দর্শকরা এর পর থেকে তাই দাবি করবে। তাছাড়া প্রিয়বিয়োগবিধুর যাঁরা লোকান্তরিত প্রিয়জনের 'বার্তা' বা 'বাণী' পেতে আসেন, তাঁদের বেদনার সুযোগ নিয়ে ভাঁওতা দিয়ে

ঠকানোর কল্পনাটাই অত্যন্ত খারাপ লাগলো হুডিনির। ধর্মপ্রাণ পিতার পুত্র তিনি, অতো নিচুতে নামতে পারবেন না কিছুতেই। ছেড়ে দিলেন মিডিয়ামি ব্যবসার পথ। যোগ দিলেন ওয়েল্‌শ্‌ ব্রাদার্সের ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের দলে, ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা দেখাতে।

পরবর্তী জীবনে ধোঁকাবাজ পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন হুডিনি, তার মূলে ঐ একই ধারণা : মানুষের গভীর বেদনার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার চেষ্টা অতি জঘন্য কাজ। এর তুল্য পাপ আর নেই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ। শিকাগো শহর। জেলখানার কর্মচারী অ্যাণ্ডি রোহানের অফিস-ঘরে বসে তরল জলযোগ সহযোগে খোশগল্পে মশগুল কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার। জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন হুডিনি দম্পতি, দেখাশোনা করছেন শ্রীমতী বেসি হুডিনি। একটু আগে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে পলায়ন-যাদুকর হ্যারি হুডিনিকে হাতে হাতকড়া আর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি আটকে দিয়ে একটা সেলের (cell) ভেতর তালাবন্ধ করে রেখে এসেছেন স্বয়ং অ্যাণ্ডি রোহান। শিকাগোর পুলিশ বিভাগকে হুডিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন ওভাবে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না, তিনি মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন। সহসা হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন হ্যারি হুডিনি। রিপোর্টাররা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন না। বললেন, "আপনার কাছে বোধহয় নকল চাবি লুকানো ছিলো।"

হুডিনি বললেন, "বেশ, আপনাদের যদি সেই সন্দেহই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে আমার দেহ তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাসি করে ঐ অবস্থাতেই আমাকে আগেকার মতো আবার সেলের ভেতর বন্দী করে রাখুন।"

তাই করা হলো। হুডিনি তবু মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন—এবার বরং আরো তাড়াতাড়ি।

গরাদের সারির ফাঁক দিয়ে সেলের ভেতরে লোহার বাঁধনে হাত-পা বাঁধা হুডিনির ছবিসহ খবর ছাপা হলো পরদিন খবরের কাগজে ভালো জায়গা জুড়ে।

বলা বোধহয় বাহুল্য, ফোটোগ্রাফ ব্যবস্থার পেছনে ছিলো হুডিনির উদ্যোগ।

এমন দুর্দান্ত প্রচার হুডিনি আগে কখনো পাননি। জেলখানায় সেলের

ভেতর থেকে হুডিনি পালিয়েছেন। প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। আত্মপ্রচারের এই বিরাট সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না হুডিনি। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, তবু বেশ কিছু ডলার খরচ করে তিনি নিউ ইয়র্কের রঙ্গজগৎ সম্পর্কিত একটি পত্রিকায় টেলিগ্রামে একটি বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, "হাতকড়ার রাজা" (King of Handcuffs) হুডিনিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তিনজন ডাক্তার তাঁর সারাদেহ তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাসি করার পর তাঁর মুখ বন্ধ করে শীলমোহর করে দেওয়া হয়েছিল ; হুডিনি সেই অবস্থাতেই তাঁদের লাগানো হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি, বেল্‌ট্‌, পাগলদের অচল করে রাখবার জামা (Strait Jacket) প্রভৃতি সব রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হুডিনি বেসিকে নিয়ে গেলেন লণ্ডনে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো সংস্কৃতি এবং আমোদ-প্রমোদের জগতেও তখন লণ্ডন শহরের খ্যাতি ও মর্যাদা অসামান্য। লণ্ডনের "আল্‌হাম্‌রা" রঙ্গালয় ছিলো প্রমোদ-জগতের শিল্পীদের কাছে পরম লোভনীয় তীর্থভূমি। সেখানকার কর্ণধার ডাণ্ডাস স্লেটার এই সদ্য-আগত তরুণ মার্কিন যাদুকরকে বললেন, "তুমি যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারো, তাহলে দু-হপ্তার জন্য তোমাকে আল্‌হামরা রঙ্গালয়ে খেলা দেখাবার সুযোগ দিতে পারি।"

চ্যালেঞ্জ! হুডিনি গ্রহণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, "এখ্‌খুনি চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।" গেলেন দুজনে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল বললেন, "এখানে শস্তা তামাশা চলবে না। হাত-কড়া যদি লাগাই তো সত্যিকারের হাতকড়াই লাগাবো, আর তার চাবিটি তোমার হাতে দেবো না।"

হুডিনি বললেন, "যতো জোড়া খুশি হাতকড়া আর পায়ে বেড়ি লাগান। আপত্তি নেই।"

মেলভিল তাঁর টেবিল থেকে একজোড়া 'রেগুলেশন' হাতকড়া নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হুডিনিকে সঙ্গে আসতে ইশারা করলেন। তারপর হঠাৎ হুডিনির দুটি হাত একটি থামের দুদিকে চালিয়ে দিয়ে দুটি হাতে হাতকড়া পরিয়ে আটকে দিলেন। থামের সঙ্গে আটকে গেলেন হুডিনি; হাতকড়া খুলে না দিলে থাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন না।

স্লেটারের দিকে তাকিয়ে মেলভিল হেসে বললেন, "চলুন আমরা যাই। ঘণ্টা খানেক বাদে এসে একে খুলে দেওয়া যাবে।"

দুজনে এগিয়ে যাচ্ছেন, শুনলেন হুডিনির পিছু ডাক: "একটু দাঁড়ান। আমিও যাবো আপনাদের সঙ্গে।"

দুজনে পিছু তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন হুডিনি মুক্ত। এবারে হাসির পালা হুডিনির; মেলভিলের হাতে হাতকড়া ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি।

খুশি হয়ে অভিনন্দন জানালেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল। সেদিনই হুডিনির সঙ্গে স্লেটারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেলো, আল্‌হাম্‌রা রঙ্গালয়ে দু-সপ্তাহ খেলা দেখাবেন হুডিনি। সারা লণ্ডনে খবর ছড়িয়ে গেলো, লণ্ডন পুলিশের প্রধান কেন্দ্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া হার মেনেছে নবাগত তরুণ মার্কিন যাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন হুডিনি। দু-সপ্তাহের চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুন হুডিনির খেলা চললো ছ'মাস, হুডিনির পারিশ্রমিক সপ্তাহে যাট পাউণ্ড, অর্থাৎ মার্কিন টাকায় তিনশো ডলার।

হুডিনির ম্যানেজার হলেন তরুণ বুকিং এজেণ্ট হ্যারি ডে, যাঁর মাধ্যমে হুডিনি পরিচিত হয়েছিলেন আল্‌হামরার কর্ণধার স্লেটারের সঙ্গে। ডে টেলিগ্রামে যোগা-যোগ করতে লাগলেন ইউরোপের বিভিন্ন রঙ্গালয়ের ম্যানেজারদের সঙ্গে। জার্মানির ড্রেসডেন শহরের সেণ্ট্রাল থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তি হলো, হুডিনি সেখানে যাবেন খেলা দেখাতে।

জার্মান ভাষা ভালোই জানা ছিলো হুডিনির, বাবার কাছে শেখা। ড্রেসডেনে দর্শকমণ্ডলীকে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন জার্মান ভাষায়; সঙ্গে সঙ্গে জয় করে নিলেন সবার হৃদয়। জার্মানিতে তখন চলছে কাইজারের কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা নানাভাবে সংকুচিত, নানা বিধিনিষেধের বন্ধনে বন্দী জার্মান জনসাধারণের মন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল। তাই হুডিনি যখন সব রকমের বন্ধন থেকে রহস্যময়ভাবে নিজেকে মুক্ত করে এসে দাঁড়াতেন, তখন এই অসাধারণ মুক্তি-যাদুকরের সঙ্গে কল্পনায় একাত্মতা অনুভব করে দর্শকবৃন্দ উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠতো।

এরপর পালাক্রমে বহুবার জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে আর ইংলণ্ড থেকে জার্মানিতে যাতায়াত করতে হলো হুডিনিকে, হুডিনি-ভক্ত দর্শকদের চাহিদা

মেটাতে। তারপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর প্রদর্শনী শুরু হলো পারী (Paris) শহরে, রবেয়ার উদ্যাঁর মাতৃভূমিতে। উদ্যাঁর মাতৃভূমি! যে উদ্যাঁর আত্মস্মৃতি পাঠ করে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ যাদুকর হবার, যে উদ্যাঁকে আদর্শ রূপে, 'হিরো'-রূপে অসীম মর্যাদার আসন দিয়েছেন হৃদয়ে। "আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক" (Father of Modern Magic) রবেয়ার উদ্যাঁ! যাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তিনি আজ এতো বড়ো হয়েছেন যে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি আড়াআড়ি চলছে থিয়েটারে-থিয়েটারে।

উদ্যাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে গেলেন হুডিনি। দেখলেন শ্রীমতী উদ্যাঁর সমাধি নেই পাশে। অনুসন্ধানে জানলেন বৃদ্ধা বিধবা বাস করেন নিরালায় পল্লী অঞ্চলে। দেখা করতে গেলেন হুডিনি। পরিচারিকার হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতী উদ্যাঁর কাছে। কার্ডে শুধু একটি মাত্র শব্দ লেখা :

হুডিনি।

কিছুক্ষণ বাদে পরিচারিকা এসে কার্ড ফেরৎ দিয়ে জানালো কর্তামা দেখা করবেন না, হুডিনি নামের কাউকে তিনি চেনেন না। বলেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিলো হুডিনির মুখের ওপর।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের চাইতেও ভয়ানক এ অপমান। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন হুডিনি ; তাঁকে কিছুতেই বোঝানো গেলো না চলতি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করছেন উদ্যাঁর বৃদ্ধা বিধবা, বর্তমান যাদুজগতের সেরা বিস্ময় হুডিনির নামটি তাঁর অজানা থাকা বিস্ময়ের কিছু নয়। প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিলেন হুডিনি। দীর্ঘ অনুসন্ধান, সংগ্রহ আর গবেষণার পর সাত বছর বাদে নিজের খরচে প্রকাশ করলেন বৃহৎ গ্রন্থ "রবেয়ার উদ্যাঁ-র মুখোস উন্মোচন" (The Unmasking of Robert Houdin)। এতে বহু পুরাতন দলিল-পত্র এবং চিত্রের সাহায্যে তিনি প্রতিপন্ন করলেন উদ্যাঁ যে-সব যাদুর খেলা তাঁর নিজের মৌলিক আবিষ্কার বলে দাবি করতেন সেগুলো মোটেই তাঁর মৌলিক আবিষ্কার নয়, পুরনো খেলার নবরূপায়ণ মাত্র ; এবং তাঁর আত্মস্মৃতিও তিনি নিজে লেখেননি, লিখিয়ে নিয়েছিলেন কোনো পেশাদার লেখককে দিয়ে। এতে হুডিনির গায়ের ঝাল মিটেছিল বটে, কিন্তু তিনি অমর যাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁকে তাঁর উচ্চ মর্যাদার আসন থেকে টলাতে পারেননি। বরং শ্রদ্ধেয় উদ্যাঁর প্রতি এভাবে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে যাদুকর মহলে কিছুটা অপ্রিয়ই হয়েছিলেন হুডিনি।

একথা তবু ঠিক যে, যাদুবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে হুডিনির এ গ্রন্থটি পরম মূল্যবান।

পারী শহরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কিছুদিন খেলা দেখিয়ে আবার জার্মানিতে ফিরে গেলেন হুডিনি। কোলোন (Cologne) শহব। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুযারি। আদালতে বিচার শুরু হলো। মানহানির মামলা, নালিশ করেছেন হ্যারি হুডিনি। যাঁর বিরুদ্ধে নালিশ, তিনি হচ্ছেন কাইজার সরকারের একজন প্রবল পরাক্রান্ত পুলিশ কর্মচারী, ভের্নার গ্রাফ (Werner Graff)। দুবন্ত সাহস হুডিনির, তার চাইতেও বেশি সাহস হুডিনির জার্মান উকিল ডাঃ শ্রাইবারের (Schreiber)। কাইজারের পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ!

কোলোন শহরের একটি কাগজে একটি প্রবন্ধে গ্রাফ লিখেছিলেন হুডিনি ধাপ্পাবাজ, শুধু নিজের হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি বা শেকলের বন্ধন থেকেই মুক্ত হতে পারেন, "যে কোনো" হাতকড়া ইত্যাদি থেকে পারেন না। আদালতে বিচারক এবং জুরিদের তিনি বললেন, শেকল দিযে হাত আটকে দিলে হুডিনি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না।

গ্রাফের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হুডিনি। পুলিশের একজন লোক 'রেগুলেশন' শেকলে হুডিনির দুটি হাত আটকে তালাবন্ধ করে দিলেন, যেভাবে অপরাধীদের আটকানো হতো। আদালতে দাঁড়িযে সবার সামনে অনায়াসে দুহাত মুক্ত কবে নিলেন হুডিনি; তালাসমেত শেকল হাত থেকে ঝনাৎ করে খসে পড়লো আদালতের মেঝের ওপর। আদালত রায় দিলেন হুডিনির পক্ষে: ভের্নার গ্রাফকে 'কাইজারের নামে' প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে হুডিনির কাছে।

গ্রাফ আপীল করলেন উচ্চতর আদালতে। সেখানে তিনি বিশেষভাবে তৈরি করানো এমন একটি তালা দিলেন যাকে একবার বন্ধ করে দিলে চাবি দিয়েও খোলা যায় না। হুডিনি সে তালা খুলে দিলেন মাত্র চার মিনিটে! সুতরাং এ আদালতেও গ্রাফ হেরে গেলেন। হেরে আবার আপীল করলেন জার্মানির উচ্চতম আদালতে। পাঁচজন বিচারকের সম্মিলিত রায় হলো: গ্রাফ ত্রিশ মার্ক জরিমানা দেবেন, অন্যথায় ছয় দিনের কারাবাস ভোগ করবেন, তিনটি মামলার খরচ দেবেন হুডিনিকে, এবং হুডিনি এই রায়ের নকল কোলোন শহরের খবরের কাগজগুলোতে একবার ছাপাতে পারবেন গ্রাফের খরচে।

এ রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হুডিনিকে নিয়ে একেবারে মেতে উঠলো জার্মান

জনসাধারণ। কাইজারি পুলিশের দাপটে দাপটে তারা অস্থির, সেই কাইজারি পুলিশকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন হুডিনি। ধন্য হুডিনি! সাবাস হুডিনি!

কাইজারের জার্মানি থেকে এবার চলা যাক জারের রাশিয়ায়। সেখানে রাশিয়ার পুলিশ বিভাগ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, তাঁদের কয়েদি গাড়ি থেকে তিনি কিছুতেই পালাতে পারবেন না। হুডিনি বললেন, "নিশ্চয় পারবো, কিন্তু দোহাই আপনাদের, একটি সাধারণ কয়েদিগাড়ির ভেতর আমাকে আটকাবেন। আর সাধারণ কয়েদিদের বেলায় যেমন তালা লাগান, ঠিক তেমনি লাগাবেন, তার বেশি নয়।" পুলিশ কর্মচারীরা বললেন, "তা হবে না। গাড়ির গরাদগুলো বেশি ঘন করে দেবো, বাইরে তালাও বেশি করে লাগাবো। তাই থেকে আপনাকে পালাতে হবে।" অনেক আপত্তির ভান করে অবশেষে হুডিনি, যেন অগত্যা বাধ্য হয়েই, রাজী হলেন। শর্ত হলো হুডিনিকে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়ির ভেতর পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে পুলিশ কর্মচারীরা এমন জায়গায় সরে যাবেন যেখান থেকে গাড়িটিকে দেখা না যায়। তাঁরা বললেন, "তাই হবে।" তাই হলো। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে, পুলিশ কর্মচারীরা পুলিশ ব্যারাকে বসে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় হুডিনি এসে উপস্থিত। তাঁরা সবাই মিলে ছুটে গিয়ে দেখেন কয়েদিগাড়িটি যেমন তালা লাগানো ছিলো, তেমনি আছে। তাহলে হুডিনি বেরোলেন কি করে? চাবি ছিলো না তাঁর কাছে, আর চাবি থাকলেও গাড়ির ভেতর থেকে বাইরের তালার নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিলো না।

হুডিনির প্রতিভায় এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে রাশিয়ার জার (Czar) তাঁকে একটি মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন।

খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, এবং বিস্ময়প্রিয় জনসাধারণকে নব নব বিস্ময় দিয়ে চমকে দেবার জন্য হুডিনি যে কঠোর পরিশ্রম এবং দৈহিক ক্লেশ সহ্য করতেন তার তুলনা মেলে না। অবশ্য অমন শক্ত শরীর ছিলো বলেই তা সম্ভব হতো। এই শক্ত শরীরের বড়াই করতেন হুডিনি; শেষকালে পরোক্ষভাবে তাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো। সেই কাহিনীই বলি।

তখন মনট্রিল শহরে খেলা দেখাচ্ছিলেন হুডিনি। বিশ্রাম করছেন রঙ্গালয়ের সাজঘরে। তিনজন ছাত্র এলো দেখা করতে। তাদের ভিতর একজন বক্সিং-এ ওস্তাদ। সে কথায় কথায় বললে, "আপনি নাকি কোমরের ওপর (মুখ বাদ দিয়ে) অন্য কোনো জায়গায় ঘুষি মারলে অনায়াসে সহ্য করতে পারেন?"

হুডিনি একটা চিঠি দেখছিলেন, আধা-আনমনাভাবে বললেন, "পারি বই কি।" সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটি দু-তিনটি প্রচণ্ড ঘুষি চালালো হুডিনির তলপেটে। অতর্কিতে আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠলো হুডিনির মুখ। পেট চেপে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, "ওভাবে নয়। আগে আমাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। নাও, এইবার মারো যতো খুশি।" বলে শক্ত করলেন পেটের পেশীগুলো। ছেলেটি আবার ঘুষি চালালো ; যেন লোহার দেয়ালে আহত হয়ে ফিরে এলো তার বদ্ধমুষ্টি।

কিন্তু আগেকার চোটগুলো বড়ো মারাত্মক হয়েছিল। তারই ফলে কয়েক-দিন পর, ৩১শে অকটোবর, ১৯২৬ খৃঃ মারা গেলেন হ্যারি হুডিনি।

যাদুকর গণপতি

"শান্তিনিকেতনে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা (ইলিউশন বক্স)। এই আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক যাদুকর আরেক যাদুকরের সামনে বসে আছেন।..."

উদ্ধৃতিটি শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি-চিত্রণ' গ্রন্থ থেকে। ইলিউশন বক্সটি ছিলো একটি বড়ো কাঠের বাকসো। খেলা আরম্ভ হবার আগে সন্তোষ মজুমদার, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে বেশ ভালোভাবে বাকসোটি পরীক্ষা করলেন। গণপতির দুখানা হাত পিছমোড়া করে এবং দুখানা পাও কষে বাঁধা হলো। তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে সেই বাকসে পোরা হলো। বাকসোটি চারদিক থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে বাকসের সামনে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা ভেদ করে দুখানা হাত বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হলো দেখা গেলো বাকসো বন্ধই আছে।

বাক্সের ওপর বাঁয়া-তবলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেই দর্শকদের ফরমায়েশ মতো তাল বাজতে লাগল বাঁয়া-তবলায়। ভুতুড়ে ব্যাপার! পর্দা সরে গেলো, বাকসো পূর্ববৎ। আবার পর্দার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন। বলা হলো, আপনারা যাদুকরকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিন যেন ঐ চিহ্ন দেখে চিনে নিতে পারেন। যাদুকরকে কেউ পরিয়ে দিলেন আংটি, কেউ চশমা। যাদুকর পর্দার আড়ালে যেতেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলো। দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাকসো খুলে, মুখ বাঁধা থলি খুলে দেখা গেলো দর্শকদের দেওয়া আংটি আর চশমা পরা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন তেমনি হাত-পা বাঁধা যাদুকর গণপতি।

গণপতির আরেকটি আশ্চর্য খেলা ছিলো "ইলিউশন ট্রী" অর্থাৎ যাদু গাছ। গাছটি ছিলো গাছ নয়, একটি খাড়া ক্রস। সেই ক্রসের সঙ্গে তাঁকে শেকল, হাতকড়া ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে আটকে দেওয়া হতো যে, তা থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন ঐ ইলিউশন বক্স, ঠিক

তেমনি এই ক্রসের বাঁধনও তাঁকে বন্দী করে রাখতে পারেনি। তিনি দ্রুতবেগে তা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঐ অবস্থাতেই ফিরে যেতেন। তাছাড়া ঐ কাঠের ক্রসে আটকানো অবস্থাতেই তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে পর্দার ভেতর যে পোশাক ছুঁড়ে দেওয়া হতো, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখা যেতো গণপতি সেই ছুঁড়ে দেওয়া পোশাকটি পরে ফেলেছেন, অথচ তাঁর বন্ধন অবস্থা তেমনই রয়েছে।

উক্ত দুটি খেলাই অভাবনীয় ক্ষিপ্রতা এবং নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে দেখাতেন যাদুকর গণপতি। দুটি খেলাকেই ভৌতিক বলে মনে হতো ; অলৌকিক সাহায্য ছাড়া অমন অসম্ভব সম্ভব হয় কি করে? সহজ বিশ্বাসী সেকেলে দর্শকদের কথা নাই বললাম, যাঁরা জানতেন ম্যাজিক জিনিসটা আগাগোড়া ফাঁকি, নিতান্ত একেলে সেই নাস্তিক দর্শকদের মনেও যাদুকর গণপতির ঐ কাণ্ড দেখে খটকা লাগতো : তবে কি সত্যিই গণপতি তন্ত্রসিদ্ধ হয়ে অলৌকিক ভুতুড়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন? মিরাক্‌ল-এর যুগ কি তাহলে পুরোপুরি বিগত হয়নি?

গণপতির দেব-দেবীতে ভক্তি ছিলো অসাধারণ, তিনি পূজো-আর্চা করতেন নিয়মমতো, খুব ছোটো করে চুল ছাঁটতেন এবং টিকি রাখতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে লোকের মনে এ বিশ্বাস সহজেই হতো যে, তিনি তন্ত্রের সাধনা করেন এবং তার ফলে নানা রকমের অলৌকিক শক্তি তাঁর করায়ত্ত। সাধারণের মনে তার অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভীতিমিশ্রিত বিশ্বাস যাতে বজায় থাকে সেদিকে তিনি যত্নবান ছিলেন ; পেশাদার এনটারটেনার অর্থাৎ জনগণ-মনোরঞ্জক রূপে এর মূল্য তিনি বুঝতেন।

গণপতির এ দুটি খেলা সর্বশেষ দেখেছিলাম ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে একটি স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত যাদুকরের কুম্ভমেলায় (স্বনামধন্য যাদুকর রাজা বোসও সেই যাদু কুম্ভমেলায় যোগ দিয়েছিলেন।)। গণপতির বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি হবে। সে বয়সেও অলৌকিক শক্তিমান যাদুকরের ভুমিকায় অভিনয় করে তিনি আমাদের চোখে প্রায় অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যেই বিস্ময়ের যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন, তার তুলনা আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

গণপতির পিতৃদেব ছিলেন শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী জমিদার। বালক গণপতির ঝোঁক লেখাপড়ার দিকে একেবারেই ছিলো না। পাড়ায় গান-বাজনার

চর্চা ছিলো, তিনি তাইতেই মেতে ছিলেন। অভিভাবকদের চেষ্টা হলো কি করে লেখাপড়ায় গণপতির খানিকটা মন বসানো যায়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। লেখাপড়া তাঁকে কিছুতেই করানো গেলো না। তিনি দক্ষ হলেন শুধু গানে আর তবলা বাদনে। মূর্খ হয়ে থাকা যে একটা লজ্জার বিষয় হতে পারে, সে কথাটা কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকলো না। লেখাপড়া না শিখলে জমিদারি সম্পত্তির অংশ তাঁকে দেওয়া হবে না—এই ভয় দেখানো হলো তাঁকে। কিন্তু এই শাসানির ফল হলো উলটো। গণপতির জেদ এবং আত্মমর্যাদাবোধ ছিলো প্রচণ্ড রকমের। এ ব্যাপারে বাড়ির বড়োদের ওপর ভয়ানক চটে গিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো কি আঠারো (এ সব কথা শুনেছি গণপতির প্রিয় শিষ্য, বর্তমান বাংলার স্বনামধন্য যাদুকর দেবকুমারের মুখে)।

পালিয়ে তিনি শ[illegible] করেছিলেন, কারণ তা না হলে বাংলার তথা ভারতের যাদুচর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় গণপতিকে আমরা পেতাম না। বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি বাংলার বাইরে নানা স্থানে ভবঘুরেপনা করে বেড়ালেন, সাধু সন্ন্যাসীর দলে মিশলেন, তাঁদের অনেক কলকেতে অনেক গাঁজা সাজলেন, তাঁদের কাছ থেকে নানা রকমের গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ভবিষ্যৎ গোনবার কায়দা, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের নানা অলৌকিক দাওয়াই ইত্যাদি শিখে নেবার জন্য। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সাপুড়ে সাহজী (অন্নদাদিদির স্বামী) সাপ জব্দ করার মিথ্যে মন্ত্র শেখাবার লোভ দেখিয়ে ইন্দ্রনাথকে যেমন ঘুরিয়েছিলেন, [illegible]কজন সাধু [illegible]কটা তেমনিভাবেই ঘুরিয়েছিলেন গণপতিকে। গুপ্ত বিদ্যা শিখবার জন্য তাঁর এ আ[illegible]যান একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়, কিন্তু যতোটা পাবেন বলে আশা করেছিলেন তার তুলনায় পেয়েছিলেন সামান্যই। এই সামান্যকেই কাজে লাগিয়ে অসামান্য করে তুলেছিলেন গণপতি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এই ঘোরাঘুরির সময় তিনি দু'এক জন যাদুকরের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, তাই থেকে তাঁর যাদু-জীবনের সূত্র[illegible]ত।

ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসে গণপতি যোগ দিলেন প্রফেসর বোসের সার্কাসে। "বোসেজ সার্কাস" (Bose's Circus) তখন শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে বিখ্যাত। এ দলে কয়েকজন বেশ ভালো সার্কাস খে[illegible]ড় ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন সুশীলা নামে একটি বাঙালী মেয়ে। সাহসে এবং দৈহিক শক্তিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ, শোনা যায় পাঞ্জা [illegible] কবজির জোরে অনেক জোয়ান গোরা সৈনিকও তাঁর কাছে হার মেনে[illegible] সুশীলা দেখাতেন বাঘের খেলা।

একে মেয়ে, তায় বাঙালী মেয়ে, তাই সুশীলার দুঃসাহসিক বাঘের খেলা ছিলো বোসের সার্কাসের সেরা আকর্ষণ। গণপতি সর্বপ্রথম সাধারণ দর্শকদের সামনে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন বোসের সার্কাসে, সার্কাসি খেলার ফাঁকে ফাঁকে। ম্যাজিকে ছিলো তাঁর চমৎকার দক্ষতা, অভিনয়ে—বিশেষ করে কৌতুক অভিনয়েও তিনি কম দক্ষ ছিলেন না, মজাদার যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি সার্কাসের দর্শকদের হাসাতে আর তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন। জনপ্রিয় বোসের সার্কাসের জনপ্রিয় এবং প্রায় অপরিহার্য শিল্পী হয়ে উঠলেন যাদুকর গণপতি। পরে গণপতি যখন তাঁর বিখ্যাত ইলিউশন বক্স্ এবং ইলিউশন ট্রী-র খেলা দেখাতে শুরু করলেন, তখন তিনিই হয়ে উঠলেন বোসের সার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সার্কাসের অন্য সমস্ত খেলা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো গণপতির অবিশ্বাস্য অলৌকিক বাক্সের খেলার কাছে। শেষ পর্যন্ত শুধু ঐ বাক্সের খেলা—যা দেখবার জন্যে লোক পাগল, দেখিয়ে গণপতি মাসে তিনশো টাকা পেতে লাগলেন। তখনকার দিনের তিনশো টাকা মানে এখনকার অন্তত হাজার টাকা।

বোসের সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বহু জায়গায় অসংখ্য লোককে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়িয়েছেন গণপতি, লাভ করেছেন অসামান্য সম্মান এবং খ্যাতি। বাক্সো এবং ক্রসের খেলার পরে আরেকটি খেলাও শুরু করেছিলেন, তার নাম "কংস কারাগার।" বোসের সার্কাস প্রদর্শনীর প্রচারপত্রে খেলাটি ঐ নামেই বিজ্ঞাপিত হতো এবং বহু দর্শক আকর্ষণ করতো। কারাগারটি একটি মানুষকে আটকে রাখবার মতো খাঁচা বিশেষ। এই খাঁচার ভেতর হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যায় লাগিয়ে গণপতিকে আটকে রাখা হতো, যেন কংসের কারাগারে বন্দী রয়েছেন বসুদেব। ঐ বন্দী অবস্থা থেকে কোনো মানবের সাহায্য ছাড়া বেরিয়ে আসা কোনোরকম মানবিক উপায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু অনায়াসে এবং দ্রুতবেগে তিনি খাঁচা শূন্য করে বেরিয়ে আসতেন এবং তারপর আবার ঠিক সেই অবস্থাতেই ফিরেও যেতেন। ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁচার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দেখা যেতো, খাঁচার দরজা তেমনি তালা আটকানো এবং তার ভেতরে হাতকড়া, বেড়ি ইত্যাদি দ্বারা অসহায় বন্দী অবস্থায় রয়েছেন গণপতি। ভৌতিক সাহায্য ছাড়া এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হতে পারে?

খেলাটি অদ্ভুত বিস্ময়ে ভরা, তার ওপর "কংস কারাগার" নামটিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গণপতি নামটিও তখন কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছে। বোসের

সার্কাসে লোকে লোকারণ্য হতে লাগলো গণপতির খেলা দেখবার জন্য। সবার মুখে শুধু একটি নাম : গণপতি। সবার মনে এক ধারণা, গণপতির অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দটি নেই। পাশ্চাত্য দেশে যাত্নকর হ্যারি হুডিনি পলায়নী যাত্নর খেলা দেখিয়ে যে তুমুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, প্রাচ্যে যাত্নকর গণপতির বিস্ময়-সৃষ্টি তাব সঙ্গে তুলনীয। তুলনা জিনিসটাই যদিও ভালো নয, তবু বলা যায় এক হিসাবে পাশ্চাত্যের হুডিনির চাইতে শ্রেষ্ঠতব ছিলেন আমাদের গণপতি। হুডিনি শুধু বিস্ময সৃষ্টি করতেন, কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁব ছিলো না। কিন্তু গণপতি বিস্ময় সৃষ্টিতে যেমন ছিলেন অনন্য, তেমনি কৌতুক-সৃষ্টিতেও তাঁর সহজ ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। গণপতিব ভেতর যেন ছুটি মানুষ—ডাক্তার জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মতো। ম্যাজিকের ছোটোখাটো খেলা দেখাবার সময (যেমন একটা বাক্সো খালি দেখিযে তা থেকে নানা বকমের জিনিস বার করা) তিনি কি রকম কৌতুক করে হাসিব আবহাওযা তৈরি করতেন, শ্রীপরিমল গোস্বামী 'স্মৃতি-চিত্রণ' গ্রন্থে তার সুন্দর বর্ণনা দিযেছেন। বোসের সার্কাসেও বড়ো খেলাগুলো দেখাবার আগে হাস্যকব পোশাক পরে এসে রুমাল নাচানোর খেলা (পিক্লু মণির নাচ) এমন মজাদার মুখভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গি করে দেখাতেন যে, দর্শক-মহলে হাসির স্রোত বযে যেতো। তখন কল্পনাও কবা যেতো না, এই আধা-ক্লাউন লোক-হাসানো লোকটিই আবাব গুরুগম্ভীর বিস্মব সৃষ্টি করে স্তম্ভিত করে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে, "সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে!" গণপতিও জয কালী বলে সুধা পান কবতেন একটু বেশি মাত্রায। ওটা ছিলো তাঁর অনেক দিনের নেশা। সার্কাসের কর্তা প্রফেসর বোস অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন, সার্কাসের কোনো শিল্পীব তাই পানদোষ জন্মাতে পারেনি। কিন্তু তাঁর নিষেধের কড়াকড়ি গণপতির ওপর তিনি খাটাতে চেষ্টা করতেন না, নিশ্চিত ব্যর্থ হবেন জেনে। গণপতির বেলায তাঁর কড়াকড়ির ব্যতিক্রমে সার্কাসের কোনো কোনো শিল্পী ক্ষুন্ন হযেছিলেন, তা প্রফেসর বোসের অজানা ছিলো না, কিন্তু ছুর্বাসা গণপতিকে চটাতে সাহস পেতেন না তিনি (অত্যন্ত কড়া মেজাজ এবং অনুরূপ কড়া বচনের জন্য সার্কাসের সবাই গণপতির নেপথ্য নাম দিয়েছিল ছুর্বাসা মুনি)।

গণপতি তাঁর ম্যাজিক নিয়ে বোসের সার্কাসে ঢুকেছিলেন সার্কাসি খেলার ফাউ

হিসেবে। শেষটায় দেখা গেলো গণপতিরই জয়জয়কার, গণপতিই আসল, সার্কাসটাই ফাউ। তখন গণপতি একদিন ঠিক করলেন তিনি নিজে আলাদা দল করবেন, বোসের সার্কাসে আর থাকবেন না।

শুনে প্রফেসর বোস হেসে বললেন, "তোমার সঙ্কল্প সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাপু, দল চালানো অনেক ঝামেলার ব্যাপার, এতে মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হয়, তোমার মতো মাতালের কর্ম নয়।"

দল চালানো মাতালের কর্ম নয়! এই একটি কথা গিয়ে আঘাত করল গণপতির মনের তন্ত্রীতে। কথাটা শুনে চটলেন না তিনি! 'বললেন, "বেশ, তাহলে মদ ছেড়ে দেবো।"

আবার হাসলেন প্রফেসর বোস। বললেন, "কিন্তু মদ তোমাকে ছাড়বে কি?'

"আলবৎ ছাড়বে।" দৃঢ় কণ্ঠে বললেন গণপতি। "ছাড়িয়ে ছাড়বো।"

শুনে গণপতির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন সার্কাসের মালিক প্রফেসর বোস। আর প্রফেসর বোসের দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে মৃদু হাসলেন বিধাতা।

তারপর একদিন সারি সারি সুধার বোতল নিয়ে আপন ঘরে বসলেন অনেক দিনের সুধাপ্রেমিক যাদুকর গণপতি। জয় মা কালী বলে আজ এ জন্মের মতো আশ মিটিয়ে সুধা পান করে নেবেন তিনি। বোতলের পর বোতল খালি করে চললেন নিজের ভেতরে, বেলা যতো চড়তে লাগলো, নেশা চড়তে লাগলো তদধিক। নেশা চড়তে চড়তে কখন যে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন টের পেলেন না। অদ্ভুত নেশার ঘোরে কেটে গেলো গণপতির জীবনের চরমতম নেশাগ্রস্থ দিন।

শুনেছি তারপর জীবনে আর কোনদিন সুধার বোতল বা বোতলের সুধা স্পর্শ করেননি যাদুকর গণপতি।

বোতলের সুধা, আর বোসের সার্কাস—এই দুয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন যাদুকর গণপতি। প্রথমটির পুরাতন প্রেমিক যাঁরা, তাঁরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন—যাঁরা ও-রসের রসিক নন তাঁরা অনুমান করে নেবেন—ঐ পদার্থটির 'ক্রনিক' নেশা এক কথায় একেবারে ছেড়ে দেওয়া কত কঠিন। এই কঠিনকে সহজে সয়ে নেবার অসামান্য ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ-চরিত্র গণপতির।

সার্কাসের মালিক প্রফেসর বোস—বলাই বাহুল্য—গণপতিহীন 'বোসেজ সার্কাস'-এর কথা ভেবে খুশি হলেন না, কিন্তু উপায় কি? গণপতি শুধু 'দুর্বাসা'-ই নন, অসাধারণ দৃঢ়সঙ্কল্প; যা ঠিক করে ফেলেছেন তা থেকে টলানো

যাবে না তাঁকে কিছুতেই। দুলের দ্বিতীয় হয়ে থাকবেন না অদ্বিতীয় গণপতি ; স্বনামধন্য গণপতি স্বনামেই স্বতন্ত্র দল গড়ে তার প্রধানরূপে করবেন একচ্ছত্র আধিপত্য।

এই দল-গড়ার পিছনে আরেকটি প্রেরণারও খানিকটা অংশ ছিলো। সেই আগের কথাটা এবারে বলি। বোসের সার্কাসে থাকতে একবার নবদ্বীপে 'পোড়ামাতা'-র মন্দিরের আমন্ত্রণে সেখানে গণপতি এককভাবে তাঁর যাত্নর খেলা দেখিযেছিলেন। বোসের সার্কাসের কড়া নিয়ম ছিলো দলের কোনো মাইনে করা শিল্পী দলের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখিযে উপার্জন করতে পারবে না। কিন্তু দেবীভক্ত যাত্নকর দেবী-মন্দিরে যাত্ন-প্রদর্শনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেননি ; যাত্ন দেখিয়েছিলেন, সার্কাসদলের অধিকারীর আগাম অনুমতি না নিয়েই এবং বিস্ময়কর যাত্নর খেলা দেখে মন্দিরের সবাই নিশ্চিত হয়েছিলেন দেবীর বরে তিনি সত্যিই অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং সেই শক্তির সাহায্যেই তাঁর এইসব অসাধ্যসাধন। যাত্ন-প্রদর্শনের শেবে মন্দিরের পুরোহিত গণপতিকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনান—তিনি দেবী মায়েব আশীর্বাদে স্বাধীনভাবে যাত্ন-প্রদর্শনের দল গড়ে অসাধারণ খ্যাতি, জনপ্রিযত।, সম্মান এবং অর্থ অর্জন করতে পারবেন। দেবী-মন্দিরের পুবোহিতের এই ভবিষ্যদ্বাণী গণপতির কল্পনাপ্রবণ মনে গেঁথে গিয়েছিল। তখনো গণপতি অসামান্য খ্যাতিমান স্বনামধন্য গণপতি হননি।

পূজারী পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হযেছিল এবং গণপতি বিশ্বাস করে-ছিলেন তাঁর এই আশাতীত সাফল্যের মূলে শ্রীশ্রীপোড়ামাতার আশীর্বাদ। ·'র পর থেকে তিনি সব সময় চিঠিপত্রাদির ওপর সর্বপ্রথমেই লিখতেন "শ্রীশ্রীপোড়া-মাতা ভরসা"।

গণপতির জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শুনেছি ; সে কাহিনীটিও এখানে বলে রাখি। একবার সাহেবগঞ্জে যাত্নর খেলা দেখাতে গেছেন তিনি। সেখানে একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন এক দেবীমূর্তি তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে একটি বাড়ির ঠিকানা, বর্ণনা, পথনির্দেশ এবং বাড়ির মালিকের নাম দিয়ে বললেন, "ওরে, আমি এই বাড়িতে এক আলমারির মাথায় এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছি। তুই আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার পূজো করিস।"

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো গণপতির। রোমাঞ্চিত হলো সারা দেহ। এ স্বপ্ন কি অলীক, না সত্য ? অলৌকিক ব্যাপারের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন

গণপতি, সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এ স্বপ্নের সত্যতা যাচাই করতে গেলেন তিনি। স্বপ্নে পাওয়া ঠিকানায় গেলেন, গিয়ে পরম বিস্ময়ে দেখলেন বাড়ির চেহারা, গৃহস্বামীর নাম ইত্যাদি সব মিলে যাচ্ছে। বাড়ির মালিককে বললেন স্বপ্নের কথা। আলমারির মাথায় দেখা গেলো সত্যিই একটি দেবী-মূর্তি রয়েছে, হুবহু স্বপ্ন-বর্ণিত চেহারার। বাড়ির মালিক দেবী-মাতার স্বপ্নাদেশের কথা শুনে অভিভূত হলেন, মূর্তিটি দিলেন যাত্নকর গণপতিকে। গণপতি দেবী-মূর্তিটিকে নিয়ে এসে তাঁর যথাবিধি নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু আগের কথায় আসা যাক। বোসের সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন যাত্নকর গণপতি, নিজেই দল করবেন বলে। বোসের সার্কাসের জনকয়েক শিল্পী চলে এলেন তাঁর সঙ্গে ; এই দু-তিনজনের মধ্যে ছিলেন মহিলা শিল্পী হিঙ্গনবালা, যাঁর প্রধান খেলা ছিলো 'বাল্যানসিং' বা ভারসাম্যের একটি শক্ত খেলা—একটি বড়ো বলের ওপর দাঁড়িয়ে।

হিঙ্গনবালার এই খেলা বেশ আকর্ষণীয় ছিলো, কিন্তু—বলা বোধহয় বাহুল্য—গণপতির অদ্ভুত যাত্নর খেলাই ছিলো সর্বপ্রথম আকর্ষণ।

তাঁবু আর দল নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁবু ফেলে খেলা দেখাতে লাগলেন গণপতি। যেখানে যান সেখানেই গণপতির জয়-জয়কার, গণপতির প্রদর্শনীর তাঁবুতে দর্শকে দর্শকারণ্য।

গণপতির যাত্ন প্রদর্শনীর ছিলো দুটি দিক। একটি দিক লৌকিক আমোদ-প্রমোদের, অন্যটি অলৌকিক রহস্যের। গণপতির কতকগুলো খেলা দেখে দর্শকেরা বিস্মিত হয়ে তারিফ করতেন তাঁর সুদক্ষ হস্তকৌশলের এবং ধাপ্পা চাতুর্যের ; কিন্তু তাঁর বড়ো খেলা দেখে স্তম্ভিত হযে গণপতির অলৌকিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হতেন।

গণপতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হযে অনেকে আসতেন তাঁকে হাত দেখিয়ে ভাগ্য জানতে, গ্রহ-শান্তি করাতে, নানারকম মানসিক, শারীরিক এবং ভুতুড়ে ব্যাধির দাওয়াই নিতে। অনেকেই গণপতির কাছ থেকে পেতেনও বিভিন্ন শক্তির মাত্নলি, শেকড়, টোটকা ওষুধ প্রভৃতি। অনেকেই আশ্চর্য উপকারও পেতেন—জানি না তা অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে, না দ্রব্যগুণে, না বিশ্বাসের গুণে। যে কারণে বা যেভাবেই হোক, গণপতি দ্বারা অনেকে উপকৃত হয়েছেন একথা সত্য।

হিঙ্গনবালা সেই যে বোসের সার্কাস ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন যাত্নকর গণপতির সঙ্গে, তারপর আর কখনো গণপতিকে ছেড়ে যাননি। কিন্তু বোসের সার্কাস ছাড়েননি সেই অসাধারণ বাঙালী মেয়ে স্বশীলা, যিনি দুঃসাহসিক বাঘের খেলা দেখাতেন। তাঁর কথা আগেই বলেছি ; কিন্তু একটু বলা বাকি রয়েছে ।

সার্কাস-দর্শক মহলে গণপতির অলৌকিক বাক্সের খেলার (ইলিউশন বক্স) কাছে স্বশীলার দুঃসাহসিক, লোমহর্ষক বাঘের খেলা জনপ্রিয়তায় হেরে গেলো, এতে দুঃসাহসিক স্বশীলার পক্ষে দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক। তিনি তাই হয়েছিলেন। হয়তো ঈর্ষা হয়েছিল মনে মনে, আর ঈর্ষা থেকে হিংসা। তাই গণপতি যখন বোসের সার্কাসের মাইনে করা শিল্পী হয়েও নবদ্বীপ পোড়ামাতার মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্ন-প্রদর্শন করেছিলেন সার্কাসের নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন এ নিয়ে সার্কাসের শিল্পী-মহলে মৃত্নগুঞ্জন উঠেছিল ; সে গুঞ্জনে শোনা যায় ব্যাঘ্র-দমন-শিল্পী স্বশীলার অংশ ছিলো। সে গুঞ্জন গিয়েছিল সার্কাস-মালিক প্রফেসর বোসের কানে এবং যাত্নকর গণপতির কানেও। অন্য শিল্পীদের পান থেকে চুন খসাটাও অপরাধ, আর গণ-পতির সাতখুন মাপ, এই ছিলো গুঞ্জনের মূল কথা। এ গুঞ্জনে স্বশীলারও অংশ আছে সে কথা জেনেছিলেন গণপতি, জেনেও তবু দুর্বাসা মুনির মতো দুর্বাক্য ব্যবহার করেননি, শুধু সার্কাস-মালিককে বলেছিলেন মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে তিনি মায়ের চরণে যাত্ন-অঞ্জলি দিয়ে এসেছেন মাত্র, ওটা তাঁর ব্যবসাদারি প্রদর্শন নয় এবং একটি কপর্দকও দর্শনী গ্রহণ করেননি তিনি, কাজেই সার্কাসের কানুন মোটেও ভঙ্গ করা হয়নি।

এর পরেই বাঘের খেলা দেখাতে গিয়ে স্বশীলা বাঘের থাবায় হঠাৎ আহত হন এবং নিতান্ত সৌভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে যান। ব্যাপারটা হয়তো নিতান্তই আকস্মিক ; দৈবাৎ ঘটেছিল। গণপতির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ-গুঞ্জনের সঙ্গে ব্যাপারটার হয়তো কোনো রকম কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিলো না। কিন্তু শোনা যায় স্বশীলার মনে ধারণা হয়েছিল গণপতির প্রতি তিনি অন্যায় করেছিলেন, অপ্রত্যাশিত বাঘের থাবার আঘাতে তারই দৈবী ইঙ্গিত।

এরপর গণপতি যখন বোসের সার্কাস ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গিনী হলেন ঐ সার্কাসেরই শিল্পী হিঙ্গনবালা, তখন স্বশীলা থেকে গেলেন বোসের সার্কাসেই, বোসের সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ হয়ে। তখন কি ভাবের উদয় হয়েছিল ব্যাঘ্র-দময়ন্তী স্বশীলার মনে, তা আজ মীমাংসাতীত অনুমানের বিষয় মাত্র। অসামান্য

প্রতিদ্বন্দ্বী গণপতির বিদায়ে তিনি কি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, না বিষণ্ণ ? ঈর্ষা-কাতর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর চোখে দেখে এতোদিন যাঁকে ভেবেছেন পরম অপ্রিয়, বিদায়-বেলায় তাঁকে কি মনে হয়নি পরম প্রিয় যাদুকর বলে, মনে কি হয়নি কবিগুরুর ভাষায় :

"তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন" ?

হয়তো হয়েছিল, হয়তো হয়নি। ঠিক জানি:নে, জানবার উপায়ও নেই।

শুধু বড়ো বড়ো শহরেই নয়, ছোটো ছোটো শহরে এবং শহরতলিতে, এমন কি অনেক পল্লী অঞ্চলেও ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়িয়েছেন গণপতি। শুধু যাদু-প্রদর্শনেই নয়, শুনেছি নাট্যাভিনয়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিলো অসামান্য। আমি নিজে অবশ্য শুধু তাঁর যাদুর খেলাই দেখেছি বহুবার, নাট্যাভিনয় দেখিনি, যদিও যাদু-প্রদর্শনের সময় তিনি যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তাতে তিনি যে নাট্যমঞ্চেও চমৎকার অভিনয় করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য যাদুকরের কথা মনে পড়ছে : স্যার ওয়ালটার স্কটের দেশের মানুষ জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন, "উইজার্ড অভ দি নর্থ" (Wizard of the North)—উত্তর দেশের যাদুকর। স্কটের "রব রয" উপন্যাসের কয়েকটি দৃশ্যের নাট্যরূপ তিনি তাঁর যাদু প্রদর্শনের ফাউ বা ভূমিকা হিসেবে মঞ্চস্থ করতেন ; তাতে নায়ক রব রয়ের ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করতেন।

কৌতুকপ্রিয়তা এবং চেহারার দিক দিয়ে গণপতির মিল ছিলো উনিশ শতকের স্বনামধন্য মার্কিন যাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান-এর (Alexander Herrmann) সঙ্গে। দুজনেই লম্বা, ছিপছিপে, সগুম্ফ। দুজনেই যাদু প্রদর্শন-মঞ্চের বাইরেও—দোকানে, বাজারে, বৈঠকে, রেস্তোরাঁয়—ছোটোখাটো অথচ অদ্ভুত বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে মজা করতেন।

যাদুর খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে গেছেন গণপতি। সারা ভারতের কথা জানি না, বাঙলা দেশে অন্তত শুধু যাদুকে পেশা করে অমন অসামান্য অর্থ-সাফল্য আর কেউ লাভ করতে পারেননি, বর্তমান যুগের যাদুকর পি, সি, সরকার ছাড়া।

যাদুকর গণপতি ছিলেন অকৃতদার। শেষ জীবনটা তিনি সাধন-ভজনেই কাটিয়ে গেছেন। অর্থ-উপার্জন করে কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে যে সম্পত্তি করেছিলেন

তা দেবোত্তবিত। দুহাতে তিনি যেমন টাকা বোজগাব কবেছেন, তেমনি পবেব উপকাবে দানও কবে গেছেন অকাতবে। অনেক শোনা গল্পেব একটি গল্প বলি। এক জায়গায যাত্নব খেলা দেখানো শেষ হযে গেছে। গণপতিব সঙ্গে দেখা কবলেন এক দবিদ্র, কন্যাদাযগ্রস্থ ব্রাহ্মণ। গণপতিব কাছে তাব একটি আর্জি আছে, সে আর্জি মঞ্জুব কবতেই হবে। হাওযা থেকে টাকাব পব টাকা ধবাব বিদ্যেটা শিখিযে দিতে হবে তাঁকে, নিদারুণ অর্থাভাব আব সহ্য হয না, পাবানিব কডিব অভাবে মেযেটাব ভালো সম্বন্ধ হাতছাডা হযে যেতে বসেছে।

অশ্রুসিক্ত হযে উঠলো যাত্নকব গণপতিব দুটি চোখ। গবিব ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ভাই সত্যি সত্যি হাওযা থেকে টাকা ধবাব বিদ্যে জানলে কি আব এতো লোকজন, লটবহব নিযে ঘুবে ঘুবে যাত্নব খেলা দেখিযে টাকা বোজগাব কবতে হতো আমাকে?"

যুক্তিটা হৃদযঙ্গম কবে তখন হতাশ হলেন কন্যাদাযগ্রস্থ গবিব ব্রাহ্মণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে হতাশ হতে হযনি। সম্পূর্ণ ব্যযভাব গ্রহণ কবে ব্রাহ্মণেব মেযেটিব ভালো বিযেব ব্যবস্থা কবে দিযেছিলেন গণপতি।

অসাধাবণ জীবন গণ ত্তব, অসাধাবণ মৃত্যুব কাহিনী এই বকম শুনেছি। শেষ খাটে শুযে পথ দিযে চলেছে চিবনিদ্রিত শ্মশানপথেব যাত্রী। বাহকদেব মুখে "বাম নাম সৎ হ্যায"। সেই মৃদু ধ্বনি কানে এলো অসুস্থ অর্ধশযান যাত্নকব গণপতিব।

"চলেছো বন্ধু? যাও। আমিও তোমাব পিছনে যাচ্ছি।" বললেন [illegible]।

সেদিন তাঁব প্রতিষ্ঠিত বাধামাধবেব মন্দিবে অন্নকূট উৎসব। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণ কবছে কত ভক্ত, কত দবিদ্রনাবাযণ। মন্দিবে আবাধ্য দেবতাব বিগ্রহকে জডিযে ধবলেন গণপতি। তাবপব ধীবে ধীবে ঢলে পড়লেন মৃত্যুব কোলে। সেদিন ২০শে নভেম্বব, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

শয়তান ও ম্যাসকেলিন

অনেক দিন আগে একটি ছোটোগল্প আমার বড়ো ভালো লেগেছিল। গল্পটি ছোটো করেই বলি।

সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে, সে সাড়া জাগিয়েছেন একজন যাদুকর। গল্পের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যাদুকরের নাম "এম্‌রে দি গ্রেট।" তাঁর প্রতিটি খেলা এমন নিখুঁত যে যদিও দর্শকদের সবাই জানেন, খেলাগুলো সম্পূর্ণ লৌকিক এবং ফাঁকি, তবু সবারই মনে হচ্ছে খেলাগুলো অলৌকিক, এবং খাঁটি যাদু; ফাঁকি নয়, ফাঁকি হতে পারে না।

সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শহরের সেরা রঙ্গালয়ে যাদুর খেলা দেখিয়ে চলেছেন যাদুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট'। প্রতি সন্ধ্যায় হল ভর্তি, একটি আসনও শূন্য থাকে না। অনেকেই একাধিকবার দেখতে আসছেন; এমন আশ্চর্য যাদুশিল্পীর খেলা বহুবার দেখলেও পুরনো হয় না।

একটি বিশেষ সন্ধ্যা। রঙ্গালয়ের মঞ্চে হলভর্তি দর্শকদের বিস্মিত চোখের সামনে যাদু প্রদর্শন করেছেন যাদুকর এম্‌রে। হলশুদ্ধ লোক মন্ত্রমুগ্ধ। সারা হল জুড়ে অলৌকিক যাদুর আবহাওয়া। সকলেরই মনে হচ্ছে এ যাদুকরের অসাধ্য কিছু নেই, যে কোনো অসম্ভব এঁর পাল্লায় পড়লে সম্ভব হতে বাধ্য হবে।

অন্যান্য সন্ধ্যায় যেসব খেলা দেখান সেগুলো দেখানো হয়ে গেলে, "এম্‌রে দি গ্রেট" বললেন, "এইবার আমি কয়েকটি এমন খেলা দেখাবো যা আপনাদের এর আগে কখনো দেখাইনি।"

দেখালেন। এ খেলাগুলো তাঁর আগেকার খেলাগুলোর চাইতে আরো অনেক বেশি অদ্ভুত, আশ্চর্য, মজাদার। কোনো কোনো খেলার শেষে উচ্ছ্বসিত হাততালিতে হলের দেয়ালগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো; আর কোনো কোনো খেলার শেষে বিস্ময়ের ভার এমন প্রচণ্ড হয়ে চেপে বসলো সবার মনে, যে কারও হাত তালি দিতে উঠলো না, প্রতি জোড়া হাত মহাবিস্ময়ে অবশ।

এক ভদ্রলোকের মাথার টুপি ধার করে নিয়ে টুপিটি খালি দেখিয়ে যাদুকর এম্‌রে তার ভেতর থেকে পর পর ক্রমাগত বার করতে লাগলেন জিনিসের পর

জিনিস—রুমাল, ফুল, নিশান, পুতুল, পাখিশুদ্ধ পাখির খাঁচা, খরগোস, ছাতা, টেবিলঘড়ি, লাঠি, চীনা লণ্ঠন, গ্যাসভরা রবারের বেলুন, ভ্যানিটি ব্যাগ, বোতল, বল, আরো অনেক কিছু। খেলার শুরুতে যে মঞ্চ ছিলো ফাঁকা, খেলার শেষে সে মঞ্চ ভরে গেলো এই সব জিনিসে। আশ্চর্য ব্যাপার! এ সম্ভব হলো কি করে? হাততালিতে হল ভরে উঠলো। টুপিটিকে আবার খালি দেখিয়ে টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখে দিলেন "এম্‌রে দি গ্রেট", তারপর দর্শকদের সমবেত হাততালির অভিনন্দনকে অভিবাদন জানালেন সামনের দিকে ঝুঁকে।

হাততালি থেমে গেলে নানাদিক থেকে মন্তব্য শোনা গেলো: আশ্চর্য! অদ্ভুত! অভূতপূর্ব! অতুলনীয়! ইত্যাদি। হঠাৎ হলশুদ্ধ সবাইকে চমকে দিযে তৃতীয় সারির একজন দর্শক অদ্ভুত রকমের অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি এবং মনোযোগের কেন্দ্র হযে উঠলেন তিনি। লোকটির পরনে কালো পোশাক, দেহ ছিপছিপে লম্বা, চোখা চেহারা, ছুঁচোলো গোঁফ, সরু ছুঁচোলো মিশকালো দাড়ি। অদ্ভুত এই ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি একবার স্টেজে আসতে পারি কি?" প্রশ্নটির লক্ষ্য মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো যাদুকর "এম্‌রে দি গ্রেট"।

এম্‌রে অভিজ্ঞ, পাকাপোক্ত যাদুকর, যাকে বলা যায় দস্তুরমতো ঝানু। বহুবার বহু চালাক তাঁকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেরাই উলটো জব্দ হয়ে গেছেন। জব্দ করবার কায়দায় সিদ্ধহস্ত, সিদ্ধমুখ, সিদ্ধমগজ "এম্‌রে দি গ্রেট", তবু যেন একটু দ্বিধার স্বর ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে, যখন তিনি বললেন, "আসুন।"

রহস্যময় লম্বা লোকটি দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চে উঠে গিয়ে যাদুকর এম্‌রে-র পাশে দাঁড়ালেন দর্শকদের মুখোমুখি। বললেন: "বন্ধুগণ, আপনাদের এই প্রিয় যাদুকর এতক্ষণ আপনাদের এক ধরনের যাদু দেখালেন। আপনারা অনুমতি করলে আমি আরেক ধরনের যাদু দেখাবো, যেমনটি আপনারা কখনো দেখেননি।"

লোকটির চেহারা, সাজপোশাক, কথাবার্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চুম্বকের মতো টানে, কিন্তু মনে স্বস্তি আনে না। তবু কৌতূহলের দাবি আরো জোরালো হযে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সুতরাং অনুমতি মিললো। যাদুকর এম্‌রেও মাথা নাড়লেন এমন দোমনা ভাবে যে তার মানে হাঁ-ও হতে পারে, 'না' হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দর্শকদের অনুমতি পেলেন ভদ্রলোক। রহস্যময় ভদ্রলোক। এ ভদ্রলোককে কেউ চিনতে পারলেন না এ শহরের বলে। খুব সম্ভব তিনি এ

শহরের বাইরে থেকে এসেছেন স্নুতরাং গল্প বলার স্নুবিধার জন্য তাঁকে বলা যাক 'আগন্তুক'।

আগন্তুক বললেন, "যাদুকর এমুরে দেখালেন শূন্য টুপির ভেতর থেকে এই জিনিসগুলোর আবির্ভাব। এবার আমি দেখাবো একটি একটি করে এই সবগুলো জিনিসেরই এই শূন্য টুপির ভেতরে তিরোভাব।"

বাঁ হাতে টুপিটা তুলে নিযে ডান হাতে একটির পর একটি জিনিস নিয়ে টুপিব ভেতর অদৃশ্য করে দিতে লাগলেন তিনি। রুমাল, ফুল, নিশান, পুতুল, পাখি-শুদ্ধ খাঁচা, খবগোস, ছাতা, টেবিল-ঘডি, লাঠি, চীনা লণ্ঠন, গ্যাসভরা রবারেব বেলুন, ভ্যানিটি ব্যাগ, বোতল, বল, আবো অনেক কিছু। গোটা স্টেজ ভর্তি ছিলো এই সব জিনিসে স্নুসজ্জিত হয়ে; আগন্তুক যাদুকরেব যাদুতে 'দু'মিনিটে খালি হযে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক টুপিটা ছুঁড়ে দিলেন টুপির মালিকের হাতে। মালিক লুফে নিলেন টুপি। নিযে দেখেন কি আশ্চর্য! টুপির ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এতোগুলো জিনিস তবে কোথায় গেলো?

হলশুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। এতো বেশি অভিভূত সবাই, যে হাততালি দেবার ক্ষমতা নেই কারও। যাদুকর "এমুবে দি গ্রেট"-ও স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, মুখে কথা সরছে না তাঁর। কি কৌশলে এ খেলা দেখানো সম্ভব হতে পারে, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনি।

মুচকি হাসলেন আগন্তুক যাদুকর। দর্শকদেব লক্ষ্য করে বললেন, "আপনাদের ভেতর আরেকজন ভদ্রলোক আমাকে টুপি ধাব দেবেন কি?"

দিলেন এক ভদ্রলোক। নিতান্তই নিরীহ ভদ্রলোক টুপি; কোনোরকম চালাকি নেই তার ভেতর। আগন্তুক যাদুকর দর্শকদেব ভেতর ঘুরে ঘুবে বিভিন্ন দর্শকের ফরমায়েশ মতো যে কোনো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে বার করে তাঁদের হাতে দিতে লাগলেন সেই শূন্য টুপি থেকে। যিনি যা চাইছেন, হুকুম করবার সঙ্গে সঙ্গেই টুপির ভেতর হাত ঢুকিযে বার করে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন আগন্তুক যাদুকর—চকোলেটের টিন, টেনিস বল, মাউথ অর্গ্যান, চিরুনি, বই, সাবানের বাকসো, পরচুলা, খাঁচা, হাতুড়ি, বিউগল্, তাসের প্যাকেট, দোয়াত, আপেল, আঙুরের গোছা, পাঁউরুটি, আরো অনেক কিছু। আশ্চর্য! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে নাকি এই রহস্যময় ব্যক্তিটির কাছে? নইলে ধার-করা খালি টুপি থেকে ফরমায়েশ মতো যে কোনো জিনিস বেরিয়ে আসে কি করে?

এইবারে মঞ্চে ফিরবার পালা, 'রিটার্ন জার্নি।' এই ফেরৎ যাত্রার পথে ঐ জিনিসগুলি একটি একটি করে ফেরৎ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টুপিটির ভেতরে ফেলে দিতে লাগলেন আগন্তুক যাদুকর—পাঁউরুটি, আঙুরের গুচ্ছ, চকোলেটের টিন, বই, সাবানের বাকসো ইত্যাদি সব কিছু। তারপর যাঁর টুপি তাঁর মাথায় টুপিটি চাপিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন মঞ্চের ওপর। কিন্তু জলজ্যান্ত এতোগুলো জিনিস যে সকলের চোখের সামনে ঐ টুপির ভেতর ঢোকালেন, সেগুলো গেলো কোথায়? এ যে আজগুবি ভুতুড়ে ব্যাপার!

আগন্তুক যাদুকর তারপর বললেন, "বন্ধুগণ! সবার শেষে আপনাদের যে খেলাটি দেখাবো সে খেলাটির নায়িকা নির্বাচনের ভার আপনাদের ওপর। আমি আমার যাদুকর বন্ধুর এই টেবিলটি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ধার নিচ্ছি।" বলে মঞ্চের ওপর ি ‥যাদ যে ছোট্টো গোল টেবিলটি দাঁড়িয়েছিল, তাকে হাতের ইশারা করতেই সেটি নিজে থেকেই সরে এসে মঞ্চের সামনের দিকে এসে দাঁড়ালো। যেন কয়েকজন অদৃশ্য ভুত তাকে টেনে নিয়ে এলো। স্তম্ভিত করাই যাঁর পেশা এবং নেশা, সে যাদুকর "এমুরে দি গ্রেট" স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন বিস্মিত তিনি কখনো হননি, হবেন বলে আশাও করেননি। তিনি মঞ্চের এক ধারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন আগন্তুক যাদুকর তাঁকে সম্মোহিত করে আদেশ করেছেন "আপনি চুপ করে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।" যাদুকর "এমুরে দি গ্রেট"-এর সহকারীরাও মঞ্চের দুধারের দুই নেপথ্যে ত' ম আত্মহারা। আড়াল থেকেই তারা দেখছে এই রহস্যময় আগন্তুকের অলৌকিক কাণ্ড। তারা জানে যাদুকর "এমুরে"-র সবগুলো খেলার গুপ্ত কৌশল, তাই তাঁর কোনো রহস্যই তাদের কাছে রহস্য নয়। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটির অদ্ভুত কাণ্ডগুলোর কোনো ব্যাখ্যার নাগাল পেলো না তাদের সকলের সমবেত বুদ্ধি।

ডান হাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খালি দেখিয়ে শূন্য থেকে একটি শাদা রুমাল ধরে নিলেন আগন্তুক যাদুকর। রুমালটি হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে এক বেশ বড়ো টেবিল-ক্লথে পরিণত করে তাই দিয়ে গোল টেবিলটা ঢেকে দিলেন তিনি। স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন দর্শকবৃন্দ।

"এবার আপনাদের পছন্দমতো একজন সেরা সুন্দরীকে আমি এই টেবিলের ওপর নিয়ে আসবো।" বললেন আগন্তুক যাদুকর। "বলুন কাকে দেখতে চান আপনারা? সালোমি? হেলেন? ক্লিওপ্যাট্রা?"

"ক্লিওপ্যাট্রা।" উচ্চকণ্ঠে বললেন একজন। "ক্লিওপ্যাট্রা। ক্লিওপ্যাট্রা" প্রতিধ্বনি হলো বহু কণ্ঠে।

"ক্লিওপ্যাট্রা!" গভীর এবং গম্ভীর রহস্যময় কণ্ঠে বললেন আগন্তুক যাদুকর। "বেশ, তাহলে লক্ষ্য রাখুন এই টেবিলের ওপর। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। মন বিক্ষিপ্ত করবেন না অন্য কোনোদিকে। আপনাদের মনঃসংযোগের সুবিধার জন্য আমি শুধু এই টেবিলটার ওপর আলো রেখে বাকি সমস্ত আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেলো হলের অন্য সমস্ত আলো, শুধু মঞ্চের দুধারের ওপর দিক থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো গোল হয়ে টেবিলের চারধারে। "ক্লিও-প্যাট্রা! ক্লিওপ্যাট্রা! ক্লিওপ্যাট্রা!" রহস্য-গভীর কণ্ঠে যেন তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন রহস্যময় আগন্তুক। সারা হল জুড়ে দমবন্ধ করা স্তব্ধতা, একটা আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি চোখ তাকিয়ে আছে মঞ্চে দাঁড়ানো ঐ টেবিলটির ওপর।

সহসা ও কি? টেবিলক্লথের মাঝখানটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে উঠছে কি করে? কাপড়ের তলায় অদ্ভুত ভাবে একটা গোল জিনিসের আবির্ভাব ঘটেছে, সেটাই টেবিলক্লথটিকে ঠেলে নিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একজন মানুষের সমান উঁচুতে উঠে গেলো টেবিলক্লথের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি আস্ত মানুষ। সেই মানুষটি ধীরে ধীরে খসিয়ে পায়ের তলায় টেবিলের ওপর ফেলে দিলো টেবিলক্লথটি। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে অবর্ণনীয়া রূপসী মোহিনী নারী মূর্তি। দু'চোখে বিদ্যুতের চমক, অধরের কোণে মায়াবিনীর হাসি। প্রাচীন মিশরীয় বেশ পরিহিতা স্বল্পবসনা এবং স্বচ্ছবসনা সুন্দরী।

"ক্লিওপ্যাট্রা!" গম্ভীরকণ্ঠে যেন রহস্যময়ীর পরিচয় দিলেন রহস্যময় আগন্তুক। যাদুমন্ত্রে আবির্ভূতা হয়েছে ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া মোহময়ী ক্লিওপ্যাট্রা, যে ক্লিও-প্যাট্রার মোহিনীমন্ত্রে অভিভূত হয়েছিলেন জুলিয়াস সীজার আর মার্ক অ্যাণ্টনি!

নারীর রূপ এমন অপরূপ হতে পারে? বুকের রক্তে দোলা দিতে পারে এমন করে? এমন অস্থির চঞ্চল করে তুলতে পারে মনকে?

কি যেন বললো ক্লিওপ্যাট্রা মৃদু মধুরকণ্ঠে। প্রাচীন মিশরী ভাষা বোধহয়, তাই ভালো বোঝা গেলো না, কিন্তু সবার কানে যেন মধু ঝরালো ঐ মায়াবিনী সৌন্দর্য-সম্রাজ্ঞীর মাদকতাময় কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে নত হয়ে টেবিল-ক্লথটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেল্‌ল ক্লিওপ্যাট্রা। আফশোষে ভরে উঠলো হলশুদ্ধ সবার মন।

জ্বলে উঠলো আবার একসঙ্গে হলের সবগুলো আলো। টেবিলের ওপর ক্লিওপ্যাট্রা দাঁড়িয়ে আছে টেবিল-ক্লথের তলায় আত্মগোপন ক'রে! কিন্তু কে তাকে বলেছিল আড়ালে নিজেকে গোপন করতে

ক্লিওপ্যাট্রা-দর্শন-মশগুল সবাই, আগন্তকের দিকে নজর রাখেননি কেউ। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলে সবাই দেখতে পেতেন আগন্তক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তিনি নেই; শুধু সেখানে কেন, কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে ঐ টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথে ঢাকা ক্লিওপ্যাট্রার দিকে। হলশুদ্ধ সবাই চাইছেন খসে পড়ুক টেবিল-ক্লথের আবরণ। আবার দেখা দিক মোহময়ী সৌন্দর্য-সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপ্যাট্রা। খসে পড়ল টেবিল-ক্লথের আবরণ। কিন্তু কোথায় ক্লিওপ্যাট্রা? দেখা গেল তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই রহস্যময় আগন্তক যাদুকর!

এত বিস্ময় আর এত বেদনা উপস্থিত দর্শকদের ভেতর কেউ আর কখনো এক সঙ্গে অনুভব করেননি। তাছাড়া এবার ঐ আগন্তক যাদুকরের মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে তাঁরা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ লোকটি এতক্ষণ যা দেখালেন তা কোনরকম স্বাভাবিক বা লৌকিক উপায়ে ঘটানো সম্ভব নয়, এর পিছনে অলৌকিক রহস্য কিছু নিশ্চয় রয়েছে। কি সে রহস্য? কি সে শক্তি?

"আজ রাতের মতো এখানেই খেলা শেষ হলো।" বললেন আগন্তক যাদুকর। মঞ্চের সামনে পড়ে গেল সেই রাত্রের মতো শেষ যবনিকা। চিন্তা করতে করতে ফিরে গেলেন দর্শকবৃন্দ।

যবনিকার ওপাশে মঞ্চের ওপর এই রহস্যময় আগন্তকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাদুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট' বললেন "কি করে আপনি এ সব অদ্ভুত কাণ্ড করলেন? এ তো লৌকিক যাদুবিদ্যা নয়।"

"কিন্তু যে কোন লোককে আমি আমার এই আশ্চর্য বিদ্যায় পাকা বানিয়ে দিতে পারি। আমি আজ যা কিছু ক'রে দেখালাম সে সব ছাড়াও আরও অনেক বিস্ময়কর কাণ্ড তুমি করে দেখাতে পারবে। যাদু-জগতে তোমার জুড়ি থাকবে না, যদি তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো। তোমার যাদুর খ্যাতি দেখে শুনে তোমাকে শিষ্য বানাবার জন্যেই এসেছি।"

যাদুকর এম্‌রে বললেন, "আমাকে শিষ্য বানাবার জন্য আপনার এতো আগ্রহ ?"

আগন্তুক বললেন, "হ্যাঁ। শিষ্য বানাবার আগ্রহ আমার অসীম।"

"কিন্তু" বললেন যাদুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট', "আপনি আজ যে খেলাগুলো দেখালেন, মানুষী বিদ্যায় সেগুলো সম্ভব নয়। মনে হয় এ শয়তানী বিদ্যা ; স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।"

আগন্তুক মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "যুবক, তুমি সত্যের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছো। আরেকটু হলেই পুরোপুরি পৌঁছে যেতে।"

"তার মানে ?

"আমি স্বয়ং শয়তান।"

এই হলো গল্পটির চুম্বক। শুক্‌নো সংক্ষেপ করতে গিয়ে স্বভাবতই গল্পের অধিকাংশ রস নিংড়ে ফেলে দিতে হয়েছে, তবু এই কংকাল থেকেও হয়তো রক্ত-মাংসযুক্ত পুরো গল্পটির উৎকৃষ্টতার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।

গল্পটি চমৎকার, কিন্তু কল্পনা থেকে বানানো। এ গল্পের 'আগন্তুক' যাদুকরের অলৌকিক খেলা দেখে দর্শকদের ভেতর সন্দেহ জেগেছিল স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। এই সন্দেহের ফলেও পরিস্থিতিটা যাদুকরের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে "Truth is stranger than fiction" অর্থাৎ সত্য ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চাইতে বেশি অদ্ভুত হয়। অদ্ভুত বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে একবার কুসংস্কারগ্রস্ত, শয়তান-ভীত ক্ষিপ্ত জনতার হাতে একজন যাদুকরের প্রাণ-সংশয় ঘটেছিল ইংলণ্ডে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, লণ্ডনের কিছু দূরে একটি মফস্বল শহরে—অথবা আধা শহর আধা-গ্রামে। তিনি ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের যাদু-চর্চ্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয—জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। লণ্ডনের অল্প দূরে একটি ছোট শহর। সেই শহরের একটি রঙ্গালয়ে এক সপ্তাহব্যাপী যাদু-প্রদর্শনী চলবে, প্রচার-পত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। যাদু প্রদর্শন করবেন যাদুকর জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক (George Cooke)। শিগ্‌গিরই লণ্ডন শহরের ক্রিস্ট্যাল প্যালেস (Crystal Palace) রঙ্গালয়ে এঁদের কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শনের চুক্তি হয়েছে, তার আগে মফস্বল শহরে এক সপ্তাহের জন্য এই প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী শুরু হলো সোমবার থেকে। ম্যাসকেলিন এবং কুক, দুজনেই দক্ষ যাদুকর। দুজনের ভেতর চেহারা, ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত-বুদ্ধি, যান্ত্রিক দক্ষতা, উদ্যম প্রভৃতিব দিক দিযে ম্যাসকেলিনই শ্রেষ্ঠতর এবং ইংলণ্ডের তথা পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদান অসামান্য। খ্যাতিও তাই।

অদ্ভুত বিস্ময়কর তাঁদের যাদুর খেলাগুলো সারা শহবে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। আশাতীত সাফল্যে অসামান্য খুশী হলেন দুজন যুবক যাদুকব, দুজনেরই বযস তখনো ত্রিশ পেরোযনি। খুশি হওযাই অবশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁদের যাদু প্রদর্শন এতো ভালো বলেই যে কি ভীষণ বিপদেব মুখে তাঁদেব পড়তে হবে এবং কোনো রকমে প্রাণ নিযে পালাতে হবে, তা জানতে পাবলে বোধ হয এতটা খুশি তাঁরা হতেন না। সেই ভীষণ বিপদের কাহিনীই বলবো।

কিন্তু তার আগে আগেকার কথা একটু বলে নেওযা দরকার। যাকে বলে গোড়ার কথা। অথবা কবিগুরুব ভাষায—দীপ জ্বালাবাব আগে সলতে পাকানো। জন নেভিল ম্যাসকেলিন (১৮৩৯-১৯১৭) তাঁর কর্মজীবন শুরু কবেন চেলটেনহ্যাম (Cheltenham) শহবে এক ঘড়ি-নির্মাতাব দোকানে শিক্ষানবিশি রূপে। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং কারিগবি দক্ষতা কাজে লাগিযে পববর্তী জীবনে যাদুজগতে তিনি অসামান্য বিস্মষ সৃষ্টি কবে গেছেন, এইখানেই তাব সূত্রপাত। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ফরাসী যাদু-সম্রাট ববেযার উদাঁ (Robert Houdin)—যাঁকে বলা হযে থাকে বর্তমান বা আধুনিক যাদু-বিদ্যার জনক (Father of Modern Magic)—তাঁর প্রথম জীবনে ঘড়িব কাজই শিখেছিলেন এবং কযেকটি বিস্মযকব যোগাযোগেব ফলে যাদু বিদ্যায আকৃষ্ট না হলে হযতো ঘড়ি-নির্মাণেব ব্যবসাতেই তিনি জীবন কাটাতেন।

বলছিলাম জন নেভিল ম্যাসকেলিনেব কথা। ঘড়ি-নির্মাতার দোকানে শিক্ষানবিশি করছেন, এমনি সময় একদিন ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আনমনে চলেছেন চেলটেনহ্যাম শহরের এক ফুটপাথ ধরে। যে রাস্তার ধার দিয়ে তিনি চলেছেন, আরেকটি রাস্তা এসে পড়ছে সেই রাস্তায়। সেই আরেক রাস্তার ফুটপাথের ওপর দিয়ে এগিযে আসছেন আবেকটি যুবক জর্জ কুক (George Cooke)। তিনিও ভাবুক মানুষ, আসছিলেন খানিক আনমনা ভাবেই। দুই আনমনা তরুণ ভাবুক—ম্যাসকেলিন আর কুক—আসছেন দুই দিক থেকে, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কোনাকুনি এসে পারস্পরিক ধাক্কা খেলেন

হুজনে। হুজনেই অপ্রস্তুত, হুজনেই হুঃখিত, হুজনেই হুজনের কাছে মাপ চাইলেন, তারপর হুজনে হুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর করমর্দন, পরিচয়, আলাপ, ভাব। কথাপ্রসঙ্গে বেরিযে পড়লো, হুজনেরই যাত্ববিদ্যায একটু-আধটু উৎসাহ [illegible]। একই বিষযে হুজনেরই শৌখিন উৎসাহ; এরই মাধ্যমে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠলো হুজনের। হুজনেই ঠিক করলেন যাত্ববিদ্যাটা একটু ভালো করে শিখলে মন্দ কি! শখ যখন আছে, সে শখ ভালো করেই মেটানো যাক। এইভাবে শুরু হলো পৃথিবীর যাত্বচর্চার ইতিহাসে বিখ্যাততম বন্ধুত্ব।

হুই বন্ধুতে মিলে শুরু করলেন একটি শৌখিন যাত্ব সমিতি, এর ভেতর জুটিয়ে নিলেন আরো কযেকটি তরুণ বন্ধুকে। এঁদের বৈঠক বসতে লাগল মাঝে মাঝে, এক-একবার এক-একজন সভ্যের বাড়িতে। বৈঠকে সভ্যদের যাত্ব প্রদর্শন, যাত্ব-সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি হতো। আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিলো যান্ত্রিক কৌশলে কি ভাবে নানারকম যাত্বর বিস্ময সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই দিকে জন নেভিলেরই মাথা খেলতো ভালো, কারণ ঘড়ির কাজে নানারকম যন্ত্রপাতি নিযে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হতো। ঘড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যাত্বসংক্রান্ত নানারকম যান্ত্রিক গবেষণা করে যেতে লাগলেন জন নেভিল ম্যাসকেলিন।

একদিন একটি ব্যাপার ঘটলো, যাতে জন নেভিলের মনের ভেতর একটুখানি খটকা লাগলো। তিনি যে ঘড়ির দোকানে শিক্ষানবিশি করতেন, সেই দোকানে একদিন এলেন একজন অদ্ভুত চেহারার লম্বা চুল আর অল্প দাড়িওযালা এক ভদ্র-লোক। জন নেভিলের হাতে একটি অদ্ভুত রকমের যন্ত্র দিয়ে তিনি বুঝিযে দিলেন এর ভেতরে একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, তার জাযগায নতুন স্প্রিং বসিযে দিতে হবে। কিন্তু অদ্ভুত যন্ত্রটি কি কাজে দরকার হয় সে প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি দিলেন না, প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। হু-একদিন বাদে যন্ত্রটি মেরামত হযে গেলে পর সেটি নিয়ে সেই ভদ্রলোক জন নেভিলের হাতে দশ শিলিং মুদ্রা দিলেন। মেরামত বাবদ হু শিলিং রেখে জন নেভিল বাকি আট শিলিং ভদ্রলোককে ফেরৎ দিতে যাচ্ছেন, তখন তিনি চুপি চুপি বললেন "ও আর আমাকে ফেরৎ দিতে হবে না। তোমাকে উপহার দিলাম। তার বিনিময়ে—আমি যে এসেছিলাম, একথাটা ভুলে যাও।"

কিন্তু ভুলে যেতে বলতেই মুশকিল হলো। জন নেভিল ভাবলেন লোকটি সিঁদেল চোর-টোর হবে, যে যন্ত্রটি মেরামত করিয়ে নিয়ে গেল সেটি হয়তো বা সিঁদ কাটতেই দরকার হয়। এ লোকের কাছ থেকে ঘুষ খাওয়া ঠি·· হবে না। সুতরাং উপহার তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন।

দুদিন বাদে চেলটেনহ্যামের সেই তরুণ যাদুকরদের বৈঠকে—যার কথা আগেই বলেছি—একজন সভ্য বললেন দু'জন মার্কিন 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' (spiritualist) বা ভৌতিক যাদুকরের কথা। চেলটেনহ্যাম থেকে অনেক দূরে এক শহরে তাঁরা অতি-অদ্ভুত ধরনের যাদু প্রদর্শন করছেন। দাড়িওয়ালা 'মিডিয়াম' ভদ্রলোক যে সব প্রশ্ন করছেন, অদৃশ্য ভূতুড়ে হাত রহস্যজনকভাবে টেবিলের ওপর টোকা মেরে আওয়াজ করে করে সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

দাড়িওয়ালা মিডিযাম! টেবিলের ওপর টোকা! সঙ্গে সঙ্গে জন নেভিলের মনে পড়ে গেল সেই অদ্ভুত চেহারা.. দাড়িওয়ালা লোকটির কথা, আর সেই রহস্যময় যন্ত্রটির কথা, যার ভাঙা স্প্রিংটি তিনি সারিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝে নিলেন ঐ যন্ত্রটিই টেবিলে টোকা দেবার 'অটোম্যাটিক' (automatic) বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। দর্শকরা এ·· দেখতে পান না, কিন্তু যে কেউ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে এটিকে কার্যকরী করতে পারেন।

সেই রাত্রের বৈঠকেই সেই যাদু-চক্রের সভ্যেরা, বিশেষ করে জন নেভিল ম্যাসকেলিন, শপথ করলেন এই ধরনের যন্ত্রাদি বা অন্য কৌশলের সাহায্য নিয়ে পরলোক থেকে আত্মা আনাবার ভান করে যে সব ভুয়ো মিডিয়াম বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের ঠকায়, তাদের বুজরুকির রহস্য ভেদ করে সাধারণের সামনে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে।

কিন্তু উক্ত মার্কিন মুলুক থেকে আসা ভৌতিক যাদুকর যেখানে তাঁদের ভৌতিক যাদু-প্রদর্শন করছিলেন, সে জায়গা অনেক দূর ; এই তরুণ যাদু-উৎসাহীরা অতদূর যাবার ফুরসৎ বা সুযোগ পেলেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহও ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লো। যাই হোক, এঁরা ঠিক করলেন যাদুচর্চা তো অনেক হলো, এবারে কয়েকটি শৌখিন যাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চেলটেন-হ্যামবাসীদের তাক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? যথা চিন্তা, তথা কাজ। ম্যাস-কেলিন-কুক বন্ধুদ্বয় এবং তাঁদের সহকারীরা যাদুকুশলী হিসেবে শহরে বেশ একটু নামই কিনলেন, শহুরেদের মনে জোর বিশ্বাস জন্মালো—

এ ছোকরারা অনেক কিছু জানে, এদের কাছে কোনোরকম বুজরুকি চলবে না।

তারপর একদিন······

চেলটেনহ্যাম শহরে ঘোষণা প্রচারিত হলো বিখ্যাত ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) ভ্রাতৃদ্বয়ের আসন্ন আগমন-বার্তা। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বহু নরনারীকে বিস্মিত করে এবার আসছেন চেলটেনহ্যামে। চেলটেনহ্যামের একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন ম্যাসকেলিন আর কুককে এসে বললেন, "তোমাদের হাতে নির্ভর করছে এ শহরের মান-মর্যাদা। দেখো, ওরা স্রেফ বুজরুকি দেখিয়ে যেন আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যেতে না পারে। তোমরা অনেক বুজরুকি-জানা যাদু-বিশারদের দল, ভালো করে নজর রেখো—ওরা যে ভূত আনিয়ে নানারকম অসম্ভবকে সম্ভব করে, সে কি সত্যি সত্যি ভূতুড়ে ব্যাপার, না ভেল্‌কিবাজি, সেইটে ধরবার দায়িত্ব তোমাদের।"

এবার এই ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা একটু বলি। এঁদের নাম আইরা ইরাস্‌টাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট। এঁদের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো (Buffalo) শহরে, যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর যাদু-জগতে এদের নাটকীয় অভিনয় আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি অল্প বয়সেই ভৌতিক মিডিয়াম রূপে এঁরা খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জন কোল্‌স্ (John Coles) নামে একজন প্রেততাত্ত্বিক এ দের দু-ভাইকে নিউইয়র্ক শহরে নিয়ে আসেন। নিউইয়র্কে কয়েকটি ভৌতিক-চক্র-বৈঠকে এঁরা বেশ একটু ভীতিপূর্ণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। চক্রে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সত্যি সত্যিই ধারণা হতো—এই দুটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্রাতার আবাহনে বাতি নেবানো অন্ধকারে ভূতেরা এসে গীটার, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি বাজনা বাজায় এবং আরো নানারকম অদ্ভুত ব্যাপার করে যায়। ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বৈঠকে দু'পাশে এমন ভাবে বেঁধে রাখা হতো যে, তাঁদের দ্বারা এসব ব্যাপার সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলেই সবার মনে হ'তো, কারণ বাতি জ্বালতেই দেখা যেতো—ওঁরা দুজন যেমন বাঁধা ছিলেন ঠিক তেমনি বাঁধা রয়েছেন।

কিছুদিন বাদে এঁদের সেয়াঁস (Seance) বা চক্র-বৈঠকে অনুষ্ঠিত ভূতুড়ে কাণ্ডগুলির বৈচিত্র্য আরো বেড়ে গেল; ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ই বাড়ালেন।

মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র এবং কানাডাব বহুস্থানে বেশ সাফল্যপূর্ণ সফবব পব দুভাই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এলেন ইংলণ্ড জয় কবতে; তাঁদেব ম্যানেজাবরূপে এলেন উইলিযাম ফে (William Fay) এবং বক্তারূপে ডাঃ জে. বি. ফাবগুসন নামে একজন ধর্মযাজক। ইংলণ্ডে তাঁদেব প্রথম ভৌতিক চক্র বৈঠক বসলো ২২শে সেপ্টেম্বব তাবিখে এক ভদ্রলোকেব বাড়িতে। সে বৈঠকেব অন্ধকাবে ভূতেবা এসে যে সব অদ্ভুত কাণ্ড কবে গেল, তাব বিস্তাবিত বিবরণ প্রকাশিত হলো পবদিন খববেব কাগজে। বাতাবাতি বিখ্যাত হযে গেলেন গেলেন ভূত-বিশাবদ ভ্রাতৃদ্বয। বৈঠকেব পব বৈঠক চলতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবা খ্যাতি আব অর্থ দুইই এক সঙ্গে পেতে লাগলেন। অবশেষে তাঁবা এলেন চেলটেনহ্যাম শহবে। এখানকাব টাউন-হলে তাঁদেব ভৌতিক যাদু-প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হলো।

জন নেভিল ম্যাসকেলিন তখন ছাব্বিশ বছব বযস্ক যুবক যাদুকব। একজন যাদুকব আবেক[illegible]বব যাদু-খেলাব গুপ্ত কৌশল সাধাবণেব কাছে ফাঁস কবে দেবেন না, যাদুকব সমাজেব এই হচ্ছে সাধাবণ নীতি। এ নীতি জন নেভিলও মানতেন। কিন্তু এ নীতি ড্যাভেনপোর্ট ভাইদেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো না, কাবণ এঁবা দাবি কবতে[illegible]বা যাদুকব নন, খাঁটি ভৌতিক মিডিযাম, এবং এঁদেব বৈঠকে যে সব অত্যাশ্চর্য ব্যাপাব ঘটে, সেগুলো ভূতেবাই এসে কবে যায। দু-ভাই যে শহবেই যেতেন সেখানেই শহববাসীদেব বলতেন,—আপনাদেবই বাছাই-কবা বিচক্ষণ লোক নিযে একটি কমিটি গড়ুন, যে কমিটিব কাজ হবে খুব কাছাকাছি থেকে হুঁশিযাব হযে আমাদেব ওপব নজ[illegible] বাখা, যেন [illegible]মরা কোনোবকম চালাকিব সাহায্য গ্রহণ না কবি।

উত্তেজিত উৎসুক দর্শকে ভবে গেছে টাউন-হলেব ভেতবটা। একটি আসনও খালি নেই। বন্ধ হযে গেল হলেব দবজাগুলো. জানলায জানলায টেনে দেওয়া হলো পর্দা, যেন খোলা জানলা দিযে বাইবেব আলো ভেতবে না আসে। মঞ্চে দাঁড়িযে উদাত্ত কণ্ঠে ডাঃ ফারগুসন ঘোষণা কবলেন—লোকান্তবিত আত্মারা আলো সইতে পাবে না, তাই তাদের আবাহনেব জন্য অন্ধকাবেব প্রযোজন। তিনি আবো ঘোষণা কবলেন ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয—আইবা ইব্যাসটাস এবং উইলিয়াম হেনরি—পেযেছেন পরলোকগত আত্মাদেব আব[illegible]ন কবে নিয়ে আসবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। বললেন, একটু পবেই আপনাবা যেসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখবেন, সেগুলো সংঘটিত হবে এই চক্রে আহূত অশবীবী আত্মাদের দ্বারা।

ড্যাভেনপোর্ট-ভায়েরা বন্দী অবস্থায় দুদিকে দুজনে বসে বসে ধ্যানযোগে তাঁদের আহ্বান করে আনবেন মাত্র। এর ভেতর এঁদের কোনো রকম চালাকি নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে এবং কোনো রকম চালাকি টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ঘোষণা করে দেবার জন্যে আপনাদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি এসে মঞ্চের ওপর আসন গ্রহণ করুন।

যে কয়েকজন বাছাই-করা প্রতিনিধি দর্শকমহল থেকে উঠে গিয়ে মঞ্চের ওপর আসন গ্রহণ করলেন, তাঁদের ভেতর দুজন ছিলেন—জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন এবং তাঁর বন্ধু জর্জ কুক। তারপর মঞ্চে আবির্ভূত হলেন কালো পোশাক-পরা ড্যাভেনপোর্ট-ভ্রাতৃদ্বয়। এলো একটা কাঠের তৈরি ক্যাবিনেট, কাপড়-চোপড় রাখবার 'ওয়ার্ডরোব' (wardrobe) বা আলমারি গোছের, তার ভেতর এপাশ থেকে ওপাশে লম্বা একটি বেঞ্চ। ক্যাবিনেটের ভেতর ঢুকে দুভাই পরস্পর থেকে যথাসম্ভব দূরে, বেঞ্চের দুধারে বসলেন। তাঁদের হাত পা বেঞ্চের সঙ্গে বেশ পোক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো এমনভাবে, যেন সেই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া তাঁদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেঞ্চের মাঝখানে, দুভাই থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো গীটার, ছড়িসহ বেহালা, পেতলের তৈরি একটি শিঙা, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। ভেজিয়ে দেওয়া হলো ক্যাবিনেটের দরজাগুলো।

আলো নিবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠলো ঘণ্টা। বাজলো শিঙা। বাজলো বেহালা। তারপর ক্যাবিনেটের দরজা খুলে বাইরে, স্টেজের ওপর এসে পড়লো বাদ্যযন্ত্রগুলো। দর্শকবৃন্দ ভীত, শিহরিত। সবারই ধারণা ক্যাবিনেটের ভেতরে ভূত আবির্ভূত হয়েই এই সব কাণ্ড করছে, কারণ দুই ভ্রাতাকে তো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাঁদের নড়াচড়া করবার উপায় নেই, বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা।

আবার যেইমাত্র আলো জ্বলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো দুজন ড্যাভেনপোর্ট যেমন ছিলেন তেমনি বেঞ্চের দুপাশে বসে আছেন, দুজনেরই হাত পা এমন শক্ত করে বাঁধা যে, দড়ির পাকগুলো যেন মাংসের ভেতর কেটে বসে গেছে! সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন বলে বলে উঠলেন—"আমি এঁদের বুজরুকি ধরে ফেলেছি।"

দর্শকবৃন্দ একবার চমকে উঠেছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের ভৌতিক ক্ষমতার নমুনা দেখে। আরেকবার চমকে উঠলেন জন নেভিলের এই ঘোষণা শুনে।

এই ঘোষণার ঘোরতর প্রতিবাদ জানালেন ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের ম্যানেজার। সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে জন নেভিল দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,— "ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাগুলো শুধু কৌশল এবং অভ্যাসের ফল, এদের সঙ্গে লোকান্তরিত আত্মার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তিন মাসের ভেতর এঁদের সবগুলো খেলাই আমি আপনাদের করে দেখাবো, তাতে ভুতের কোনো সম্পর্কই থাকবে না।"

ড্যাভেনপোর্ট-ভ্রাতৃদ্বয়কে ভুয়ো বলে প্রমাণ কববার চেষ্টা এখানে যেমন হলো, আগেও কযেকবার হয়েছিলো। কিন্তু এঁদেব পসাব এবং আযও কিছুমাত্র কমে নি, কারণ সাধারণ মানুষ অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করবার জন্যে বড়ো বেশি উৎসুক, বড়ো বেশি ব্যাকুল। আর ইংরেজিতে যে একটি কথা আছে, "The will to believe ultimately becomes belief itself" অর্থাৎ "বিশ্বাস করবার প্রবল ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসেই পরিণত হয", সে কথাটা খুবই সত্যি। জন নেভিল ম্যাসকেলিন বলেছিলেন তিনমাস, কিন্তু তিনমাস দরকার হলো না। দুমাসের ভেতরই ম্যাস্‌কেলিন এবং কুক-এর যাদু প্রদর্শনীর প্রথম প্লাকার্ড (প্রাচীরপত্র) পড়লো চেলটেনহ্যাম শহরের দেযালে দেযালে।

এখানে একটা কথা বলা দরকাব—ড্যাভেনপোর্টদের ভুতুড়ে খেলার গুপ্ত কোশল জন নেভিল ম্যাসকেলিন কি করে টের পেযে গিযেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ড্যাভেনপোর্টদের ক্যাবিনেটের দবজার সামনে। তাঁদের যাদুচক্রের একজন সভ্য ছিলেন জানলার কাছাকাছি। তাঁকে বলা ছিলো জন নেভিল দিয়ে মেঝেতে টোকা দিলেই জানলার পর্দা ক্ষণিকের জন্য সবিয়ে বাইরের আলো ভেতরে ঢুকতে দেবেন। জন নেভিলের যেইমাত্র মনে হলো ক্যাবিনেটের মধ্যের দরজাটা খুলে যাচ্ছে, অমনি তিনি মেঝেতে পায়ের টোকা দিযে ইশারা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার পর্দা ক্ষণিকের জন্য সরে গেল। সেই ক্ষণিকের আলোতেই একমুহূর্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জন নেভিল লক্ষ্য করলেন, একটি বাদ্যযন্ত্র তুলে আপন হাতে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন আইরা ড্যাভেনপোর্ট! হঠাৎ আলো এসে পড়তেই বিদ্যুদ্বেগে বেঞ্চের ওপর নিজের বসবার জাযগায় ফিরে গিয়ে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে কাঁধ গলিযে দিলেন দড়ির বাঁধনের তলায়। অর্থাৎ চোখের পলকে ফিরে গেলেন পূর্বেকার বন্দী অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে জন নেভিল বুঝে নিলেন যত কষেই বাঁধা হোক না কেন, ড্যাভেনপোর্টরা

সেই বাঁধন থেকে বেরিযে এসে আবার ফিরে যেতে পারেন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। বন্ধন-মুক্ত হাত দিয়ে অন্ধকারে নানাবিধ 'ভুতুড়ে কাণ্ড' ঘটিয়ে আবার যখন খুশি তখনই বন্দী অবস্থায় ফিরে যাওয়া—এই হলো ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের গুপ্ত কৌশল। এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে চললো গবেষণা, আবিষ্কার এবং অভ্যাস। ফলে তিন মাসের আগে, দুমাসের ভেতরই ড্যাভেনপোর্টদের খেলা-গুলো রপ্ত করে ফেললেন ম্যাসকেলিন ও কুক।

সেই খেলাগুলো আজ স্বাভাবিক নিয়মে (অর্থাৎ বিনা ভূতে) কবে দেখাবেন ম্যাসকেলিন ও কুক। শুধু তাই নয়, ড্যাভেনপোর্টরা যা দেখিয়ে গেছেন তার চাইতেও অনেক বেশি অদ্ভুত কাণ্ড কবে দেখাবেন এঁরা, পূর্ণ দিবালোকে।

দেখালেনও তাই। ড্যাভেনপোর্ট ভাইরা যে খেলাগুলো দেখিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে গিযেছিলেন, ম্যাসকেলিন ও কুক সেই খেলাগুলিই আরো নিখুঁতভাবে করে দেখালেন। কিন্তু দর্শক মহলে এক ভদ্রলোক তবু যেন সন্তুষ্ট হলেন না, তাঁর মনে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব রয়ে গেল।

"বেশ তো, আপনি তাহ'লে দযা করে উঠে আসুন এই ক্যাবিনেটের ভেতর" —বলা হলো ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক উঠে গিয়ে বসলেন ক্যাবিনেটের ভেতর। তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর তাঁর দুটি হাত বেঁধে দেওয়া হলো দু'পাশে বসা দুজন যাদুকরের হাঁটুর সঙ্গে। বলা বাহুল্য, যাদুকর দুজনও দড়ির বাঁধনে বন্দী। দরজা বন্ধ কবে দেওয়া হলো ক্যাবিনেটের। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেটের ভেতরে শুরু হলো বিচিত্র বাজনার ঐকতান। একটু পরে ক্যাবিনেটের দরজাগুলো খুলে গেল আপনা থেকেই। দেখা গেল ম্যাস-কেলিন এবং কুক ঠিক যেমন ছিলেন তেমনি দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন, খুঁতখুঁতে ভদ্রলোকও চোখ বাঁধা আর দুহাত যাদুকরদ্বয়ের হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন, তফাতের ভেতর শুধু এই যে, নতুন ভদ্রলোকের মাথায় চেপে বসে আছে একটি বাদ্যযন্ত্র! বাঁধন খুলে দেওয়া হলো, ভদ্রলোক জব্দ হয়ে মুখ কাচুমাচু করে এসে বসে পড়লেন দর্শক মহলে।

দুজন যাদুকরকে তখন আগেকার বাঁধনের ওপর আরো দড়ি দিয়ে আরো পোক্ত করে বাঁধা হলো। এমন কি গেরোগুলোর ওপর গালা দিয়ে শীলমোহরও করে দেওয়া হলো। আরেকজন দর্শক ভদ্রলোক বললেন—এবার দুজন যাদুকরের চার হাতের ওপর ময়দা চাপিয়ে দেওয়া হোক। তাই দেওয়া হলো। হাত

দিয়ে কিছু করতে গেলেই হাত থেকে ময়দা পড়ে যাবে। একে দড়ির বন্ধন, তার ওপর এই ময়দার বন্ধন। এবার নিশ্চয়ই জব্দ হবেন যাদুকরদ্বয়।

কিন্তু দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাবিনেটের ভেতর সংগীত যন্ত্রগুলো আবার বাজতে শুরু করলো। বাজনা থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকমহল থেকে একজন তাড়াতাড়ি খুলে দিলেন ক্যাবিনেটের দরজাগুলো। দেখা গেল দুজন যাদুকর ম্যাসকেলিন এবং কুক, তেমনি অসহায় বন্দী অবস্থায় বসে আছেন দুদিকে চুপচাপ, দুজনের হাতভরা ময়দা যেমন ছিল তেমনি আছে, এক কণাও ছিটকে পড়েনি! দড়িতে কষে গেরো বেঁধে দিয়েছিলেন যে গ্রন্থিবিশারদ নাবিক ভদ্রলোক, তিনি এসে গেরোগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। গেরোগুলির ওপর গালা দিয়ে যে শীলমোহর করা হয়েছিলো, সেগুলোও পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল সব ঠিক আছে।

এ অবস্থায় ক্যাবিনেটের দরজাগুলো আবার বন্ধ করে দেওয়া হলো। বন্ধ করে দেবার মিনিট চারেকের ভেতর দুই যাদুকর বন্ধু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, কিন্তু দুজনের চার হাতেই ময়দা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে!

দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন বললে খুব বেশি বলা হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। জন নেভিল ম্যাসকেলিন স্টেজের ওপর আনালেন একটা ভারি কাঠের বাক্স। বাক্সটি তিন ফুট লম্বা, দু ফুট চওড়া, আর খাড়াইতে দেড় ফুট। দর্শকের হাতে বাকসোটি ছেড়ে দেওয়া হলো, তাঁরা ভালো করে সেটাকে পরীক্ষা করলেন। বাকসের ভেতরে জায়গা বেশি নয়, তবু কোনো. ম তার ভেতরে ঢুকে বসলেন জন নেভিল। বাকসোটা তালা বন্ধ করে চাবিটি দিয়ে দেওয়া হলো দর্শকের হাতে। একজন দর্শক বাক্সটিকে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধলেন; গেরোতে শীলমোহর করে দিলেন। সে অবস্থায় বন্দী যাদুকর সহ বন্ধ এবং বাঁধা বাকসোটিকে ক্যাবিনেটের ভেতর তুলে দিয়ে, বাকসোটির ওপরে কয়েকটি ঘণ্টা রেখে ক্যাবিনেটের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করলো, তারপর দরজা ঠেলে একটি একটি করে সবগুলো ঘণ্টা বাইরে এসে পড়লো। সর্বশেষে দরজাগুলো যখন সম্পূর্ণ খুলে গেল, তখন দেখা গেল যাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন বসে আছেন বাকসোটির ওপর। অথচ বাকসোটি যেমন তালাবন্ধ আর দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ছিল তেমনি আছে, দড়ির গেরোর ওপর শীলমোহরও অটুট রয়েছে!

অলৌকিক 'ভৌতিক' শক্তির ভান করে ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় যে খেলাগুলো দেখিয়ে গিয়েছিলেন আলো নিবিয়ে, সেই খেলাগুলো এবং তাঁদের চাইতেও বেশি বিস্ময়কর খেলা দেখালেন ম্যাসকেলিন ও কূক পুরো দিনের আলোয়, সম্পূর্ণ লৌকিক কৌশল খাটিয়ে। বিস্মিত, পুলকিত দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ম্যাসকেলিন আর কূকের জয়-জয়কার। সাফল্যের নেশায় মেতে উঠলেন দুজন তরুণ যাদুকর। শহরে তাঁদের নিশ্চিত রুজি-রোজগারের মোহ-মায়া কাটিয়ে তাঁরা ঠিক করলেন একটা প্রকাণ্ড রকমের ঝুঁকি নেবেন—সফরে বেরোবেন তাঁদের ভ্রাম্যমাণ যাদু-প্রদর্শনী নিয়ে। অসীম সাহস, অসীম উৎসাহ, অসীম আশা তাঁদের। দুরাশা আর দুঃসাহসও বলা যায়, কারণ সেই নীতিকনৈতিকগ্রস্থ ভিক্টোরিয়ান যুগে প্রমোদ-মঞ্চের প্রতি সমাজের দৃষ্টি খুব প্রসন্ন ছিল না। তাছাড়া এ দুই যাদুকর বন্ধুর পুঁজিরও খুব প্রাচুর্য ছিল না, অথচ এ ধরনের উদ্যোগে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন।

যাই হোক, ভ্রাম্যমাণ যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে ঘুরতে লাগলেন যাদুকর ম্যাসকেলিন এবং কূক। প্রথম প্রথম তাঁদের প্রদর্শনীতে বেশ ভিড় হতে লাগল, কারণ 'ভুতুড়ে ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিনা ভুতে এরা কি রকম খেলা দেখাবেন,' এ বিষয়ে সবারই মনে কৌতূহল। কিন্তু পরলোক থেকে ভূত এসে অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা করছে, এ বিশ্বাসে বা কল্পনায় যে নাটকীয় রোমাঞ্চ আছে, যে রোমাঞ্চ ছিল ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে, ঠিক তারই অভাব ছিল ম্যাসকেলিন আর কূকের যাদুপ্রদর্শনীতে। এঁরা তো সোজাসুজি বলেই দিচ্ছেন এদের খেলাগুলোর সঙ্গে ভূতের বা কোনো অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক নেই। তার মানেই খেলাগুলোর মূলে লৌকিক কৌশল অর্থাৎ ধাপ্পা; যদিও ধাপ্পা ঠিক কোথায় কোথায় সেটা ধরা যাচ্ছে না। সুতরাং নতুনত্বটা কেটে গেলেই দর্শক সাধারণের উৎসাহ, কৌতূহল ইত্যাদি ঝিমিয়ে আসতে লাগলো।

দু-বছর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এসে তারপর ম্যাসকেলিন ও কূক তাঁদের যাদু প্রদর্শনের ব্যবসাটি বন্ধ করে দেবেন ভাবছেন, এমন সময় এলো লণ্ডনের 'ক্রিস্ট্যাল প্যালেস' রঙ্গালয়ের ম্যানেজারের কাছ থেকে কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শনের আমন্ত্রণ, গোড়াতেই যার কথা বলেছি।

এইবার তাহলে গোড়ার কথাতেই ফিরে আসা যাক। লণ্ডন শহরে 'ক্রিস্ট্যাল

প্যালেস' রঙ্গালয়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু-প্রদর্শন শুরু করবার আগে মফস্বল শহরের এক রঙ্গালয়ে এক সপ্তাহের চুক্তিতে যাদু-প্রদর্শন শুরু করলেন ম্যাসকেলিন এবং কুক। দুদিনের প্রদর্শনীর পরেই সারা শহরে গুজব রটে গেল —এঁরা দুজন সাধারণ যাদুকর নন, খোদ শয়তানের সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গতা আছে। এঁরা শয়তানের বন্ধু, কিংবা শয়তানের উপাসক।

বুধবার সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে বেশ ভালো আসনে এসে বসলেন শহরের গীর্জার একজন বহু-সম্মানিত গোঁড়া ধর্মযাজক। গীর্জার পাদ্রী এসেছেন রঙ্গালয়ে তাঁদের যাদু খেলা দেখতে দুজন যাদুকরই আনন্দে গৌরবে আত্মহারা। দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা দেখালেন সেদিন। খেলা অদ্ভুত ভালো হলো। পরদিনও এলেন পাদ্রী-সাহেব। আরো উৎসাহিত হলেন যাদুকর দুজন। তারও পরের দিন পাদ্রী-সাহেব এলেন আরো কয়েকজন গুরুগম্ভীর বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। দুই যাদুকরের অদ্ভুত খেলা দেখে [illegible] সবারই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

পরদিন। শনিবার। যাদু-প্রদর্শনী শুরু হবে আরেকটু পরেই। দেখা গেল রঙ্গালয়ের বাইরে জড় হয়েছে একটি বৃহৎ ক্ষিপ্ত জনতা, তার নেতা সেই বৃদ্ধ পাদ্রীসাহেব। সেই কয়ে শো খ্যাপা মানুষকে তিনি এগিয়ে নিয়ে আসছেন রঙ্গালয়ের দিকে।

একটু পরেই স্টেজে আবির্ভূত হতে হবে, তাই স্টেজের নেপথ্যে তৈরি হচ্ছেন দুই যাদুকর বন্ধু। তাঁদের কানে ভেসে আসছে বাইরের দুরন্ত কোলাহল। আনন্দে ভরপুর তাঁদের মন—অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে[illegible] তাঁদের যা[illegible]-[illegible]র্শন, টিকেট-প্রার্থীর ঐ কোলাহলই তার প্রমাণ। এমন সময় ছুটে এলেন রঙ্গা[illegible]য়ের ম্যানেজার। তার চুল উস্কো-খুসকো, জামা ছেঁড়া, শরীরের দু-এ[illegible] জায়গা কেটেও গেছে।

"ভয়ংকর ব্যাপার। পিছনের দরজা দিয়ে শিগগির পালান।" বললেন ম্যানেজার, হাঁফাতে হাঁফাতে।

"কেন? কি হয়েছে? খু[illegible] বলুন ব্যাপারটা।"

"সময় নেই। কথা কাটাকাটি না করে শিগগির পালান। ওরা এসে আপনাদের নাগাল পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে [illegible] [illegible]বে। শুধু আপনাদের নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই হলের সব কিছু ওরা ভেঙে-চুরে তচনচ করবে। ঐ বুড়ো পাদ্রী ওদের সবাইকে বুঝিয়েছে, আপনারা খোদ শয়তানের

চেলা— আপনাদের এই সব অদ্ভুত কাণ্ড শয়তানের কীর্তি, মানুষের কর্ম নয়।"

জন নেভিল প্রথমে ভাবলেন, জনতার মুখোমুখি হয়ে তাদের ভুল ভেঙে দেবেন। কিন্তু 'রক্ত চাই' জাতীয় হুঙ্কার শুনে তিনি মত বদলালেন। সঙ্গে তাঁর নবপরিণীতা সুন্দরী বধূ, তাঁকে এই বিপদের মুখে ফেলা ঠিক হবে না, ভাবলেন তিনি। ম্যানেজার বঙ্গালয়ের সামনের দিকের দরজা বন্ধ করে রেখে জনতাকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখলেন। সেই সুযোগে পিছনের দরজা দিয়ে প্রাণ নিয়ে সদলে পলায়ন করলেন কুক এবং ম্যাসকেলিন-দম্পতি। যাদু-প্রদর্শনে অসাধারণ সাফল্য আরেকটু হলেই তাঁদের অকাল-মৃত্যুর কারণ হতো। অতি-ভালো যে সব সময়ে ভালো নয়, এ ঘটনাটি তার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

একটি অভিশপ্ত খেলা

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ অ্যাস্টলির লেখা যাদুবিদ্যা বিষযক একটি বই প্রকাশিত হযেছিল। বইটির নাম 'ন্যাচারাল ম্যাজিক' অর্থাৎ লৌকিক (বা স্বাভাবিক) যাদুবিদ্যা। লেখক একজন যুবক—বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার, পেশাদার সৈনিক, শখের যাদুকর। বইটির ভূমিকায তিনি তাঁর সৈনিক জীবনের কযেকটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ; বিশেষ করে তিনি বন্দুকের গুলি ধরার লোমহর্ষক খেলাটি কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন—অথবা কি পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করতে বাধ্য হযেছিলেন—তারই কাহিনী।

তিনি লিখেছেন ... দলে তাঁর দুজন সহকর্মীর ভেতব একবার ভয়ানক ঝগড়া হলো, দুজনে দুজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। ঠিক হলো, আগামীকাল খুব ভোরে হবে তাঁদের লড়াই। দুজনেই পিস্তল হাতে পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে কিছু দূরে দাঁড়াবেন, মধ্যস্থের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরস্পরেব দিকে কুড়ি পা এগিয়ে এসে গুলি ছুঁড়লেন।

দুজনেই পিস্তল চালাতে পাকা ওস্তাদ, সুতরাং দুজনের ভেতর অন্তত একজনের মৃত্যু অবধারিত। মনোমালিন্যের ফলে বন্ধুর হাতে বন্ধুর মৃত্যু হবে, অ্যাস্টলির তা ভালো লাগলো না। অথচ দুটি বন্ধুই ভয়ানক একগুঁয়ে, দুজনেই আত্মসম্মান জ্ঞান ভয়ানক টনটনে, পিস্তলের লড়াই থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করা যাবে না কিছুতেই। তাহলে কি উপায়ে তাদের দুজনেরই প্রাণ এবং মান দুই-ই এক সঙ্গে বাঁচানো যায়? দ্রুতবেগে মাথা ঘামাতে লাগলেন অ্যাস্টলি। প্রথমেই বলেছি, তিনি ছিলেন শখের যাদুকর। হাত-সাফাই আর চোখে ধুলো দেবার নানা রকম কায়দা তাঁর জানা ছিলো, এদিকে তাঁর মাথাও ভালোই খেলতো। উপায় তিনি বার করে ফেললেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের সামনেই তিনি যথাসময়ে পিস্তলের নলের ভেতর গুলি আর বারুদ পুরে দিলেন। পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার সময় আওয়াজ শুনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভাবলেন গুলি ছুটলো, কিন্তু আসলে তা শুধু বারুদের ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, যে গুলি দুটি পিস্তল থেকে ছুটে বেরোবার কথা, তারা তখন বিশ্রাম করছে অ্যাস্টলির পকেটে।

দুজনেই গুলি ছুঁড়েছেন, সুতরাং দুজনেরই জেদ এবং মান বজায় থেকেছে। কিন্তু দুজনেরই মনে থেকে গেল একটি বিস্ময়—দুটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কি করে? তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন এর মূলে ছিল অ্যাস্টলির যাদু-কৌশল? হয়তো পেরেছিলেন, অথবা হয়তো পারেননি। যাই হোক, দুজনের প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ফিলিপ অ্যাস্টলি যে যাদু-কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা 'বুলেট ধরার খেলা' (বুলেট ক্যাচিং ট্রিক) অনেক যাদুকরের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

এঁদের ভেতরে একজন ছিলেন ভারতীয় যাদুকর। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের প্রমোদ-জগতে বেশ একটু সাড়া জাগিয়েছিলেন যাদুকর রামস্বামী ও সম্প্রদায়। এঁদের যাদুক্রীড়ার তালিকায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল এই "বুলেট ধরার খেলা।" ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বছর তিনেক যাদু-প্রদর্শন করে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রামস্বামী যাদু-সম্প্রদায় গেলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে খেলা দেখাতে। দুর্ঘটনা ঘটলো সেইখানে। রামস্বামী দলের একজন যাদুকর উড়ন্ত বুলেট কামড়ে ধরে ফেলাব লোমহর্ষক খেলা দেখাতেন। পিস্তলে বুলেট পুরে পিস্তলটি একজন যুবকের হাতে দেওয়া হতো। যুবকটি যাদুকরকে লক্ষ্য করে পিস্তল চালাতেন। 'গুড়ুম' করে আওয়াজ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যেতো বুলেটটিকে যাদুকর কামড়ে ধরে ফেলেছেন।

কিন্তু সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার রাত্রে নিয়তি এক নিষ্ঠুর খেলা খেললেন। সম্ভবত ভুলের বশে কৌশলযুক্ত পিস্তলের বদলে আসল টোটাভরা পিস্তল ছুঁড়তে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, অথবা অন্য এমন কোনো ভুল হয়েছিল যার ফলে অন্যান্য রাতের মতো শুধু বারুদের ফাঁকা আওয়াজ না হয়ে আসল বুলেটই ছুটে বেরলো। আসল পিস্তল থেকে সত্যি সত্যি আসল বুলেট ছুটলে সে বুলেট কামড়ে ধরে ফেলা কোনো মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। রামস্বামী সম্প্রদায়ের সেই হতভাগ্য যাদুকরের পক্ষেও সুতরাং সম্ভব হলো না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। ভারতের এক যাদুকর যাদুর খেলা দেখাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডে।

এর বছর দুই বাদে জার্মানীর আর্নস্টাডট শহরে যে দুর্ঘটনা ঘটলো এই একই মারাত্মক খেলা দেখাতে গিয়ে, তার কাহিনী আরো শোচনীয়, আরো মর্মান্তিক। পোল্যাণ্ডের যাদুকর দ্য লিনস্কির (De Linsky) খ্যাতি তখন সারা ইউরোপ

জুড়ে। তিনি সাদর আমন্ত্রণ পেলেন আর্নস্টাডট থেকে—সেখানে যাদু প্রদর্শন করতে হবে যুবরাজ ফন শোয়াৎসবুর্গ সণ্ডারহাউসেনের (Prince von Schwartzburg Sonderhausen) প্রাসাদে। আশাতীত সম্মানের আনন্দে আত্মহারা যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি পত্নীকে বললেন, 'এইবার আ‍াদের বরাত খুলে গেলো। এখন থেকে আমার প্রচার-পুস্তিকায যুবরাজের নাম ছাপতে পারবো আমার যাদুমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। যাদু জগতে বাড়বে মর্যাদা। আর এর পর আমার যাদু-প্রদর্শনীর দক্ষিণাও দেবো চড়িয়ে। কম টাকায আর কোথাও খেলা দেখাবো না। এবারে রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদে-প্রাসাদে যাদু দেখিয়ে বেড়াবো। ইউরোপ জুড়ে এখন তো রাজা-রাজড়ার ছড়াছড়ি।'

খুশি হযে উঠলেন তাঁর পত্নী, যাদু-সহকারিণী মাদাম দ্য লিন্‌স্কি, রাজা-রাজড়ার প্রসঙ্গ শুনে। দামী মণি-মুক্তা জহরতাদি রাজকীয উপহার নিশ্চয়ই প্রচুর মিলবে। সারা ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের প্রিয়তম যাদুকর যাদুসম্রাট দ্য লিন্‌স্কির সহধর্মিণী তিনি; কত নারী ঈর্ষান্বিতা হবে তাঁর অসামান্য সৌভাগ্যে। হায় মাদাম দ্য লিন্‌স্কি!

১০ই নভেম্বর, ১৮২০ সাল। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে কিছুক্ষণ হলো। আর্নস্টাডট শহরে যুবরাজ ফন শোয়াৎসবুর্গ সণ্ডারহাউসেনের প্রাসাদে চমৎকার জমেছে যাদুকর দ্য লিন্‌স্কির যাদু-প্রদর্শন। এইবারে দেখানো হবে তাঁর যাদু-ভাণ্ডারের সবচেযে বিস্মযকর, সবচেযে ভযঙ্কর, সবচেয়ে বেশি শিহরণ জাগানো খেলা।

স্টেজের একদিকে সারি দিযে দাঁড়ালো ছ'জন সৈনিক—যুবরাজের দেহ-রক্ষী। সবারই হাতে বন্দুক। দর্শকদের পরীক্ষিত কার্তুজ আপন আপন বন্দুকে পুরে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো তারা, ইঙ্গিত পেলেই একসঙ্গে গুলি চালাবে। আপাদমস্তক সামরিক সাজে সজ্জিত উদ্যত-বন্দুক এই ছ'জন সাক্ষাৎ যমদূতের মুখোমুখি স্টেজের ওধারে কে? যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি? না, তিনি নন। দাঁড়িয়ে আছেন কুসুমসুকুমারতনু তন্বী সুন্দরী মাদাম দ্য লিন্‌স্কি।

অসাধারণ পরিস্থিতি। এর অসাধারণত্বের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে উপস্থিত প্রত্যেকের, বিশেষ করে যুবরাজ পরিবারের, মনোযোগ আকর্ষণ করলেন যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি। তিনি বললেন "মাদাম দ্য লিন্‌স্কিই সমগ্র বিশ্বে একমাত্র মহিলা যিনি যাদু-শক্তিতে বন্দুকের উড়ন্ত বুলেট হাতে ধরে ফেলতে পারেন। তার চাক্ষুষ প্রমাণ আপনারা এখখুনি দেখতে পাবেন। আসল

কার্তুজ—আপনারাই পরীক্ষা করে দিয়েছেন—আসল বন্দুকে পুরে গুলী চালাচ্ছে ছ'জন সত্যিকারের সৈনিক। বিশ্বের যাদু-প্রদর্শনের ইতিহাসে এ অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অভিনব।......"

নির্ভীক, নিষ্কম্প, নিঃসংশয় কণ্ঠস্বর যাদুকর ছ লিন্‌স্কির। তাঁর যাদুকর জীবনে আজ এক মহা গৌরবের দিন, যাদু-প্রদর্শনের ইতিহাসে আজ এক নতুন নজির তৈরি হবে। কিন্তু ওদিকে দুরুদুরু কাঁপছে মাদাম ছ লিন্‌স্কির বুক। মুখে ফুটিয়ে রেখেছেন মৃদু হাসি, কিন্তু ঐ হাসি পারেনি তাঁর অন্তরের ভীতিকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখতে। তাঁর সারা মন জুড়ে রয়েছে রিবাট আশঙ্কা, আর দুহাতে লুকনো আধ-ডজন বুলেট। এই লুকনো বুলেটগুলিই দুহাতে 'ধরতে' হবে ঠিক ফাঁকা আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু আওযাজ যদি ফাঁকা না হয়? যদি একটি বন্দুক থেকেও সত্যি সত্যি আসল বুলেট বেরিয়ে আসে, তাহলে?

যাদুকর ছ লিন্‌স্কি যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তার কারণ ঐ সৈনিককে তিনি আগেই গোপনে শিখিয়ে রেখেছিলেন তারা যেন বন্দুকে পুববার আগে কার্তুজের মুখটা দাঁত দিয়ে কেটে নেবার সময় বুলেটটাও মুখের ভেতর টেনে নিয়ে সেখানেই লুকিয়ে রাখে। (তখনকার কার্তুজ ঐভাবে দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরা হতো।) তাহলে কোনো বন্দুকেই বুলেট পোরা হবে না। পোরা হবে শুধু বারুদ-ভরা বুলেটহীন কার্তুজ। তার ফলে বন্দুকের ঘোড়া টিপলে বারুদের ফাঁকা আওয়াজটাই শুধু হবে, বুলেট ছুটবে না।

এভাবে তালিম দিয়ে সেই ভরসাতেই তিনি মাদামকে অভয় দিয়েছিলেন। মাদাম বলেছিলেন "কিন্তু এরা এ ধরনের যাদু খেলায শিক্ষিত বা অভ্যস্ত নয়, এতো অল্প অভ্যাসে এরা নিখুঁতভাবে তৈরি হতে পারবে কি? তাছাড়া এরা অশিক্ষিত, তোমার সব কথা ভালো করে বুঝেছে কিনা তার ঠিক কি? আমার কিন্তু বড়ো ভয় করছে।"

যাদুকর তাঁর সেই ভয়কে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "কোনো ভয় নেই। আমি ওদের বার কয়েক রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছি যে।"

পতিদেবতার পীড়াপীড়িতে সতী দেবী 'অগত্যা' রাজী হয়েছিলেন, মনজোড়া নিদারুণ আশঙ্কা নিয়ে। শেষকালে সতীর আশঙ্কাই সত্য হলো। ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকরা যে যার বন্দুকের ঘোড়া টিপলে মাদামকে লক্ষ্য

করে, ঠিক যেমনটি করবার কথা ছিলো। প্রচণ্ড আওয়াজ হলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মর্ম্মান্তিক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মন্দভাগ্য মাদাম দ্য লিন্স্কি। একজন সৈনিক ভুল কবেই হোক বা দুষ্টুমি কবেই হোক, কার্তুজ থেকে বুলেটটি কামড়ে মুখের ভিতর নিযে নেযনি। বন্দুকের ভেতবই পুরে দিয়েছিল। সেই বুলেটটিই মাদাম দ্য লিন্স্কিব দেহ বিদ্ধ করে তাঁর মৃত্যুব কাবণ হলো।

এর মাত্র কিছুদিন আগে যাদুকর দ্য লিন্স্কির একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হযেছিল। এবাব তিনি স্ত্রীকে হারালেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর নতুন ভাবী সন্তানকে, আর কয়েক মাসের ভেতরই যার পৃথিবীর আলোয চোখ মেলে তাকাবার কথা ছিল। পত্নীর শোকে এবং নিদারুণ আফশোষে যাদুকর দ্য লিন্স্কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী যাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ (Robert Houdin) তাঁর স্মৃতি-কাহিনীতে একটি করুণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। উদ্যাঁর যাদুবিদ্যার গুরু ছিলেন একজন কাউণ্টের পুত্র। তাঁর নাম এদমঁ দ্য গ্রিসি (Edmond De Grisy); যাদু-জগতে তিনি ছিলেন 'টরিনি' (Torrini) নামে খ্যাত। উদ্যাঁকে যে তিনি তাঁর আপন ভাণ্ডার উজাড় করে যাদুবিদ্যায় তালিম দিযেছিলেন, তাব কারণ উদ্যাঁকে তিনি তাঁর আপন একমাত্র পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। এবং এই স্নেহের কাবণ—রবেযাব উদ্যাঁর চেহারার সঙ্গে যাদুকব 'টরিনি'ব স্বর্গত পুত্র জিওভানি দ্য গ্রিসির চেহারার আশ্চর্য মিল ছিলো; তাই তিনি যেন উদ্যাঁর মধ্যে তাঁর সেই হারানো ছেলেকে খুঁজে পেতেন। এ ছেলের শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে "টরিনি" উদ্যাঁকে বলেছিলেন:

স্ট্রাসবুর্গ (Strasburg) শহরের সেরা রঙ্গালয়ে আমি যাদু প্রদর্শন করছি। প্রেক্ষাগৃহেব প্রত্যেকটি দর্শক উদ্‌গ্রীব হযে রযেছে আমার বিখ্যাত মর্মস্পর্শী খেলাটি দেখবার জন্যে, যে খেলাটির আমি নাম দিযেছিলাম 'উইলিয়াম টেল্-এর পুত্র'। এ খেলায় আমার পত্র জিওভানি অবতীর্ণ হতো সুইস বীর উইলিযাম টেল-এব পুত্র ওযাল্‌টারের ভূমিকায়। তফাৎ এই যে আপেলটি ওযাল্‌টারের মতো মাথাব ওপব না রেখে জিউভানি তার দু-টি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখতো। আমি ইশারা করতেই একজন দর্শক জিওভানিকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি চালাতেন। দেখা যেতো গুলিটি ঐ আপেলটিকে বিদ্ধ করে আপেলের ভেতরেই আটকে রয়েছে।

"খেলাটির মূল কৌশল ছিলো পিস্তলের আসল গুলির পরিবর্তে নকল গুলি ব্যবহারে। একজন অভিজ্ঞ রাসায়নিক আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে কয়েকটি ধাতুর গুঁড়ো মিশিয়ে এমনভাবে গুলি তৈরি কবা যায় বা দেখতে প্রায় হুবহু আসল সীসার গুলির মতোই হতো। এই নকল গুলি পিস্তলে ব্যবহার করবার আসল গুলির সঙ্গে মিশিয়ে রাখলে সহজে তফাৎ বোঝা যেতো না। এই নকল গুলি বারুদসহ পিস্তলে পুরে দিলে গুঁড়িয়ে যেতো ; ফলে পিস্তলের ঘোড়া টিপলে আওয়াজ আর ধোঁয়া হতো ঠিকই, কিন্তু গুলি ছুটতো না। (বলা বাহুল্য আপেলের ভেতর যে গুলিটি পাওয়া যেতো সেটি অন্য গুলি এবং আসল গুলি, দর্শক কর্তৃক পিস্তল থেকে ছোঁড়া গুলি নয়।)

সেই নিদারুণ সন্ধ্যায কি মর্মান্তিক ভুল আমার হয়ে গেলো! নিশ্চয়ই মেকি গুলির পরিবর্তে পিস্তলে একটি আসল গুলিই ভবা হয়ে গিয়েছিল, হতভাগ্য আমি তা খেয়াল করিনি। দর্শকদের একজন প্রতিনিধি উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ; আমি জানি না ঐ পিস্তলের ভেতরেই রয়েছে আমার পুত্রেব মৃত্যুবাণ, আমারই ইশারার অপেক্ষায়।...

"ইশারা করলাম। গর্জন কবে উঠলো পিস্তল। গুলি চলে গেলো আমাব একমাত্র পুত্রের ললাট ভেদ কবে। আর্তনাদ কবে লুটিযে পড়লো জিওভানি, দুঃসহ যাতনায় দু-একবার এপাশ-ওপাশ করলো। তারপব সব শেষ।"

এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, অবশ্য ববেযার উদ্যাঁ তাঁর আত্মস্মৃতি গ্রন্থে যে কাহিনী লিখেছেন তা যদি সত্য হয়। 'যদি' বললাম এই কারণে যে কেউ কেউ সন্দেহ করেছেন উদ্যাঁ তাঁর স্মৃতিকথায অনেক বানানো গল্পকেও সত্যি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, অনেক সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য বলে চালাবার জন্যে প্রচুর রঙ চড়িযেছেন বিশ্ববিখ্যাত আত্মচরিত লেখক রুশোর মতো।

কিছু কিছু গুল-গল্প, কিছু কিছু অতিরঞ্জন উদ্যাঁ-র স্মৃতিকথায় থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু উক্ত কাহিনীটির সত্যতায় বিশ্বাস হয় এই জন্যে যে বন্দুকের গুলি আটকানোর এই মারাত্মক খেলায় তিনি কোনো মানুষকে বন্দুক বা পিস্তলের গুলির লক্ষ্য বানাতেন না। মনে হয় 'টরিনি'র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু-কাহিনী শুনে তিনি সাবধান হয়েছিলেন, তাই যাদু-প্রদর্শনের খাতিরে নিজের বা অন্য কারও প্রাণ-হানির ঝুঁকি নিতে রাজী হননি। তাঁর খেলায় গুলি ছোঁড়া হতো ছুরির ফলায়

বেঁধানো একটি আপেলকে লক্ষ্য কবে। তাবপব ঐ আপেলের ভেতব থেকে তিনি সেই (?) গুলিটি বাব কবে দেখাতেন।

বিখ্যাত হ্যাবি হুডিনি-ব (Harry Houdini) মতো বেপবোয়া যাদুকব পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মাননি। যাদু-জগতে অতুলনীয় সাড়া জাগাবাব উদগ্র নেশায় তিনি দুঃসাহসিক যাদুব খেলায বহুবাব মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ কবেছিলেন। তিনি যখন ঠিক কবলেন তিনিও এই গুলি আটকানোব খেলা দেখাবেন আবো বহস্যময আবো লোমহর্ষকরূপে, তখন মার্কিন যাদু-জগতেব প্রবীণতম যাদুকব হ্যাবি কেলাব বললেন "হ্যাবি, আমি তোমায পুত্রেব মতো স্নেহ কবি। এই সর্বনেশে, অভিশপ্ত খেলা তুমি দেখাতে যেযো না। এ খেলায তুমি যতো হুঁশিয়াবই হও না কেন, বিপদেব ঝুঁকি থেকে যাবেই। বৃদ্ধেব কথা বাখো, এ খেলা দেখাবাব দুর্মতি ত্যাগ কবো। আমাদেব একমাত্র হুডিনিকে হাবালে সে লোকসান আমাদেব সইবে না।"

হুডিনি এ অনুবোধ বেখেছিলেন।

চুং লিং স্থ

শনিবার ২৩শে মার্চ্চ, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। রাত্রি। লণ্ডন শহরের উডগ্রীন এম্পা-য়ার রঙ্গালয়। "বিস্ময়কর চীনা যাত্বকর চুং লিং স্থ-র (Chung Ling Soo) যাত্ব-প্রদর্শনী। অতুলনীয এই যাত্বকরের যাত্বমুগ্ধ ভক্ত দর্শকে হল ভর্তি; একটি আসনও খালি নেই। প্রত্যেক জোড়া চোখে অসীম কৌতূহল।

"বিস্মযকর চীনা যাত্বকর" (Marvellous Chinese Conjurer)—এই তিনটি শব্দের সঙ্গে শুধু লণ্ডন নয, ইংলণ্ডেব প্রমোদ জগৎ তখন গত আঠারো বছর ধরে পরিচিত। তিন শব্দের এই বর্ণনাটি যে চুং লিং স্থ-র সম্বন্ধে নিখুঁত-ভাবে প্রযোজ্য, সে বিষয়ে যাত্ব-আমোদী সাধারণেব মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শুধু যে তাঁর যাত্বর ছোটো বড়ো সবগুলো খেলাই আশ্চর্য রহস্যময ছিল, এবং সেগুলো কি করে সম্ভব দর্শকরা তা প্রচুর মাথা ঘামিয়েও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতেন না, তাই নয। চোখ-চমকানো জমকালো রঙে রঙিন রেশমি পর্দা, তার ওপর চীনা ড্রাগন এবং আরো নানারকমের নকশা আঁকা, প্রাচ্য পদ্ধতিতে মনোমুগ্ধকর মঞ্চসজ্জা, নেপথ্যের আবহ-সঙ্গীতে প্রাচ্য স্থর, প্রাচ্য ছন্দ সব কিছু মিলিয়ে সারা মঞ্চ জুড়ে থাকত প্রাচ্য আবহাওযা, যে আবহাওযা ছড়িযে যেতো সারা হলে। যাত্বকবের দলের সবাই চৈনিক সাজে সজ্জিত। সবার ওপরে সেরা আকর্ষণ স্বযং অতুলনীয যাত্বকর চুং লিং স্থ, তাঁর মুখে অমাযিক রহস্যভরা মৃত্ব হাসি, পরনে ঢিলেঢালা রঙিন চীনা আলখাল্লা। তাঁর চৈনিক কায়দায় চলাফেরা অঙ্গভঙ্গি সব কিছুই অপরূপ, নযনাভিরাম। ইংরাজি আদৌ জানতেন না, অথবা ভালো জানতেন না—দর্শকদের তাই ধারণা—তাই তিনি নীরবেই দেখিয়ে চলতেন খেলার পর খেলা, বিস্মযের পর বিস্ময় জাগিয়ে। অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তাঁর নির্বাক যাত্ব-প্রদর্শন দর্শকদের করে রাখত মন্ত্রমুগ্ধ, নির্বাক; শুধু মাঝে মাঝে যখন বিস্ময় চরমে উঠত, তখন দর্শকদের সমবেত উল্লাসধ্বনিতে ভরে উঠতো সারা প্রেক্ষাগৃহ।

আজ শনিবার ২৩শে মার্চ; ১৯১৮। রাতের প্রদর্শনীতে যাঁরা চুং লিং স্থ-র যাত্বর খেলা দেখতে এসেছেন, তাঁদের অনেকে গত কয়েক রাত ধরে রোজই

আসছেন, একটি রাতও বাদ না দিয়ে। পাকা খানদানী ওস্তাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত যেমন বারবার শুনেও পুরনো হয় না, যতো বেশিবার শোনা যায় ততোই আরো বেশি করে ভালো লাগে, চুং লিং স্যু-র প্রদর্শিত একই খেলা রাতের পর রাত দেখেও তেমনি আশ মেটে না দর্শকদের। এই কথাই নানাভাবে জাগছে হলশুদ্ধ দর্শকদের মনে। তাঁরা ভাবছেন অন্যান্য রাতের মতো আজ রাতেও খেলার শেষে বিস্ময়-পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরে যাবেন। তাঁরা জানেন না নিয়তির বিধানে আজকের রাতটা অন্য রাতের চাইতে কী ভীষণ রকম আলাদা, জানেন না আজ রাতে এই উডগ্রীন এম্পায়ার হলে তাঁদের চোখের সামনে একটু পরেই কী নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটবে।

বেশ কিছুক্ষণ যাদুর খেলা দেখিয়ে মঞ্চের নেপথ্যে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন চুং লিং স্যু। শুধু বিশ্রাম নয় তৈরিও হয়ে নিচ্ছেন পরের খেলাটির জন্য। যাদু-বিরতির এই সময়টা দর্শকদের মশগুল রাখছেন চুং লিং স্যু-র জাপানী স্টেজ-ম্যানেজার কামেতারো (Kametaro) তাঁর নিজের খেলা দিয়ে। 'জাগলিং' (Juggling) অর্থাৎ বল, চামচ, ছুরি, প্লেট প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিয়ে নানা রকম লোফালুফির এবং ভারসাম্যের খেলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। হরেক রকম সার্কাসী খেলাতেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। এছাড়া একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা তিনি দেখান, সেটি হচ্ছে একেবারে খালি পায়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের একটি মই বেয়ে বেয়ে উঠে উল্টো দিক দিয়ে অন্য মই দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া। তলোয়ারের ধারালো ফলাগুলো ওপরমুখো, তারই ওপর পা দিয়ে দিয়ে ওঠা-নামা; একচুল এদিক ওদিক হলেই পা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে। এটা যাদুর খেলা নয়, অর্থাৎ এর ভেতরে কোনো ফাঁকির কৌশল নেই, এর কৌশল শুধু অসীম সাহস, আত্মবিশ্বাস আর নির্ভুলভাবে পা ফেলা। এ-খেলার তুলনায় সার্কাসের উঁচু ট্রাপিজের খেলাও অনেক বেশি নিরাপদ। খেলাটি এমন সাংঘাতিক রকম বিপদ্‌জনক যে, চুং লিং স্যু অনেকবার কামেতারোকে বলেছেন "কামে-তারো, এই মারাত্মক খেলাটিকে বাদ দাও তোমার খেলার ঝুলি থেকে। এটার বদলে অন্য কোনো খেলা দেখাও।" কিন্তু…

এবারে যাদুকর চুং লিং স্যু-র কথা কিছু বলে নিই, বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি সেরা খেলার কথা। চুং লিং স্যু ছিলেন লম্বা সুগঠিত সুপুরুষ।

তাঁর সহধর্মিণী এবং সহকারিণী সুঈ সীন (Suee Seen) ছিলেন ছোটোখাটো মানুষ ; অসাধারণ বুদ্ধিমতী, অসাধারণ চটপটে। সুঈ সীনকে নিযে চুং লিং সু "মুক্তার জন্ম" (Birth of a Pearl) নামে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত একটি চমৎকার খেলা দেখাতেন। এ খেলাটি দেখাতে যেমন ভালোবাসতেন চুং লিং সু, তেমনি দেখে কখনো আশ মিটতো না দর্শকদের। যাদুপ্রদর্শনী নিযে বিশ্বের যেখানেই তিনি গেছেন—গেছেন অনেক জাযগায—সেখানেই এ খেলাটি দেখিয়েছেন চুং লিং সু। খেলাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। স্টেজের উপর একটা কাপড়ের পর্দা সরে যেতেই দেখা যেতো সমুদ্রের তলার দৃশ্য—এখানে ওখানে সামুদ্রিক আগাছা, শ্যাওলা-ঢাকা পাথর ইত্যাদি, আর স্টেজের মাঝখানে একটা বিরাট শুক্তি বা ঝিনুক। চুং লিং সু সেই ঝিনুকের দুপাটি সম্পূর্ণ ফাঁক করে খুলে দর্শকদের পরিষ্কার দেখিযে দিতেন ঝিনুকের ভেতরটা নিঃসন্দেহে ফাঁকা। তারপর দুপাটি মুখোমুখি চেপে বন্ধ করে দিযে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝিনুকটি ফাঁক করতেই দেখা যেতো ওপরের ঢাকনাটি ঠেলে তুলে শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তার মতো বেরিয়ে আসছেন সু-প্রিয়া সুঈ সীন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিযায় যাদু-প্রদর্শনের সময এ খেলাটি ছিল সু-র অন্যতম প্রধান খেলা।

কামানের খেলাটিও চমৎকার। দুপাশে দুই চাকাওযালা কামান গড়িযে গড়িয়ে আনা হলো স্টেজের মাঝখানে। লম্বা চওড়া চুং লিং সু ছোটোখাটো সুঈ সীনকে অবলীলাক্রমে দুহাতে শূন্যে তুলে যেন জোর করেই কামানের মুখের ভেতর পুরে দিলেন। সুঈ সীন কামান-গহ্বরে অদৃশ্য হযে যেতেই চুং লিং সুর দুজন সহকারী কামানের মুখের ভেতর একটি মস্ত গোলা পুরে দিলেন। যাদুকরের ইঙ্গিতে কামান দাগা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগানো প্রচণ্ড আওযাজ। দর্শকমহলে ভীতি, উদ্বেগ, শিহরণ ইত্যাদি। কামানের গোলাটা আর সুঈ সীন বেচারা কোথায় গিযে পড়বে কে জানে? গোলাটা কিছু দূর উঠেই স্টেজের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু কোথায গেলেন শ্রীমতী সুঈ সীন? হঠাৎ বিস্ময়ের সমবেত গুঞ্জরন শোনা গেল দোতলায দামী আসনের সারিগুলো থেকে। সেইখানে দাঁড়িয়ে হাসছেন সুঈ সীন। হাসিমুখে তিনি বিলোতে শুরু করলেন চুং লিং সু-র ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড। কিন্তু কামানের ভেতর থেকে অদৃশ্য হযে উনি ওখানে গিযে পৌঁছলেন কি করে?

আরেকটি খেলা। একটি নিচু টেবিল স্টেজে এনে রাখা হলো পাদ-প্রদীপের

সামনে। তার ওপর দাঁড়ালেন শ্রীমতী সুঈ সীন। শ্রীমতীকে ঢেকে ফেলা হলো একটা ফাঁপা ঢাকনা দিয়ে। তারপর ঢাকনাটা তুলে ফেলতেই দেখা গেল শ্রীমতী অদৃশ্য, তার জায়গায় একটা গাছে বোঁটায় বোঁটায় ঝুলছে কমলালেবু! কাঁচি দিয়ে বোঁটা কেটে একটি-একটি করে অনেকগুলো কমলালেবু চুং লিং সু ছুঁড়ে দিলেন প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশে দর্শকদের হাতে। কিন্তু সুঈ সীন গেলেন কোথায়? কোনোরকমে গুটিসুটি মেরে টেবিলের তলায় লুকিয়ে নেই তো? না না, ঐ তো শ্রীমতী নেপথ্য থেকে মঞ্চে প্রবেশ করছেন মৃদু ছন্দে পা ফেলে ফেলে। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো?

তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের খেলাটা তো রীতিমতো লোমহর্ষক। স্টেজের এক ধারে একটি চাঁদমারী। অন্যদিকে যাদুকর চুং লিং সু-র হাতে গজখানেক লম্বা একটি ইস্পাতের ফলা বসানো তার। ধনুকের ছিলায় তীরের যে দিকটা বসানো হয়, সেদিকটার সঙ্গে একটি লম্বা ফিতে এঁটে দিলেন যাদুকর। তারপর একি? তীর আছে ধনুক নেই কেন? ধনুকের অভাবে বন্দুকের নলের ভেতরই ফিতে-ওয়ালা তীরটা পুরে দেওয়া হলো। বন্দুক হাতে স্টেজে চাঁদমারীর বিপরীত দিকে হাঁটু গেড়ে বসে চাঁদমারীর কেন্দ্রবিন্দুটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বার জন্য তৈরি হলেন চুং লিং সু। সেই কেন্দ্রবিন্দু লক্ষ্য করে তীর যে পথে ছুটবে, ঠিক সেই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী সুঈ সীন। তাঁকে যেন একটু ভীতা, সন্ত্রস্তা দেখা যাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক। কারণ তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করবেনই চুং লিং সু। অবস্থা সঙ্গীন। থেমে গেল অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত। সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে গভীর নিস্তব্ধতা। বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন যাদুকর। দুম করে আওয়াজ হলো বন্দুকের, শোনা গেল সুঈ সীনের অর্ধস্ফুট আর্তনাদ। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা গেল বায়ুপথে উড়ন্ত তীরের যাত্রার ধ্বনি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তীরটি লক্ষ্যভেদ করেছে, চাঁদমারীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে বিঁধে দুলছে প্রচণ্ড ধাক্কায়। তীরটি শ্রীমতী সুঈ সীনকে এফোঁড় ওফোঁড় ভেদ করে চলে গেছে নিশ্চয়ই! তা নইলে লক্ষ্যভেদ করলে, কি করে? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ফিতেটা শ্রীমতীর দেহ ভেদ করে চলে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পর্দা। তারপরই হাসিমুখে পর্দার এপারে এসে দর্শকদের উদ্দেশে অভিবাদন জানালেন চুং লিং সু আর সুঈ সীন। কিছুই হয়নি সুঈ সীনের। স্বস্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দর্শকবৃন্দ, কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হলো কি করে?

হাওয়া থেকে মাছ ধরার খেলাটিও (Aerial Fishing) চুং লিং স্থ-র হাতে আশ্চর্য মাযাজালের সৃষ্টি করতো। এ-খেলায় মাছ ধরবার ছিপ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে বঁড়শিতে টোপ গেঁথে চুং লিং স্থ দর্শকদের চোখের সামনে হাওয়া থেকে বঁড়শিতে সোনালি মাছ ধরতেন। হঠাৎ কি করে কোথা থেকে এসে বঁড়শির ডগায় ধরা পড়ে ছটফট করছে সোনালি মাছ, তাই ভেবে ভেবে দর্শকেরা কূলকিনারা পেতেন না। বঁড়শি থেকে অতি সন্তর্পণে মাছটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা কাচের জলপাত্রে ছেড়ে দিতেন যাদুকর; মাছটা চমৎকার সাঁতার কেটে বেড়াতো। এভাবে বঁড়শিতে একটিব পর একটি করে বেশ কযেকটি মাছ ধরে জলপাত্রে ছেড়ে দিতেন চুং লিং স্থ। সত্যিকারের জলজ্যান্ত মাছ, নকল মাছ নয়। উনিশ শতকের শেষদিকে কোনো কোনো যাদুকর (বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হ্যারি কেলার তাঁদের একজন বলে শুনেছি) এ খেলাটি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু চুং লিং স্থ-র হাত পড়ার আগে এ খেলা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। চুং লিং স্থ এ খেলা দেখাতে শুরু বরার পর অনেক যাদুকর তাঁর নকল শুরু করেন, কিন্তু কোনো নকলই আসলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। কি কৌশলে চুং লিং স্থ এই আশ্চর্য খেলাটি দেখান, অনেক মহলে অনেক গাঁজাখুরি জল্পনা-কল্পনাও হয়েছিল তাই নিযে।

চুং লিং স্থ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে। সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর খেলা স্বচক্ষে দেখবাব সৌভাগ্য আমার হযনি। স্বনামধন্য যাদুকর "রয় দি মিস্টিক" (ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়) আমার প্রশ্নের জবাবে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

"বিদেশী যাদুকরদের মধ্যে চুং লিং স্থ-র খেলাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। তাঁহার খেলাতে ম্যাজিক দেখিতেছি বলিযা মনে হয় নাই, মনে হইতেছিল যে স্বপ্ন দেখিতেছি, এমনই অপূর্ব তাঁহার খেলা। বহু 'ইলিউশন' (বড়ো খেলা) একটার পর একটা করিযা তিনি দেখাইতেন। ইলিউশনগুলির ফাঁকে ফাঁকে নানাপ্রকার ছোটো ও মাঝারি খেলা এমন নিপুণভাবে দেখাইতেন যে, দর্শকগণ বিস্মযে অভিভূত হইযা যাইত। তাঁহার হাতে "চাইনিজ লিংকিং রিঙ্স" (Chinese Linking Rings) এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ভাবায তাহা বোঝানো যায় না। তাঁহার 'ইলিউশন'-গুলির মধ্যে 'পীপলস অব অল নেশনস' (বিভিন্ন জাতির বা দেশের মানুষ) এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড' (ইংল্যাণ্ডের

ব্যাংক) আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগিয়া ছিল। চীনা সাজ-সজ্জায় তিনি খেলা দেখাইতেন, কোনও প্রকার কথা বলিতেন না, আভাসে ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেকটি খেলা দেখাইবার পর তাঁহার হাসিটি দর্শকের চিত্ত জয় করিয়া নিত। ঐরূপ মনোমুগ্ধকারী হাসি আর কোথাও দেখি নাই।"

উপরে উল্লিখিত 'পীপ্‌লস্ অব অল নেশনস্' (অথবা 'দি ওয়ালড অ্যাণ্ড ইটস্ পীপ্‌ল্') খেলাটি চুং লিং স্থ-র একটি অনবদ্য সৃষ্টি। স্টেজের মাঝামাঝি রাখা হতো পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা একটি 'গ্লোব' (গোলক)—সেটির ব্যাস বা খাড়াই চার ফুট। গ্লোবটি ধীরে ধীরে ঘোরাতেন চুং লিং স্থ, আর এক-একবার খানিক-ক্ষণের জন্য গ্লোবের গায়ে একটি দরজা খুলে ধরতেন। ভিন্ন ভিন্ন বারে হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, ব্রিটেন, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এক-একজন মানুষ (কখনো মেয়ে, কখনো বা পুরুষ), গ্লোবের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন যার যার দেশের বিশিষ্ট জাতীয় পোশাক পরে। প্রত্যেক দেশের মানুষ বেরিয়ে আসবার আগে সে দেশের জাতীয় পতাকাও গ্লোবের ভেতর থেকে বার করতেন চুং লিং স্থ। চীন দেশের মানচিত্রের কাছে গ্লোবটিকে থামিয়ে চুং লিং স্থ যখন গ্লোবটিকে একটু ফাঁক করে চীন দেশের জাতীয় পতাকা বার করে আনতেন, তার ঠিক পরেই গ্লোবের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন চীনা পোশাকে সজ্জিতা শ্রীমতী সুঈ সীন। খেলাটি যেমন চমৎকার জমকালো, নানা রঙের বাহারে নয়নাভিরাম, তেমনি দর্শকদের মন বিস্মিত হতো এই ভেবে যে ঐটুকু ছোটো গ্লোবের ভেতর ছোটোখাটো একজন মানুষেরই কোনো রকমে জায়গা হতে পারে, দশ-বারোজন লোক ওর ভেতর থেকে বেরলো কি করে?

এবার ফিরে আসা যাক ২৩শে মার্চ, ১৯১৮ তারিখের রাতে, উডগ্রীন এম্পায়ার রঙ্গালয়ে। জাপানী কামেতারোর খেলা দেখানো শেষ হয়ে গেছে। এবারে শুরু হবে আজকের রাতে চুং লিং স্থ-র শেষ খেলা।

আবার স্টেজের সামনে ওপরদিকে উঠে গেলো জমকালো রঙিন যবনিকা। স্টেজ ফাঁকা। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত উঁচু থেকে নিচুতে নেমে এলো, মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে। তারপর সমবেত পদক্ষেপের আওয়াজ। পেছনের আড়াল পার হয়ে এগিয়ে এসে স্টেজের দুধারে দাঁড়ালো চীনদেশী জমকালো সামরিক পোশাকে সজ্জিত দুই সারি চীনা সৈনিক। তারপর অনেকগুলো ভেরী বেজে উঠলো, দুই সারি সৈনিকের মধ্য দিয়ে সোনালি রঙের সুন্দর পালকিতে চড়ে

এসে পাদপ্রদীপের সামনে নেমে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দকে সস্মিত অভিবাদন জানালেন চীনা মান্দারিনের জমকালো আলখাল্লা পরা "বিস্ময়কর চীনা যাদুকর" চুং-লিং-সু।

দর্শকদের পরীক্ষিত দুটি বুলেট পোরা হলো দুটি বন্দুকে। মঞ্চের একধারে দাঁড়ালেন দুজন বন্দুকধারী ; চুং-লিং-সু দাঁড়ালেন তাঁদের উলটোদিকে, দুটি বন্দুকের উদ্যত নলের মুখোমুখি। শ্রীমতী সুঈ সীন তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি চীনে-মাটির প্লেট। প্লেটটা বুকের সামনে এগিয়ে ধরে তাই দিয়ে বন্দুকের বুলেট আটকাবার জন্য তৈরি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন চুং লিং সু। ইঙ্গিত পেলেই বন্দুকের ঘোড়া টিপবে দুজন বন্দুকধারী। আওয়াজ করে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটবে এক জোড়া বুলেট।

দর্শক মহলের ভেতর অনেকেই চুং লিং সু-র এ খেলা অনেকবার দেখেছেন ; সবাই জানেন চুং লিং সু-র হাতে ধরা চীনে মাটির প্লেটে বাধা পেয়ে বুলেট দুটো পড়ে যাবে স্টেজের ওপর, তুলে দেখা যাবে এ দুটো সত্যিই দর্শকদের চিহ্নিত বুলেট। তবু সারা হল নিস্তব্ধ, সবারই হৃদয়ে উদ্বেগ। যদি দৈবাৎ তাঁদের প্রিয় যাদুকরের কোনো বিপদ ঘটে যায়?

ইঙ্গিত করলেন চুং লিং সু, ঈষৎ মাথা হেলিয়ে। আগেকার প্রত্যেকবারের মতোই আওয়াজ করে ছুটলো বুলেট, কিন্তু আজ আর প্লেটে ধরা পড়লো না। হঠাৎ কেঁপে উঠে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন বিনা মেঘে বজ্রাহতের মতো, তারপর মঞ্চের পর লুটিয়ে পড়লেন চুং লিং সু। পর্দা ফেলে দেওয়া হলো। শেষ হয়ে গেলো রাতের প্রদর্শনী। শেষরাতে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অনন্য যাদুকর চুং লিং সু ; বন্দুকের গুলি চলে গিয়েছিল তাঁর ফুসফুস ভেদ করে।

রবিবার ভোরবেলা খবরের কাগজে-কাগজে প্রকাশিত হলো শোক-সংবাদ : চুং লিং সু আর ইহজগতে নেই। সেই সঙ্গে আরেকটি বিস্ময়কর খবর : চুং লিং সু আসলে চীনাও নন, চুং লিং সু-ও নন, তিনি চীনা ছদ্মবেশে একজন মার্কিন যাদুকর, তাঁর আসল নাম উইলিয়াম এল্‌স্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William Ellsworth Robinson)।

দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে চীনা যাদুকর চুং লিং সু-র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে তাঁর যাদুমুগ্ধ অগণিত দর্শকের চোখে অনায়াসে ধুলো দিয়ে এসেছেন

মার্কিন যাত্নকর উইলিয়াম রবিনসন। যাত্নজগতে এমন সফল, সার্থক অভিনেতা আর জন্মাননি।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অলাইভ রবিনসন চীনা নারীর ছদ্মবেশে "সুঈ সীন" ছদ্মনামে যাত্নকর স্বামীর যাত্ন-সহকারিণীর ভুমিকায় অভিনয় করতেন। কুমারী জীবনে তিনি ছিলেন অলিভ পাথ, বোস্টন শহরের একটি থিয়েটার কোম্পানির নৃত্য এবং সঙ্গীত-শিল্পী।

চুং লিং সু-র মৃত্যু-রহস্য নিযে অনেকদিন ধরে নানা মহলে জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। চুং লিং সু নিজে কিছু বলে যেতে পারেননি মরবার আগে: বলতে পারার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। এ মৃত্যুব তিনরকম ব্যাখ্যা হয়েছে:—

(১) চুং লিং সু-র মৃত্যুর কারণ আকস্মিক ছুর্ঘটনা।

(২) চুং লিং সুকে এভাবে হত্যা করা হয়েছিল ঈর্ষা, প্রতিহিংসা অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোনো কারণে।

(৩) চুং লিং সু আর্থিক মানসিক বা অন্য কোনো কারণে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যার এই বিচিত্র উপাযটি বেছে নিয়েছিলেন।

যাত্ন-জগতে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে ছুর্ঘটনাই চুং লিং সু-র মৃত্যুর কারণ। তবু আজও অনেকেরই মনে সংশয় থেকে গেছে—তাঁদের কাছে চুং লিং সু-র মৃত্যু আজও রহস্যময, যে রহস্যের সমাধান হবে না কোনোদিন।

আরেকবার ভারতে এসে বেশিদিন ধরে খেলা দেখাবার পরিকল্পনা করেছিলেন চুং লিং সু। সে আসা তাঁর আর হলো না।

এই মারাত্মক খেলাটি যাঁদের প্রাণ নিয়েছে, তাঁদের ভেতর সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে বিচিত্রজীবন এবং সবচেযে প্রতিভাবান অতুলনীয় যাত্নকর চুং লিং সু। চুং লিং সু মানে "ডবল সৌভাগ্য।" এই "ডবল সৌভাগ্য" নামধারী যাত্নকরকেই যাত্ন-রঙ্গমঞ্চে বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে হযেছিল। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!

চুং লিং সু-র মৃত্যুকাহিনী বললাম। এইবার বলি তাঁর জীবনকাহিনী, যা তাঁর মৃত্যুকাহিনীর চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়।

গোড়া থেকেই শুরু করি। উইলিয়াম এল্‌স্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William Elsworth Robinson) জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮৬১

খৃষ্টাব্দে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাত্বর খেলা দেখাতে শুরু করেন। তাঁর ভাণ্ডারে ছিল কিছু হস্ত-কৌশলের খেলা, কিছু ভুতুড়ে খেলা, কিছু চিন্তা-পাঠের খেলা (Mind Reading)। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি তরুণী নৃত্য ও সংগীত-শিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। তরুণীটির নাম অলিভ পাথ (Olive Path), খুব ছোটোখাটো বলে তাঁর ডাক নাম ছিল "ডট" (Dot)। ডট পাথ হয়ে গেলেন ডট রবিনসন। উইলিয়াম এবং ডট তুজনে মিলে মাথা খাটিযে, মেহনত করে এবং রিহার্সাল দিযে যে খেলার প্রোগ্রাম তৈরি করলেন তা তখনকার রঙ্গজগতে অভিনব। দর্শকদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার যে পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁদের এই প্রোগ্রাম তৈরি হযেছিল, তাই "ব্ল্যাক আর্ট" নামে পরিচিত।

উইলিয়াম রবিনসন নিজেকে এই পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে দাবি করতেন। কিন্তু "ব্ল্যাক আর্ট" পদ্ধতির মূল আবিষ্কারক প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার (Max Auzinger) নামে একজন জার্মান। তিনি একটি রঙ্গালয়ে অভিনয় করতেন এবং স্টেজ ম্যানেজার অর্থাৎ মঞ্চাধ্যক্ষের কাজও করতেন। কিভাবে এই চমৎকার পদ্ধতিটি তাঁর মাথায হঠাৎ এসেছিল, সে এক মজার কাহিনী। আউ-জিঙ্গারের পরিচালনায় একটি নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছিল। তার একটি দৃশ্যে দেখা গেল নিষ্ঠুর পিতা তাঁর অবাধ্য কন্যাকে শায়েস্তা করবার জন্য রেখেছেন আঁধার কারাকক্ষে বন্দিনী করে। বেচারা যেদিকে তাকায সেইদিকেই কালো দেওয়াল। কারাগারের বীভৎসতা খুব ভালো করে ফুটিযে তুলবার জন্যে মঞ্চাধ্যক্ষ আউজিঙ্গার মঞ্চের তিনদিকই কালো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। মেয়েটির পাষাণ-হৃদয় পিতৃদেবের একটি কোমল-হৃদয় নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল ; তার সারা দেহ আবলুশ কাঠের মতো কালো হলেও মনটি ছিল শাদা। তার প্রাণ কেঁদে উঠলো বন্দিনী লুসির বেদনায়। কারাকক্ষের ছাতেব কাছাকাছি জানলা, বন্দিনী লুসির নাগালের অনেক উঁচুতে। সেই জানলা-পথে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়ির মই বেয়ে কারাকক্ষের ভেতর নেমে এলো সেই কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস, লুসিকে বন্দিনী দশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে। ক্রীতদাসটির এই আকস্মিক নাটকীয় আবির্ভাবে দর্শকমহলে সাড়া জাগবার কথা, কিন্তু ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার দেখলেন কি আশ্চর্য, সাড়ার নাম-গন্ধও নেই। ব্যাপার কি? তখন মঞ্চের নেপথ্য থেকে মঞ্চের দিকে তাকাতেই এক মুহূর্তে ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার

হয়ে গেল। তিনি দেখলেন কালো পোশাক পরা কালো নিগ্রোটির দেহের আর পোশাকের কালো রং স্বল্পালোকিত মঞ্চের তিন পাশের কালো মখমলের পর্দার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে সে চলাফেরা করা সত্ত্বেও তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না, শুধু সে যখন মুখ খুলছে তখন তার শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে; অর্থাৎ পেছনের আর দু'পাশের কালোর সঙ্গে কালো মিশে গিয়ে দেখা যাচ্ছে না, দাঁত দেখা যাচ্ছে শাদা বলে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্স্ আউজিঙ্গাবের মাথায় খেলে গেলো "ব্ল্যার্ক আর্ট"-এর মূল তত্ত্ব। এরই ওপর ভিত্তি করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা প্রথম দেখালেন বার্লিন শহরের একটি রঙ্গালয়ে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে।

উইলিয়াম রবিনসন তাঁর "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন "আক্মেদ বেন আলি" (Achmed Ben Ali) ছদ্মনামে, প্রাচ্য-গন্ধী নাম দর্শক মহলকে আরো বেশ আকর্ষণ করবে বিবেচনা করে। বোধ করি অনুরূপ কারণেই ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার তাঁর "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা দেখাতেন "বেন আলি বে" (Ben Ali Bey) ছদ্মনামে। "আক্মেদ বেন আলি" ছদ্মনামা রবিনসনের এই নতুন ধরনের খেলার খ্যাতি যাদুজগতে এমন ছড়িয়ে পড়লো, যে তখনকার দুজন সেরা মার্কিন যাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান (Alexander Herrmann) এবং হ্যারি কেলার (Harry Kellar)—পরলোকে গিয়েও যাঁরা যাদুজগতে আজও খ্যাতিমান রয়েছেন—তাঁকে নিজের দলে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত রবিনসন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যোগ দিলেন হ্যারি কেলারের দলে।

কেলার ছিলেন যেমন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাদু-প্রদর্শক, তেমনি ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তিনি যে রবিনসনকে নিজের দলে টানলেন, তার কারণ শুধু রবিনসনের "ব্ল্যাক আর্ট" নয়। কেলার জানতেন রবিনসনের যাদু-উদ্ভাবনী বুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তাঁর হাতের কারিগরি দক্ষতা অসাধারণ। রবিনসন যে কেলারের দলে ঢুকলেন তা শুধু তাঁর "ব্ল্যাক আর্ট" নিয়ে নয়; কেলারের প্রোগ্রামে রবিনসনের তৈরি অন্যান্য কয়েকটি বিস্ময়কর খেলাও যুক্ত হলো। "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলায় রবিনসন আগে ছিলেন "আক্মেদ বেন আলি", কেলারের দল ছেড়ে যখন আলেকজাণ্ডার হারম্যানের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন হয়েছিলেন "আবদুল খাঁ।"

সে সময়ে পরলোক আর প্রেততত্ত্ব নিয়ে মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর

আলোচনা আর গবেষণা চলেছিল। লোকান্তরিত প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের স্বাভাবিক কামনায় অনেকে মিডিয়ামের সাহায্য গ্রহণ করতেন। এই সুযোগে অনেক চতুর পুরুষ এবং চতুরা নারী মিডিয়ামগিরির ভান করে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করতেন, অর্থাৎ প্রিয়জনবিয়োগে যাঁরা ব্যথিত তাঁদের পকেট মারতেন লোকান্তরিত আত্মা নামিয়ে আনার ভাঁওতা দিয়ে। বিভিন্ন কৌশলে এই ভুয়ো মিডিয়ামের দল এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার করে দেখাতেন, যা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ভাবতেন ভৌতিক সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এ ধরনের ব্যাপার ঘটানো অসম্ভব, সুতরাং এই মিডিয়ামরা সত্যি সত্যি আত্মা আনতে পারেন এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তরুণ যাদুকর উইলিয়াম রবিনসন এই মিডিয়ামি ভাঁওতা সম্বন্ধে প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে-ছিলেন, পরে এ দের ব্যবহৃত গুপ্তকৌশলগুলি ব্যাখ্যা করে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন বলে। (ভুতুড়ে স্লেটের লেখা এবং অন্যান্য ভৌতিক খেলা সম্বন্ধে রবিনসন রচিত গ্রন্থখানা এই জাতীয় গ্রন্থের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।)

ভুয়ো মিডিয়ামদের ব্যবহৃত নানা কৌশল রবিনসন তাঁর যাদুর খেলায় কাজে লাগাতেন। ভুতুড়ে খেলায় অমন অভিজ্ঞ রবিনসনকে দলে পেয়ে হ্যারি কেলার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি যেখানেই তাঁর যাদু-প্রদর্শন করতেন সেখানেই তাঁর প্রোগ্রামের একটি অংশে শুধু ভুতুড়ে খেলা দেখিয়ে প্রমাণ করতেন ভৌতিক মিডিয়ামরা খাঁটি ভৌতিক ব্যাপার বলে যা দেখান তা প্রকৃতপক্ষে ফাঁকির খেলা বা ভেল্‌কি মাত্র, ভুত বা আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মিডিয়াম-জব্দ-করা নকল-ভুতুড়ে যাদুক্রীড়ার উদ্ভাবনে এবং প্রদর্শনে রবিনসন হলেন তাঁর অমূল্য দক্ষিণ হস্ত।

১৮৯৩ সালে কেলারের দল ছেড়ে রবিনসন দম্পতি যোগ দিলেন মার্কিন যাদু জগতের আরেকজন দিক্‌পাল, আলেকজাণ্ডার হারম্যানের (Herrmann the Great) দলে। হারম্যানের সাহচর্যেই রবিনসনের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটল। হারম্যানের অভিনয় প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ; তিনি সযত্নে শিক্ষা দিয়ে রবিনসনকে আদর্শ সহকারীরূপে গড়ে তুললেন। হারম্যানের শিক্ষায় রূপসজ্জায় এবং অভিনয়ে রবিনসন এমন দক্ষ হয়ে উঠলেন যে মাঝে মাঝে তিনি যখন হারম্যানের ছদ্মবেশে মঞ্চে যাদু-প্রদর্শন করতেন, তখন দর্শকরা তাঁকে ভুল

করতেন আসল হাবম্যান বলে। কিন্তু রবিনসন-হারম্যান সহযোগিতা বেশিদিন টিক্‌লো না। হারম্যান মাবা গেলেন ১৮৯৬ সালে। তাঁর যাদু-প্রদর্শনীব উত্তরাধিকারী হলেন তাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র লিওন হারম্যান এবং পত্নী শ্রীমতী অ্যাডিলেইড হারম্যান (Adelaide Herrmann)। এঁদেব দলে কিছুদিন থেকে তাবপব সস্ত্রীক বেবিযে এলেন ববিনসন, স্বাধীনভাবে যাদু-প্রদর্শন কবতে লাগলেন "রহস্যময় রবিনসন" নামে।

কিছুদিন বেশ অসুবিধাই ভোগ কবতে হলো তাঁকে, কাবণ যাদুকব মহলে তাঁকে অসামান্য প্রতিভা বলে জানলেও দর্শকমহলে ববিনসন নামটির তেমন প্রচার ছিল না। তাছাড়া মার্কিন দেশে তখন দেশী যাদুকব ছাড়াও বিদেশী যাদুকব প্রচুব আসছেন যাদু দেখাতে।

এই বিদেশী যাদুকরদেব ভেতব একজন ১৮৯৯ সালেব মে মাসে মার্কিন মুলুকে পা দিযেই প্রমোদ-জগতে অভূতপূব সাড়া জাগালেন। ভদ্রলোক একজন খাঁটি চীনা যাদুকব, নাম চী লিং কোয়া। চী লিং কোযা-ব মার্কিন ব্যবস্থাপকবৃন্দ ভেবে দেখলেন প্রমোদ-জগতে বিশেষ কবে যাদু-জগতে, নামেব যাদুব প্রযোজন অত্যন্ত বেশি। "চী লিং কোয়া" নামটা তেমন শ্রুতিমধুর বা আকর্ষণীয নয। সুতবাং চী লিং কোয়া নাম বদলে হলেন "চিং লিং ফু" (Ching Ling Foo)।

নিউ ইযর্ক শহবেব একটি বিশিষ্ট রঙ্গালযে যাদু-প্রদর্শন শুরু করলেন খাঁটি চীনা যাদুকব চিং লিং ফু ও সম্প্রদায। মার্কিন জনসাধারণের কাছে এই প্রাচ্য যাদু-প্রদর্শনী হলো এক অসাধাবণ নতুন জিনিস। এই অসাধারণ নূতনত্বই হলো চিং লিং ফু'ব যাদু-প্রদর্শনীব সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ।

চীনা আলখাল্লা প'বে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন চিং লিং ফু। তাঁর প্রধান খেলা ছিল শূন্য থেকে জলভবা একটি বড়ো পাত্র যাদুমন্ত্রে বাব কবা। (আসলে অবশ্য সেটা বেরোতো তাঁর বিরাট আলখাল্লার ভেতর থেকে)। তাঁব আরেকটি আশ্চর্য খেলায় তিনি একটি বেশমী শাল ঘুবিযে ফিরিয়ে খালি দেখিযে সেই শালের তলা থেকে একটি মানবশিশু বার কবতেন। এই শিশুটিও আসতো তাঁর আলখাল্লারই ভেতর থেকে। অবশ্য চিং লিং ফু এমন দক্ষতার সঙ্গে এদের বার করতেন যে দর্শক সাধারণ বিস্ময়ে মুগ্ধ হতো। প্রাচ্য জাঁকজমকপূর্ণ এমন যাদু-প্রদর্শনী মার্কিন মুলুকে আর কখনো দেখা যায়নি। একে অভিনব, তাঁর ওপর

চিং লিং ফু ছিলেন সত্যিকারের দক্ষ যাদুশিল্পী। তাই চার মাসের ওপর একই রঙ্গালয়ে চললো চিং লিং ফুর প্রাচ্য যাদু প্রদর্শনী, তবু দর্শকের ভিড় কমবার কোনো লক্ষণ নেই।

এই অসামান্য সাফল্যেই কি চিং লিং ফুর মাথা ঘুরে গেল? তিনি একটি পাগলামি করে বসলেন। চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে দিলেন তাঁর এই শূন্য থেকে জলভরা পাত্র বার করার খেলা যে কেউ নকল করে দেখাতে পারবে তাকেই তিনি এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। প্রচার প্রোপাগাণ্ডা বা পাবলিসিটি স্টাণ্ট হিসেবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জের দাম আছে; কিন্তু চিং লিং ফুর বেলায় এর কিছুমাত্র দরকার ছিলো না, কারণ রাতের পর রাত এমনিতেই দর্শকের ভিড় হচ্ছিল প্রচণ্ড, তাছাড়া এই রঙ্গালয়ের পর আমেরিকার নানা স্থানে তাঁর যাদু-প্রদর্শনের জন্য বেশ লম্বা মেয়াদী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, বিধাতার বিধানেই বিচিত্র খেয়াল জাগলো সাফল্যগর্বী চীনা যাদুকর চিং লিং ফুর মনে। তাঁর এই এক হাজার ডলারের চ্যালেঞ্জ বেশ বড়ো হরফের শিরোনামা দিয়ে ছাপা হলো কাগজে কাগজে।

চট করে খ্যাতি আর মর্যাদা বাড়াবার আর সেই সঙ্গে এক হাজার ডলার রোজগারের এমন চমৎকার সুযোগ ছেড়ে দিলেন না উইলিয়াম রবিনসন। তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। (শোনা যায় রবিনসন নাকি চিং লিং ফু যে রঙ্গালয়ে যাদুপ্রদর্শন করছিলেন সেখানে এক সন্ধ্যায় একটা বড়ো বাক্সে চীনা আলখাল্লা এবং বড়ো জলের পাত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন খেলা দেখাবেন বলে)। পিছিয়ে গেলেন চিং লিং ফু। কাগজে তাঁর চ্যালেঞ্জের ঘোষণা ছাপা বন্ধ করে দিলেন। ঘোষিত পুরস্কার পাবার সুযোগ পেলেন না যাদুকর রবিনসন। চিং লিং ফুর এই অন্যায়, অশোভন, অভদ্র, কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে তখন মামলা-মোকদ্দমা বা অপর কোনোরকম গোলমাল করলেন না। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

এর পরের বছরের একটি সন্ধ্যা। পারী শহরের একটি বিশ্ব-বিখ্যাত রঙ্গালয়ে (Folies Bergere) চিং লিং ফুর অনুকরণে যাদু-প্রদর্শন করবেন যাদুকর হপ সিং লু (Hop Sing Loo) ও সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে খাঁটি চীনদেশের মানুষ শুধু সার্কাসী কসরতের শিল্পী (acrobat) ফী লুঙ (Fee

Lung)। হপ সিং লু দম্পতি আসলে শ্রীমান উইলিয়াম ও শ্রীমতী ডট রবিনসন। প্রায় বিশ বছর ধরে পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য পোশাক পরে যাদুর খেলা দেখিয়ে আসছেন রবিনসন, এখন একেবারে ভোল পাল্টে চীনা পোশাকে চীনা ভঙ্গিতে চীনা যাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করে যাদু দেখাতে হবে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। একে বলা যায় 'রেভোলিউশনারি চেঞ্জ', বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। ফা লুঙের কাছে রবিনসন দম্পতি বেশ কয়েকদিন ধরে তালিম নিয়েছেন চীনা পোশাক পরার, চীনা কায়দায় চলাফেরা অঙ্গভঙ্গি হাবভাবের, যেন নকল বলে ধরা না পড়তে হয়।

মঞ্চে তখন দুই কুস্তিগীরের লড়াই চলছে। তাঁদের মধ্যে একজন রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর হ্যাকেনস্মিট: তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি শক্তিমান, তেমনি সাহসী, তেমনি অসামান্য জনপ্রিয়। প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কুস্তি দেখছে।

হ্যাকেনস্মিট এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর কুস্তি-লড়াইর পরই আসবে হপ সিং লুর পালা। চীনা ছদ্মবেশ পরে রবিনসন হয়ে গেলেন হপ সিং লু। একেবারে আলাদা মানুষ। চীনা ধরনের হাসি, চীনা কায়দায় হাঁটা, চীনা ধরনের চোখের চাউনি—দেখে শ্রীমতী ডট রবিনসন (তিনিও চীনা রমণীর ছদ্মবেশে) বললেন 'চমৎকার! বোঝাই যাচ্ছে না তুমি চীনাম্যান নও। মনে হচ্ছে আজ রাতে বাজিমাত করবে তুমি।"

শুনে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। হ্যাকেনস্মিটের কুস্তি শেষ হলো, মঞ্চে প্রবেশ করলেন যাদুকর হপ সিং লু। খাঁটি চীনাম্যান যেন। ছোটোখাটো খেলা-গুলো মোটামুটি চালিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো চিং লিং ফুর সেই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় খেলাটি দেখাতে গিয়ে—শূন্য থেকে একটি বড়ো জলপূর্ণ পাত্র বার করা। জলভরা পাত্রটি গোপনে ঝুলছিল হপ সিং লুর আলখাল্লার ভেতর, চিং লিং ফুর কায়দামতো। কিন্তু একটু আগেই জলপাত্রের ঢাকনাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ হ্যাকেনস্মিটের কুস্তি যখন চরমে উঠেছে তখন দর্শকমহলে উত্তেজনার হৈ-হল্লা শুনে লোভ সামলাতে না পেরে একজন মঞ্চকর্মী পিছন থেকে কুস্তি দেখবার জন্য ঐ সযত্নে রক্ষিত জলপাত্রটির ওপরই উঠে দাঁড়িয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নেবার মতো মেরামত করে নেওয়া হয়েছিল, তবু ঐ সামান্য ক্ষতিটুকুই অসামান্য ফ্যাসাদ বাধালো।

হপ সিং লু একটি চাদর উলটে-পালটে খালি দেখিয়ে একটি হাতের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন, উদ্দেশ্য—তারই আড়ালে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে আলখাল্লার তলা থেকে জলভরা পাত্রটি বার করে এনে ঢাকনাটা খুলে ফেলবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই চাদরটা সরিয়ে দেখিয়ে দেবেন যাদুমন্ত্রে শূন্য থেকে জলে ভরা একটি পাত্র আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু তার আগেই দুর্ভাগ্যবশত ঢাকনাটা আলগা হয়ে গিয়ে সবটুকু জল পড়ে গিয়ে স্টেজ ভেসে গেল, ভিজে গেল হপ সিং লুর আলখাল্লা আর আলখাল্লা তলায় লুকানো হাঁসগুলিও ঘাবড়ে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিচিত্র ডাক ছাড়তে শুরু করলো। এক কথায় সে এক চলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

পর্দা টেনে দেওয়া হলো তাড়াতাড়ি। ওদিকে সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে প্রচণ্ড হাসি আর টিটকারির হল্লা চলেছে। এমন পেটে খিল ধরানো হাসির ব্যাপার এ রঙ্গালয়ে আর কখনো দেখা যায়নি। রাগে, দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় দাঁত কড়মড় করতে-করতে এলেন রঙ্গালয়ের ম্যানেজার। পরপর কয়েক রাত্রি যাদুর খেলা দেখাবেন হপ সিং লু, এই রকম কথা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষিপ্ত ম্যানেজার মশাই বললেন "খুব হয়েছে। আর নয়। অদ্যই তোমার শেষ রজনী। তুমি এবার মানে-মানে বিদেয় হও।'

বিদেশে এসে প্রথম অভিনয়েই এই ধাক্কা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন উইলিয়াম আর ডট রবিনসন। গভীর হতাশায় ভরে উঠল তাঁদের দুজনের মন।

কিন্তু বিধাতা যখন অসামান্য সদয় হন, তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বাতিল হবার নোটিশ পাবার পর মুহূর্তেই এসে হাজির লণ্ডন শহরের রঙ্গজগতের একজন দালাল, বুকিং এজেণ্ট। তিনি বললেন "আপনার স্টাইল আমার ভালো লেগেছে, মিস্টার লু। একটু ঘষামাজা করে নিলেই লণ্ডনে আপনার খেলা চমৎকার চলবে। আমি তার ব্যবস্থা করবো।

"কি আশ্চর্য। এই ব্যাপারের পরেও আপনি বলছেন—?'

ভদ্রলোক বললেন "আরে রাম রাম। এতো হলো আকস্মিক দুর্ঘটনার ব্যাপার। এতে আপনার দোষ কোথায়? যাকগে, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি তো?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন রবিনসন ওরফে হপ সিং লু।

"কিন্তু" এজেণ্ট ভদ্রলোক বললেন, "হপ সিং লু নামটা রঙ্গজগতের পক্ষে তেমন জুৎসই নয়। তাছাড়া নামটা খাঁটি চীনে নামও নয়। তার চাইতে বরং

…দাঁড়ান, ভেবে দেখি…হ্যাঁ, একটা নাম আমার মাথায় এসে গেছে—চুং লিং সু। খাঁটি চীনা নামও বটে, রঙ্গজগতের পক্ষে বেশ জমাট গালভরা নামও বটে। তাছাড়া, এ নামের মানেটাও ভালো—ডবল সৌভাগ্য। রাজি?"

রাজি হলেন রবিনসন। অর্থাৎ হপ সিং লু রাজি হলেন আগামী হপ্তা থেকে চুং লিং সু হতে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে শুরু হলো "চুং লিং সু"-র যাদু-জীবন। ১৯০০ সালের মাঝামাঝি লণ্ডনের "আলহামবা (Alhambra) রঙ্গালয়ে শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অসামান্য সাফল্য লাভ করলো চুং লিং সুব যাদু-প্রদর্শনী। 'আলহামরা'-ই ছিল তখন লণ্ডন শহরের সেরা রঙ্গালয়। এখানে তিনমাসব্যাপী সাফল্যের ফলে যাদুকর চুং লিং সু রঙ্গ-জগতের এজেণ্টদের পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। প্রাচীরপত্রে এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনে চুং লিং সু নিজেকে পরিচয় দিতেন বিস্ময়কর চীনা যাদুকর (Marvellous Chinese Conjurer) বলে। যেমন নিজেকে, তেমনি তাঁর প্রত্যেকটি খেলাকে এমনভাবে চীনা পোশাক পরাতেন তিনি, যে দর্শক সাধারণ তাঁর যাদু-প্রদর্শনীকে খাঁটি চৈনিক যাদু-প্রদর্শনী বলেই গ্রহণ করে নিয়েছিল।

১৯০৫ সালের একেবারে গোড়াতেই শুরু হলো পরম কৌতুকময় পরিস্থিতি। নকল চীনা যাদুকর চুং লিং সুর বিরাট যাদু-প্রদর্শনী চলেছে লণ্ডনের হিপোড্রোম (Hippodrome) রঙ্গালয়ে। তারই অনতিদূরে এম্পায়ার রঙ্গালয়ে তাঁর প্রদর্শনী নিয়ে এলেন আসল চীনা যাদুকর চিং লিং ফু ও সম্প্রদায়। আসল আর নকলে বাধলো লড়াই। চিং লিং ফুর প্রদর্শিত অধিকাংশ খেলাই লণ্ডনের দর্শকরা গত পাঁচ বছর ধরে দেখে আসছেন চুং লিং সুর প্রদর্শনীতে। ফুর প্রদর্শনীতে নতুন বা মৌলিক কিছুই ছিল না। সুতরাং চীনা যাদুবিদ্যার প্রতিনিধিরূপে দর্শক সাধারণ, গ্রহণ করলেন সুকেই, ফুকে নয়। তাঁরা যে ফুর প্রদর্শনী দেখতে যেতেন তা শুধু 'দেখে আসা যাক এই নতুন লোকটি কি কি দেখাতে পারে' এই ভাবটুকু নিয়ে।

· চিং লিং ফু চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলেন "চুং লিং সু যদি আমার প্রোগ্রামের প্রধান খেলাগুলোর দশটি খেলাও দেখাতে পারে তাহলে আমি তাকে এক হাজার পাউণ্ড দেবো।" কাগজে-কাগজে এ নিয়ে বেশ লেখালিখি চললো। এই চ্যালেঞ্জে রবিবাসরীয় সংবাদপত্র "উইকলি ডিসপ্যাচ" (Weekly Dispatch)

ও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ঠিক হলো এই পত্রিকার অফিসেই নির্দিষ্ট তারিখে এই চ্যালেঞ্জের নিষ্পত্তির জন্য দুই যাদুকরের যাদুরি লড়াই হবে।

মার্কিন মুলুকে যাকে একহাজার ডলারের বাজিতে চ্যালেঞ্জ করে বেকায়দায় পড়েছিলেন, চুং লিং স্থ যে সেই লোক, প্রথমে তা বুঝতে পারেননি চিং লিং ফু। যখন জানতে পারলেন তখন খবরের কাগজের মাধ্যমে তিনি জানালেন "চুং লিং স্থ আসল চীনা যাদুকর নয়, রবিনসন নামক একজন মার্কিন প্রতারক মাত্র।"

নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে বিরাট গাড়িতে চড়ে "উইকলি ডিস্প্যাচ" কাগজের অফিসে এলেন যাদুকর চুং লিং স্থ (উইলিয়াম রবিনসন) এবং তাঁর সহকারিণী-সহধর্মিণী স্থঈ সীন (শ্রীমতী ডট রবিনসন)। তাঁদের মাথার উপর তখন মস্ত জমকালো চীনদেশী ছাতা ধরে আছেন স্থর মঞ্চ-পরিচালক (স্টেজ-ম্যানেজার) গম্ভীর-বদন ফ্রাঙ্ক কামেতারো।

চুং লিং স্থ এলেন, কিন্তু এলেন না চিং লিং ফু। অথচ যাদুর লড়াই দেখবার জন্য এসে ভিড় করেছেন সাংবাদিকদল, আর রঙ্গজগতের অনেকে। তাঁদের নিরাশ করলেন না চুং লিং স্থ, কয়েকটি চমৎকার খেলা দেখিয়ে তাঁদের চিত্ত জয় করলেন।

নিজেই চ্যালেঞ্জ করে নিজেই এলেন না কেন, এই প্রশ্নের জবাবে খবরের কাগজে চিং লিং ফু একটি বিবৃতিতে জানালেন চুং লিং স্থ যদি প্রমাণ করতে পারেন তিনি খাঁটি চীনদেশী, তাহলেই তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবেন, নতুবা নয়। চ্যালেঞ্জের এক হাজার পাউণ্ড এলো না চুং লিং স্থর পকেটে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রচারের দিক দিয়ে চুং লিং স্থর যে লাভ হলো, তার দাম এক হাজার পাউণ্ডের কম নয়।

এখানে একটি কথা বলা হয়তো অবান্তর হবে না। ১৯২৩ সালে হ্যারি হুডিনি এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় পত্রিকা ("উইকলি ডিস্প্যাচ") অফিসে তিনি যাবেন এমন কথা চিং লিং ফু কখনো বলেননি, এবং তিনি যাবেন এমন আশাও কেউ করেননি। কি ব্যাপার চলেছে চিং লিং ফু কিছুই জানতেন না বুঝতেন না, (কারণ ইংরাজি তিনি জানতেন প্রায় না-জানারই মতো) ; চিং লিং ফুর এই অসুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিলেন চুং লিং স্থ।

হুডিনির সব কথাই যে চোখ বুজে মেনে নেওয়া চলে তা নয়, এবং চুং লিং

সুব অসামান্য খ্যাতি, মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা হুডিনির মনে কিছুটা ঈর্ষাগত বিদ্বেষেরও সৃষ্টি করেছিল, এও হয়তো অন্তত খানিকটা সত্যি। তবু হুডিনির মন্তব্য একেবারে বাতিলও ক'রে দিতে পারি না। এবং বারবার দুবার চিং লিং ফু যে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে নিজের মান খুইয়ে চুং লিং সুব মর্যাদা আর খ্যাতি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জও চিং লিং ফু সজ্ঞানে, স্থিরবুদ্ধিতে, বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং বিনা প্ররোচনায় করেছিলেন কিনা, সে প্রশ্নও মনে জাগতে পারে। সে যাই হোক, নকল চীনা যাদুকর আসল চীনা যাদুকরের চাইতে বিশ্বব্যাপী অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করলেও চিং লিং ফুও অসামান্য যাদুশিল্পী রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৯১৮ সালে চুং লিং সুব শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী বলেছি। চিং লিং ফুর মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালে চীনদেশের সাংহাই শহরে। রবিনসন চুং লিং সু রূপে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে গেছেন, আসল চীনা তার কাছাকাছিও যেতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মার্কিন রঙ্গজগতে চীনা যাদুকর চিং লিং ফুর আবির্ভাব মার্কিন যাদুকর উইলিয়াম রবিনসনের জীবনে এসেছিল বিধাতার আশীর্বাদের মতো। নকল চীনা চুং লিং সুর সঙ্গে তাই আসল চীনা চিং লিং ফুও পৃথিবীর যাদু-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

ডেভিড ডেভাণ্ট

ইংল্যাণ্ডেব বিখ্যাত যাত্নকর ডেভিড ডেভাণ্ট একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি জনবিরল পথ দিয়ে একা বাড়ি ফিবছিলেন। এমন সময় একটি জোষান চেহারার লোক তাঁকে পাকড়াও কবে বললে 'এই যে মশাই। অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেষেছি আপনাকে। আপনিই না টাকা বানান?'

ডেভাণ্ট একটু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা বলে কি? একটু সামলে নিযে বললেন, 'মাপ কববেন, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

লোকটি বললে, 'মোটেই ভুল করিনি। আমাব এই টুপিটি শিলিং দিয়ে ভরে দিয়ে যাবেন, তাব আগে আপনাকে ছাড়ছি নে।' বলে মাথা থেকে টুপিটি নামিয়ে চিৎ করে ধবলে ডেভাণ্টের সামনে।

ডেভাণ্ট বুঝলেন পালাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না, দৌড়ে বা কুস্তিতে এ লোকটার সঙ্গে পারবেন না তিনি। কাল সন্ধ্যা, পথ নির্জন, চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেবার লোক নেই কাছাকাছি। সুতরাং লোকটিকে চটানো চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় সামলাতে হবে। ডেভাণ্ট বললেন 'আমি দাঁড়িযে আছি। আমাব পকেটখানা তল্লাসি কবে যা পাও সব নিয়ে নাও।'

'কত আছে তোমার পকেটে?' প্রশ্ন কবলে লোকটি।

ডেভাণ্ট বললেন, 'ছয় শিলিং।'

লোকটি বললে 'ছোঃ! ওতো আমার টুপির তলায এক কোণে পড়ে থাকবে। টুপিটা ভবে দিতে হবে বলেছি না? আপনি হাওযা থেকে ঝপাঝপ টাকা ধরেন, নিজের চোখে দেখেছি। আমার কাছে চালাকি?'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেভাণ্টের কাছে। একটি যাত্নব খেলা আছে যার নাম 'কৃপণের স্বপ্ন' (Miser's Dream) অথবা 'হাওযাই টাকশাল' (Aerial Mint) এ খেলায বাববার হাত খালি দেখিযে যাত্নকর হাওয়া থেকে টাকা ধরে-ধরে পাত্র ভরে ফেলেন। টাকাগুলো অবশ্য হাওয়া থেকে আসে না, খেলাটি নির্ভর কবে প্রধানত পামিং (Palming) বা হাতের তালুতে এক বা একাধিক টাকা লুকিয়ে রাখা এবং গুপ্তস্থান থেকে গোপনে

টাকা নেওয়ার কৌশলের ওপর। ডেভাণ্ট বুঝলেন এই লোকটি কোনোদিন তাঁর এই খেলাটি দেখেছে আর ভেবে নিযেছে সত্যিই হাওয়া থেকে টাকা ধরবার অলৌকিক যাদু তাঁর করায়ত্ত। ডেভাণ্ট লোকটিকে বোঝাতে গেলেন; লোকটি খেপে উঠে বললে 'ভারি বেয়াড়া, বেআক্কেল, বেদরদী লোক তো আপনি মশাই। চোখের সামনে দেখছেন অর্থাভাবে শুকিয়ে মরছি, আর আপনি হাত বাড়ালেই আঙুলের ডগায় টাকা এসে পড়ে তবু হাতটুকু বাড়াবার মেহনত করতে চান না। ভালো চান তো চটপট শুরু করুন। আর দেরি নয।'

ডেভাণ্ট বুঝলেন, লোকটি গুণ্ডা, গোঁযার অথবা পাগল; এতক্ষণ শুধু মুখ চালাচ্ছিল, এইবার হাত চালাবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে তিনি কাজে লেগে গেলেন; কিছুক্ষণ যাদুকরসুলভ ভঙ্গিতে হাওযায় হাত চালিয়ে হাওয়া থেকে একটি শিলিং ধরে লোকটির টুপির ভেতর ফেলে দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে বললে 'বাঃ এই তো চমৎকার পেরেছেন। এতক্ষণ তাহলে ন্যাকামি করছিলেন কেন? নিন, জলদি হাত চালান। টুপিটা পুরো ভর্তি করে দিতে হবে যে।'

ডেভাণ্ট ছোটো বড়ো অনেক আসরে যাদুর খেলা দেখিযেছেন, কোনোদিন কল্পনাও করেননি বিজন পথে দাঁড়িযে একটি মাত্র দর্শকের সামনে এ হেন অসহায়ভাবে তাঁকে যাদু-প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গে মাত্র ছযটি শিলিং, হাওয়া থেকে ছয শিলিং-এর বেশি ধবা তাঁর যাদুবিদ্যায় কুলোবে না। বিপদ শুরু হবে তারপরই, কারণ মাত্র ছয শিলিং দিযে লোকটির টুপি ভরবে না, মনও ভরবে না। শেষটায কি ঐ গোঁযারের হাতে মার খেয়ে মরতে হবে? হাওয়া থেকে টাকা ধরার কাজটিকে তিনি নানা কাযদায যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে লাগলেন, যেন লোকজন এসে পড়ার আগেই সবগুলো শিলিং ফুরিয়ে না যায়।

ডেভাণ্টের ভাগ্য ভালো, তিনি হাওয়া থেকে লোকটিকে চার শিলিং ধরে দিয়ে আবো বিলম্বিত লয়ে পঞ্চম শিলিং ধরবার তোড়জোড় করছেন, বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে উদ্বেগে, এমন সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই চার-পাঁচ-জন লোক এসে হাজির। তারা এই লোকটির খোঁজেই বেরিয়েছিল—লোকটির মাথা খারাপ। ডেভাণ্টের বেকায়দায় দুঃখ প্রকাশ করে তারা তাদের হারানিধিকে নিয়ে চলে গেল। ডেভাণ্ট হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বিখ্যাত যাদুকর ডেভাণ্টের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গিয়ে

একজন অখ্যাত যাত্নকবের বিচিত্র কাহিনী মনে পড়ে গেল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি। চাঁদ মিযা নামে একজন যাত্নকর স্কুলের বড় হলে আমাদের যাত্নর খেলা দেখালেন। বেশি খেলার পুঁজি ছিল না ভদ্রলোকের, ঘণ্টাখানেক খেলা দেখিযেছিলেন তিনি। এখনকার চোখে তাঁর খেলা কেমন লাগত জানি না, তখন মন্দ লাগেনি। হাওয়া থেকে একটি-একটি কবে টাকা ধরে তাঁকে একটি টিনেব কৌটো ভরে ফেলতে দেখে আমবা সবাই বেশ বিস্মিত হযেছিলাম; ভাবছিলাম এভাবে হাওযা থেকে খুশিমতো টাকা ধববাব বিদ্যেটা জানা থাকলে কি ভালোই না হতো! তাহলে আর টাকাব জন্যে কোনো ভাবনা থাকত না।

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কযেকজনেব মনে একটু খটকাও লেগেছিল। যাত্নকবেব দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য আমবা ছাত্রেবা এক আনা কবে টিকেট কিনেছিলাম এবং প্রধান শিক্ষক মশাই কিছু চাঁদা দিযেছিলেন। তাতে মোট দশ টাকাব বেশী হয়নি, কিন্তু তাই পেযেই যাত্নকর চাঁদ মিয়া এতো খুশি হযেছিলেন যে, বোধহয পাঁচ টাকা পেলেও তিনি অখুশি হতেন না। এ ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া লেগেছিল। হাওযা থেকে খুশিমতো টাকা ধরবাব যাত্ন যাঁব জানা আছে তিনি হাওয়াই টাকায কোটিপতি না হযে দীনহীনের মতো এই সামান্য টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা কবে ঘুরে বেড়ান কেন? এ প্রশ্নের ভারি সুন্দর জবাব দিযেছিলেন যাত্নকর চাঁদ মিয়া। বলেছিলেন 'হাওযাই যাত্নর টাকা ভোগে লাগাতে নেই। লাগালেই যাত্ন আর লাগে না। হাওযার টাকা তাই আবার হাওযাতেই ফিরিয়ে দিতে হয়।'

যাত্নকর রাজা বোসের মুখে শুনেছিলাম ডেভিড ডেভাণ্টের মতো তাঁকেও একবার পথেব মাঝখানে দাঁড়িযে টাকাব ম্যাজিক দেখাতে হযেছিল। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ছিল একটু আলাদা। ঘটনাটি এইরকম। শহর কলকাতা, সময় অপবাহ্ন। যাত্নকর রাজা বোস হ্যারিসন বোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) দিয়ে চলেছে[illegible] বড়বাজারের দিকে। হঠাৎ ফুটপাথেব ওপর পঞ্চনদের দেশ থেকে আগত [illegible] চওড়া দাড়িওয়ালা ভাগ্য-গণৎকার 'সাধু'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল[illegible]র 'সাধু' এখনও কলকাতার পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। ছোটোখাটো অথচ চমৎকার যাত্নর খেলায় এঁদের হাত বেশ তৈরি থাকে এবং যাত্নকর[illegible] বচনে এঁরা বেশ সিদ্ধমুখ। বিশেষ

করে হাতের তালুতে বা আঙুলের ফাঁকে টাকা, সিগারেট, গুলি, ডিম, চাবি প্রভৃতি ছোটোখাটো জিনিস লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'পামিং'—এঁদের হাত সাফাই চমৎকার। এঁদের কর্মপদ্ধতি বা কায়দার একটি উদাহরণ দিই। মনে করুন আপনি পথ দিয়ে চলেছেন কিছু একটা ভাবতে-ভাবতে। এমন সময় হঠাৎ এমনি এক সাধু আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন আচমকা। আপনাকে ভাবতে সময় না দিয়ে সাধুজী এমনি হঠাৎ হুকুম করলেন হাত পাততে, যে আপনার ডান হাতটি সঙ্গে সঙ্গে যেন সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে পাতিত হলো। সাধুজী আপনার ডান হাতটি তাঁর বাঁ হাতে ধরে আপনার খালি হাতের ওপর তাঁর ডান হাতের চাপড় মেরেই বললেন 'মুঠো করো'। সঙ্গে সঙ্গে সাধুজী নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনার ডান হাতটি বিদ্যুদ্বেগে মুঠো করিয়ে দিলেন। তারপর আপনার বদ্ধমুষ্টির ওপর ফু দিয়ে বললেন মুঠিটি খুলতে। আপনি খুলে দেখলেন—তাজ্জব ব্যাপার! আপনার হাতে একটী নকুলদানা! শূন্য মুষ্টির ভেতর নকুলদানার আবির্ভাব আপনাব কাছে অলৌকিক মনে হবে। 'সাধুজী'র এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আপনার বিশ্বাস জন্মাবে, আপনি ওঁকে দিয়ে আপনার ভাগ্যগণনা করাবেন এবং কিছু অর্থও আপনার পকেট থেকে এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুর পকেটে যাবে। আসলে ঐ নকুলদানার আবির্ভাব মোটেই অলৌকিক নয়। ওটি সাধুজীর ডানহাতের তালুতেই লুকানো অর্থাৎ 'পাম' করা ছিল এবং আপনার হাতটি মুঠো করিয়ে দেবার অব্যবহিত পূর্বেই নকুলদানাটি ওর হাতের তালু থেকে আপনার হাতের তালুতে চালান হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটি এতো দ্রুত বেগে ঘটেছিল যে আপনি স্থির মস্তিষ্কে বুঝবার সুযোগই পান নি কি ঘটছে।

সাধুজী সামনে পড়ায় রাজা বোস দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাধু তখন 'বেটা তুমহারা ভালা হোগা' ইত্যাদি বাঁধা বুলি বলতে-বলতে দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাড়ির ডগা থেকে একটা সিগারেট বার করে রাজা বোসের হাতে দিয়ে বললেন 'লে বেটা সিগ্রেট পী লো।'

বলা বাহুল্য যাদুর খেলায় অভ্যস্ত রা[illegible] ভ্যাবাচ্যাকা খাননি। তবু ন্যাকা সেজে তিনি এমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখালেন যেন দাড়ির ডগা থেকে সিগারেটের অলৌকিক আবির্ভাব দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। সাধু তো

তাঁর সেই হতভম্বতার অভিনয় দেখে ভারি খুশি, ভাবলেন শিকার টোপ গিলেছে। শিকারকে টোপটি আরো ভালো করে গেলাবার জন্তে সাধু আরো বললেন 'বেটা তোমার বরাত খুব ভালো। যেটুকু খারাপ আছে তা এই দেখো আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' বলে সাধু পুরুষটি তাঁর দাড়ির গোছাটা মুঠো করে ধরে একটু-একটু করে ঝাড়া দিতেই দাড়ি থেকে ঝরঝর করে খানিকটা দুধ ঝরে পড়ল ফুটপাথের ওপর।

রাজা বোস ভাবলেন লোকটিকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, তাছাড়া তাঁর নিজেরও কাজের সময় নষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন 'সত্যি আপনি ভয়ানক সিদ্ধ পুরুষ। আপনার দয়াতে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে। এই দেখুন না যেখানে হাত দিচ্ছি সেখানেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি!' বলে নাক ঝেড়ে, হাওয়া থেকে, কনুই থেকে, জুতোর তলা থেকে, এমন কি সাধুর দাড়ির ডগা থেকেও খুশিমতো টাকা বার করতে লাগলেন। একটি টাকাকে দুহাতে চিরে ফেলে দুটাকা বানিয়েও দেখিয়ে দিলেন। এবারে সাধুজীর সত্যি সত্যি ভ্যাবাচ্যাকা খাবার পালা। তিনি বুঝলেন ভূতের কাছে তিনি এতক্ষণ মামদোবাজি দেখাচ্ছিলেন, এই বেলা মানে মানে কেটে পড়া দরকার। কেটে পড়লেনও! রাজা বোস যেমন যাচ্ছিলেন তেমনি চললেন বড়বাজারের দিকে।

ডেভিড ডেভাণ্ট ছিলেন তাঁর সময়ে (১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত; তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন যাত্ন জগৎ থেকে) ইংল্যাণ্ডের সেরা এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা যাত্নকরই নয়, অসামান্য রসিকও ছিলেন তিনি। তাঁর রসিকতা ছিল নির্মল আনন্দময়, প্রত্যেকটি খেলায়—কি ছোটো, কি বড়ো—তিনি প্রচুর হাসির খোরাক যোগাতেন কথাবার্তা, হাবভাব এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তিনি আর জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর রসিকতার পরিচয় রয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি কথায়। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই আরেকটি কাহিনী বলি।

লণ্ডনের যাত্ন-রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত ডেভাণ্ট একটি চমকপ্রদ খেলা দেখাচ্ছেন, যার নাম 'দি ভ্যানিশিং লেডি ইলিউশন' অর্থাৎ মহিলার বিস্ময়কর অন্তর্ধান। সর্বপ্রথম প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে এ খেলাটি দেখান খেলাটির মূল আবিষ্কর্তা বিখ্যাত ফরাসী যাত্নকর বুয়াতিয়ে দ্য কোল্তা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে; দ্য কোল্তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তার অল্প পরেই ইংরেজ যাত্নকর চার্লস বারট্রাম (ব্যক্তিগত জীবনে জেম্স্ ব্যাসেট) দেখাতে শুরু করেন লণ্ডনের ইজিপশিয়ান হলে। খেলাটি

সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। মঞ্চের ওপর যাদুকর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিলেন। কাগজটির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি চেয়ার। চেয়ারের ওপর একটি মহিলা বসলেন। মহিলাটিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি রেশমি চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। যাদুকর হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে চাদরটি তুলে নিতেই অবাক কাণ্ড। চোখের পলকে চাদরটি অদৃশ্য, ভদ্রমহিলাও নিরুদ্দেশ, খবরের কাগজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শূন্য চেয়ার, অন্তর্হিতা সুন্দরীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে—সুন্দরীর ফেলে যাওয়া ছোট্ট রুমালটি।

মূল খেলার প্লট বা কাঠামোটুকু এই। পরে এই খেলাটি বিভিন্ন যাদুকরের হাতে তাঁদের যাঁর যাঁর রুচি, প্রতিভা, প্রয়োজন, সুবিধা এবং সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রদর্শিত হয়। এই অন্তর্ধানের খেলাটি ডেভাণ্ট যেভাবে দেখাতেন তাতে তাঁর কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। খেলাটি তাঁর হাতে এমন আশ্চর্য রূপ নিতো যে অনেক দর্শকেরই বারবার দেখেও আশ মিটত না, তাঁরা রাতের পর রাত এই একই খেলা দেখতে আসতেন।

একদিন এক ভদ্রলোক ডেভাণ্টের সঙ্গে এসে গোপনে দেখা ক'রে চাপা গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

ডেভাণ্ট বললেন; 'বলুন।'

'কয়েক রাত ধরে আপনার মহিলা ওড়ানোর যাদু দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অপূর্ব! অতুলনীয়।' বলতে বলতে ভদ্রলোকের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো।

ডেভাণ্ট বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'একটি মহিলাকে উড়িয়ে দেবেন, আর যেন তিনি ফিরে না আসেন। মোটা ফী দেবো আপনাকে।'

ডেভাণ্ট বললেন 'উড়িয়ে দিতে পারি; ফিরে আসা বন্ধ করার যাদু জানা নেই। কিন্তু মহিলাটি কে?'

ভদ্রলোক বিষণ্ন মুখে বললেন, 'আমার শাশুড়ি।'

আদালতে যাদুকর

যাদুকরেরা সাধারণত রঙ্গমঞ্চে, ঘরোয়া আসরে, বৈঠকে বা পথে-ঘাটে যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকেন। বিখ্যাত যাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz) একবার যাদু-প্রদর্শন করতে হয়েছিল প্রকাশ্য আদালতে—বিচারক এবং জুরীদের সামনে। কিন্তু কেন? সেই কাহিনীই বলছি।

এ কাহিনীর নায়িকা এডিথা সালোমেন খৃষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্কিন মুলুকের কেন্‌টাকি প্রদেশে। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন ডানপিটে, বেপরোয়া, ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, বুজরুক ইত্যাদি চরিত্রের মানুষ। এডিথা তাঁর পিতৃদেবের চরিত্রের সবগুলো গুণই পেয়েছিলেন পুরো মাত্রায়। তার ওপর তাঁর ছিলো কতকগুলো বিশেষ গুণ যাতে তাঁর পিতৃদেব ছিলেন তাঁর তুলনায় ছেলেমানুষ। পিতা-পুত্রীতে ছাড়াছাড়িটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিলো এবং এডিথা অল্প বয়সেই এ্যাডভেঞ্চার-বহুল বিচিত্র জীবন শুরু করেছিলেন। বিবেক বা নীতিবোধের বালাই এতোটুকুও ছিল না তাঁর—সুযোগ পেলেই ছোট, বড়ো, মাঝারি যে কোনো অপরাধ তিনি বিনা দ্বিধায় করতেন। দুরন্ত দুঃসাহস ছিলো এডিথার চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

বিশ বছর বয়সে এডিথা এক বিরাট ধাপ্পা অভিযান শুরু করলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্‌টিমোর শহরে। এখানে তিনি বেশ জমকালো ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন ব্যাভেরিয়ার (জার্মানী) অভিজাত সম্প্রদায়ের কাউন্টেস্ ল্যাণ্ডসফেল্ট পরিচয়ে। বাল্‌টিমোরের খবরের কাগজে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেশ ফলাও করে ছাপা হলো—বলা বোধহয় বাহুল্য এর পেছনে ছিল সুচতুরা এডিথা ওরফে ব্যারনেস রোজেনথেল ওরফে কাউন্টেস ল্যাণ্ডসফেল্টরই ব্যবস্থাপনা। এই সব সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে পরিচিত করলেন লাস্যময়ী স্বনামধন্যা আইরিশ-স্প্যানিশ নর্তকী লোলা মন্টেজ (Lola Montez) এবং ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-র অবৈধ কন্যা বলে। বাল্‌টিমোর শহরে সাড়া পড়ে গেলো, হুজুগপ্রিয়ের দল মেতে উঠলেন হুজুগে। বহুবল্লভা রূপসী নর্তকী লোলা সম্পর্কে অনেক রকম মুখরোচক কেচ্ছা প্রচলিত ছিল। খ্যাতির চাইতে অপখ্যাতি

অনেক বেশি মজাদার, অনেক বেশি জনপ্রিয়। সুতরাং লুই ও লোলার অবৈধ সন্তানের এমন নাটকীয় আবির্ভাব এবং জমকালো অবস্থিতি সারা শহরের শিহরণপ্রিয় মহলে চাঞ্চল্য জাগাবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কথায়-বার্তায়, হাবভাবে, আদব-কায়দায় পুরোদস্তুর আভিজাত্য বজায় রাখবার মতো চেহারা আর চাতুর্য ছিল এডিথার। ঠাট বজায় রাখবার জন্য তিনি জাঁকজমকে খরচও করেছিলেন প্রচুর। অবশ্য এর পেছনে তাঁর গূঢ় অভিসন্ধি ছিল; ব্যারনেস রোজেনথল যে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, বালটি-মোরের অর্থকুলীন মহলে এই বিশ্বাসটা ভালোভাবে চালু করবার জন্যেই প্রথম প্রথম বেশ জাঁক করে কিছু টাকার ছিনিমিনি খেলা দরকার—এ তো অর্থের অপব্যয় নয়, আগামী লাভের জন্য বিনিয়োগ—যাকে বলে 'ইনভেস্টমেণ্ট।'

বালটিমোর শহরে মোটা ঐশ্বর্যের মালিক মোটাবুদ্ধি 'কাপ্তান'-এর অভাব ছিল না। এডিথা ওরফে ব্যারনেস রোজেনথেল হলেন মক্ষিরানী, আর তাঁকে ঘিরে মেতে উঠল এই প্রচুর ঐশ্বর্যবান বোকা কাপ্তানের দল। "ব্যারনেস" সুকৌশলে এঁদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে, নীরব ভাষায় বোঝালেন, "ওগো প্রিয়, তোমাকে—শুধু তোমাকে দেখেই আমার মন মজেছে। তুমি আমার নারী জীবনের একমাত্র পরম পুরুষ। তোমারি পায়ে সঁপে দেব আমার জীবন-যৌবন-ধন-মান। শুধু একেবারে সঁপে দেবার আগে তোমাকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছি মাত্র।" প্রত্যেকেই মনে মনে হাতে চাঁদ পেলেন, ভাবলেন দুটো দিন সবুর করলেই অতুলনীয় মেওয়া ফলবে। "ব্যারনেস" চেহারায় ঠিক রূপসী না হলেও চটকদার, সুরসিকা, সুচতুরা; তাছাড়া ঠাট-ঠমক আর জাঁকজমক দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এঁর ঐশ্বর্য অগাধ। লোলা দুহিতার পাণিগ্রহণের জন্যে লালায়িত হয়ে প্রত্যেকেই গোপনে দিন গুনতে লাগলেন। অর্থবান গাধার দল পড়ে গেলেন মোহময়ীর মোহিনী মায়ার খপ্পরে। এডিথা এই প্রেমোন্মাদদের এক-একটিকে ধরে নানা ছলে তাঁকে যথাসাধ্য দোহন করতেন, তারপর যখন দেখতেন একে প্রায় ফোঁপরা করে আনা গেছে, আর বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না, তখন কোনো অজুহাতে ঝগড়া করে তাঁকে জীর্ণ বসনের মতো পরিত্যাগ করতেন। এভাবে প্রেমমূর্খ টাকার কুমীরদের পকেট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা খসিয়েও খোলামকুচির মতো উড়িয়ে দিলেন এডিথা। আফিম ইত্যাদি নানারকমের নেশাও ধরলেন। রক্তেই যে তাঁর

বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার নেশা। সে নেশা এড়ানো যাবে কি করে ?

এর পরের কিছু-কিছু ঘটনা টপকে বালটিমোর শহর ছেড়ে এসে আমাদের আসল কাহিনীর বড়ো রাস্তায় পড়া যাক। এডিথার মনে হলো হাতের পাঁচ হিসেবে নিরীহ চরিত্রের একটি বশংবদ স্বামী থাকা মন্দ নয়। বিয়ে করলেন ডাঃ মেসাণ্ট নামে এক নিরীহ চরিত্রের তরুণ ডাক্তারকে। বছর না ঘুরতেই এডিথা হলেন ডাঃ মেসাণ্টের বিধবা। এডিথা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন মানবসমাজে দ্বিপদ গর্দভের কোনোদিনই অভাব হয় না, হবে না; এবং বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমতীদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে এদের ভেতর যারা শাঁসালো, তাদের দোহন করা, যতোরকমে পারা যায় তাঁদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। সে সময় হিপনোটিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যার বেশ প্রতিপত্তি হয়েছিল। ডাক্তার মেসাণ্টের বিধবা এডিথা সেদিকে মনোযোগিনী হলেন। এবার তিনি ভূমিকা নিলেন মহিলা হিপ্‌নোটিস্ট-এর। অভিনয়-চাতুর্য ছিলো তাঁর অসাধারণ, কলা-কৌশলেও তাঁর মাথা খেলতো, তাছাড়া তাঁর যেমন ছিল কল্পনাশক্তি তেমনি কূটবুদ্ধি। সুতরাং হিপনোটিস্ট হিসেবে পসার জমাতে তাঁর বেশি দেরি হলো না। কিন্তু আয় যা হতে লাগলো তা এককালে হাজার-হাজার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এডিথাকে খুশি করবার মতো প্রচুর নয়। তিনি পণ করলেন এই হিপনোটিজমের ব্যবসাটাকেই আরো জাঁকিয়ে করতে হবে, নইলে দুহাতে পয়সা লোটা যাবে না। এ সময় এডিথার আলাপ পরিচয় হলো একটি আত্মম্ভর, বাক্‌সর্বস্ব, দুর্বলচিত্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়; কিন্তু তিনি অভিজাত ডিস-ডেবার বংশোদ্ভূত, সেইজন্য অভিজাত সমাজে তাঁর বেশ কৌলীন্য মর্যাদা ছিলো। এডিথার মনে হলো বিধবা শ্রীমতী মেসাণ্ট হয়ে থাকার চাইতে সধবা শ্রীমতী ডিস-ডেবার হওয়া অনেক ভালো। তাই হলেন তিনি। নতুন স্বামীর পদবির আগে নিজের জন্য পছন্দ করে দুটি নাম বসিয়ে পুরোনো এডিথা হয়ে গেলেন নতুন অ্যান ও' ডেলিয়া ডিস-ডেবার। চমৎকার জমকালো হোমরাচোমরা নাম। আর "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" ফরমুলা অনুযায়ী তিনি এখন আর সাধারণ স্ত্রীলোক রইলেন না, হয়ে গেলেন পুরোদস্তুর অভিজাত মহিলা, সোসাইটি লেডি।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের (এখন থেকে তাঁকে এই নামেই অভিহিত করবো)

পরিকল্পনা এবং আশা সফল হলো। তাঁর সম্মোহন মন্দিরে মক্কেলের ভিড় বেড়েই চললো। শ্রীমতীর কাছে এসে সম্মোহিত হওয়াটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেলো, আর না-হওয়াটা হয়ে উঠলো লজ্জার ব্যাপার। 'আপনি একবারও শ্রীমতী ডিস ডেবারের হাতে হিপনোটাইজড হন নি? ছি ছি ছি ছি, করেছেন কি? সমাজে মুখ দেখাচ্ছেন কি করে? যান যান আজই একবার হিপনোটাইজড হয়ে আসুন।'—এই ধরনের বুলি সমাজের এখানে সেখানে শোনা যেতে লাগলো। প্রত্যেক কিস্তি হিপনোটিজমে মোটা দর্শনী নিতেন শ্রীমতী, সুতরাং আয় যা হতে লাগলো তাকে দু হাতে টাকা লোটাই বলা চলে।

কিন্তু জোয়ার যেমন হু হু করে এসেছিলো, ভাঁটাও এলো তেমনি করে। কেটে গেলো নতুনের হুজুগ, সম্মোহন মন্দিরে প্রায় শূন্যের কাছে এসে পৌঁছলো মক্কেলের আনাগোনা। দু হাতে যেমন লুটেছিলেন, তেমনি খরচাও করেছিলেন শ্রীমতী। সুতরাং আবার শুরু হল আর্থিক দুরবস্থা। শ্রীমতী মরিয়া হয়ে উঠলেন। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

বিধাতা সহায় থাকলে কি না হয়? এই সময় শ্রীমতীর পরিচয় হল নিউইয়র্ক শহরের এক বিরাট ধনী আইন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম লুথার মার্শ। আইন-আদালতের জগতে তিনি অসামান্য চতুর, চৌকস এবং বিচক্ষণ বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই ধরনের লোককে ধাপ্পা বা বুজরুকি দিয়ে ঠকানো শক্ত, হয়তো বা অসম্ভব। কিন্তু ঠকবাজি ধাপ্পাবাজির ওস্তাদ মহলের অভিজ্ঞ অভিমত হচ্ছে ঠিক উপযুক্ত পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে পারলে, অথবা মওকা মতো ঝোপ বুঝে কোপ লাগাতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই মোটাবুদ্ধি বুদ্ধুদের চাইতে সূক্ষ্মবুদ্ধি চালাকদের ঘায়েল করা বেশি সহজ। পুলিশ রেকর্ড থেকেই এ অভিমতের যথার্থ বোঝা যায়।

লুথার মার্শ তখন বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের ওপর। প্রাণাধিকা পত্নীর সদ্য বিয়োগে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। সমাজ সংসার সব কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে তাঁর কাছে, নিজেকে নিঃসঙ্গ, অসহায় বোধ করছেন তিনি। আনন্দে নেচে উঠলো শ্রীমতী অ্যান ও' ডেলিয়া ডিস ডেবারের চিত্ত। তারপর এক সন্ধ্যায় সম্মোহন চক্রে বসেছেন শ্রীমতী ডিস ডেবার। সদ্য পত্নীবিয়োগ বেদনায় জর্জর বৃদ্ধ লুথার মার্শও উপস্থিত রয়েছেন। সহসা এ কি হলো?

সম্মোহনকারিণী শ্রীমতী ডিস ডেবার নিজেই · মোহিতা হয়ে গেলেন যেন! দেহ নিশ্চল, দুটি চোখের তারায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি, বাইরের জগৎ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন শ্রীমতী। শ্রীমতী ডিস ডেবার যেন আর শ্রীমতী ডিস ডেবার নন। তাঁর অবস্থা দেখে আধা ভীত আধা চিন্তিত হয়ে উঠলেন লুথার মার্শ। একটু পরেই বৃদ্ধ চমকে উঠলেন। শ্রীমতী ডিস ডেবার মিডিয়ামে পরিণত হয়ে গেছেন, আর তাঁরই মাধ্যমে স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলছেন স্বর্গীয়া শ্রীমতী মার্শ। কণ্ঠস্বরটা হুবহু মিলছে না, কিন্তু তেমনি উচ্চারণভঙ্গি, তেমনি বাক্যবিন্যাসের ধরন, তেমনি মাঝে মাঝে একটু থেমে থাকা, তেমনি কয়েকটি পরিষ্কার মুদ্রাদোষ। তাছাড়া তাঁর কথায় যে কতকগুলো ইঙ্গিত আর প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই পরলোক থেকে শ্রীমতী মার্শের আত্মাই এসে হাজির হয়েছেন, মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস ডেবার-কে ভর করে।

স্বর্গীয় আত্মাকে মর্ত্যে নামাবার মিডিয়ামগিরি শ্রীমতীর এই প্রথম। শ্রীমতী দেখলেন তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাই আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে। শিকার মাছটি শুধু টোপই নয়, বঁড়শি আর সুতোসুদ্ধ গিলে ফেলেছেন। চিরতরে হারানো প্রিয়তমার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র ভেবে শ্রীমতী ডিস ডেবারের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন ধনী আইন বিশারদ লুথার মার্শ। শ্রীমতী ঠিক করে ফেললেন হিপনোটিজম ছেড়ে এইবার মিডিয়ামগিরির ব্যবসাই করবেন তিনি, এতে অর্থ সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি।

শ্রীমতী ডিস ডেবার সর্বদাই কাছাকাছি থাকলে তাঁর মাধ্যমে স্বর্গীয়া পত্নীর সঙ্গে যখন খুশি যোগাযোগ করা যাবে, এই ভেবে লুথার মার্শ ঐকান্তিক অনুরোধ করে শ্রীমতীর আলাদা বাড়ী তুলে দিয়ে তাঁকে স্বামী-সন্তানাদিসহ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে বিরাট মার্শভবনে বসবাস করাবার জন্য নিয়ে গেলেন। একটি বড়ো হলঘর সুসজ্জিত করে আলাদা রাখা হলো, লোকান্তরিত আত্মা আনবার চক্র বৈঠক বসবে বলে। এই ঘরে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস ডেবারকে কেন্দ্র করে বসতে লাগলো বৈঠকের পর বৈঠক। বহু অভিজাত পরিবারের শোকার্ত নরনারী এসে মোটা দক্ষিণা দিয়ে লোকান্তরিত প্রিয়জনের আত্মিক সংস্পর্শ লাভ করে যেতে লাগলেন, ফুলে ফুলে উঠতে লাগল মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস ডেবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। শ্রীমতী মার্শের অদৃশ্য আত্মাও প্রায়ই এসে শ্রীযুক্ত মার্শের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেতেন এবং বলাবাহুল্য প্রতিবারই

মিডিয়াম শ্রীমতী ডিন ডোরার তাঁর মেহনতের জন্যে লুথার মার্শের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকার দক্ষিণা আদায় ক'রে নিতেন।

কল্পনাময়ী শ্রীমতীর উর্বর মস্তিষ্কে এর পর চমৎকার একটি পরিকল্পনার উদয় হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি প্রস্তাবও পেশ করলেন তাঁর পাগলাটে মক্কেলটির কাছে। প্রস্তাবটি এই যে, পরলোকের সঙ্গে যখন শ্রীমতী ডিন ডোরারের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে, লোকান্তরিত আত্মাদের সঙ্গে যখন তাঁর এমন অন্তরঙ্গ দহরম মহরম, তখন বিগত যুগের সেরা সেরা শিল্পীদের আত্মা আনিয়ে তাঁদের দিয়ে নতুন নতুন ছবি আঁকিয়ে নিলে কেমন হয়? তাঁদের নতুন আঁকা 'মাস্টার-পিস' ছবিগুলো নিশ্চয়ই অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে—শিল্পচর্চাকে শিল্পচর্চা, ব্যবসাকে ব্যবসা।

শ্রীযুত মার্শ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। শুভস্য শীঘ্রম্।" একটি বিশেষ বৈঠকে, হলের ভেতর [illegible] করে শ্রীমতী ডিন ডোরার স্বর্গগত শিল্পীদের আহ্বান জানালেন। [illegible] সেই [illegible] আবির্ভাব ঘোষণা করলেন বিগত যুগের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী [illegible]। [illegible] তাঁকে একটি ছবি এঁকে দেবার অনুরোধ জানালেন শ্রীমার্শ। [illegible] স্বর্গীয় বাকারো মোটেই আপনভোলা শিল্পী নন, পাকা [illegible] লোক। ছবি আঁকতে তিনি রাজি, কিন্তু বেশ মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে, এবং সে টাকা নগদ আগাম চাই। মোটা টাকার অঙ্ক শুনেও তাই দিতে রাজি হয়ে গেলেন শ্রীযুত মার্শ। একটি বাদামী রঙের আলমারির ভেতরে আগাম দক্ষিণার নগদ টাকা, ঈজেলের ওপর ক্যানভাস, তুলি রং ইত্যাদি রেখে আলমারির তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। চাবি রইল শ্রীমতী ডিন ডোরারের কাছে। শিল্পী বাকারোর অদৃশ্য আত্মা ঘোষণা করলেন, দশদিন বাদে ছবি আঁকার কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই দশদিন শ্রীমতী তাঁর আপন একান্তে নিরালায় বিশ্রাম নিলেন। দশদিন বাদে আলমারি খোলা হতেই দেখা গেলো ঈজেলের ক্যানভাসের ওপর সত্যিই ছবি আঁকা হয়ে গেছে, তার কোনো কোনো জায়গায় রং তখনো ভালো করে শুকোয় নি। কোনো শিল্পীর চোখে সে ছবি পড়লে তিনি হয়তো হাসতেন, কিন্তু লুথার মার্শের মনে হলো এ এক অপূর্ব, অমূল্য ছবি। আর এ ছবি যে স্বয়ং

রাফায়েলেরই আঁকা, সে বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিলো না, কারণ তিনি নিজেই তো রাফায়েলের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

শুধু রাফায়েলের নয়, একে একে স্বর্গীয় আরো সেরা সেরা শিল্পীর আত্মা আনিয়ে মোটা দক্ষিণা দিয়ে ছবির পর ছবি আঁকালেন শ্রীমতী ডিস ডেবার। মোটা দক্ষিণাগুলো সবই দিলেন লুথার মার্শ, আর তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর ঐ প্রাসাদোপম বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে ছবিগুলো শোভা পেতে লাগলো। মার্শের মনে—হায় মার্শ!—দৃঢ়বিশ্বাস হলো তাঁর মত এমন মহামূল্যবান ছবির সংগ্রহ পৃথিবীতে আর নেই। টাকাগুলো নেপথ্যে চলে গেল শ্রীমতী ডিস ডেবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে।

শ্রীমতী ডিস ডেবার একদিন বললেন, "অনেক শিল্পীকে এনে তো ছবি আঁকিয়ে নেওয়া গেলো। বলেন তো এবার একদিন শেক্সপিয়ারকে নিয়ে আসতে পারি।"

শেক্সপিয়ার! বিশ্বের বিখ্যাততম, শ্রেষ্ঠতম কবি-নাট্যকার উইলিয়ম শেক্সপিয়ার! তাঁর অমর আত্মা কৃপা করে পদার্পণ করবেন এই দীনহীনের ভবনে! এতো বড়ো সৌভাগ্য আর সম্মান লুথার মার্শ কোনোদিন স্বপ্নেও আশা করতে পারেন নি। তিনি উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং অবিলম্বেই এক সন্ধ্যায় ভৌতিক চক্রে বসলেন শ্রীমতী ডিস ডেবার, বসলেন শ্রীযুত লুথার মার্শ। সেই অন্ধকারের বুকে সহসা ধ্বনিত হয়ে উঠলো মহাকবি মহানাট্যকার শেক্সপিয়ারের কণ্ঠস্বর। অদৃশ্য শেক্সপিয়ারের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হলেন মার্শ, ধন্য জ্ঞান করলেন নিজেকে। বিনীত আবেদন জানালেন—"হে চিরবরেণ্য মহাকবি! আপনার বচন শ্রবণ করে জীবন ধন্য হলো, একবার, শুধু একবার দর্শন দিন, নয়ন ধন্য করি।" কিন্তু শেক্সপিয়ার দর্শন দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "পরলোকে এতোদিন থেকে থেকে তিনি পারলৌকিক আবহাওয়ায় এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, যে ইহলৌকিক আবহাওয়া তাঁর সূক্ষ্মদেহে বরদাস্ত হবে না বলেই তিনি এ আবহাওয়ায় সূক্ষ্মদেহে দেখা দিতে ভরসা পাচ্ছেন না। যাই হোক, দেখা না দেওয়ার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেক্সপিয়ার তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী থেকে কিছু কিছু আবৃত্তি করে শোনালেন। একটি আনকোরা নতুন কবিতাও শোনালেন; বললেন, "এ কবিতাটি আপনার ভবনে আসবার পথে মনে মনে রচনা করেছি।"

এরপর একে একে বিভিন্ন যুগের আর বিভিন্ন দেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মা শ্রীমতী ডিস ডেবারের আবাহনে ভৌতিক চক্রে এসে লুথার মার্শের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। কোনো কোনো আত্মা কাগজের পাতায় বা প্যাডে অনেক কথা বা প্রশ্নের জবাব লিখেও রেখে গেলেন। এমন কি অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শার্লামেনকে পর্যন্ত শ্রীমতী ডিস ডেবার ভৌতিক চক্রে এনে মার্শের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রতি বৈঠকেই মোটা দক্ষিণা আদায় করে করে শ্রীমতী ডিস ডেবার প্রচুর টাকা স্থানান্তরিত করলেন মার্শের তহবিল থেকে নিজের তহবিলে। মার্শ-কামধেনুকে কিস্তিতে কিস্তিতে এতো অনায়াসে দোহন করে করে সাহস বেড়ে গেলো শ্রীমতীর, লোভ হয়ে উঠলো প্রচণ্ড। তিনি ঠিক করলেন, এভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে আর নয়, খুচরো ছেড়ে এবার পাইকারী মার মারতে হবে। 'মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার।' কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাতেই তাঁর কাল হলো।

এক সন্ধ্যায় ভৌতিক চক্রে আবির্ভাব হলো একটি বালিকা আত্মার। ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শের বহুদিন আগে লোকান্তরিতা কন্যা এই বালিকা ওপার থেকে এপারের বাবার কাছে ঐকান্তিক আবদার জানালো "বাবা তোমার ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-র সমস্ত সম্পত্তি আমার এই ডিস ডেবার মাসির নামে লিখে দাও। দাও বাবা। বলো দেবে?"

"নিশ্চয় দেবো মা। নিশ্চয় দেবো।"—বললেন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে বিরাট সম্পত্তির মালিক লুথার মার্শ। দানপত্রের দলিল তৈরি হয়ে গেল। মার্শের আত্মীয়স্বজন দেখলেন অবস্থা সঙ্গীন, যা করার এই বেলা। তাঁরা আর কালবিলম্ব না করে যা করবার করলেন, ফলে শ্রীমতী ও শ্রীমৎ ডিস ডেবার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন। মামলা আদালতে উঠলো। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীমতী বেছে নিলেন একজন তরুণ এবং সুদর্শন আইনজীবীকে। এ মামলার নাটকীয় দিকটা আকৃষ্ট করলো শ্রীমতীকে ; তিনি এতে 'পাবলিসিটি' অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞাপনের একটা চমৎকার সুযোগ দেখতে পেলেন। তিনি রটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন যে, মামলার ব্যাপারে লৌকিক উকিল ছাড়া তিনি অলৌকিক পরামর্শও নিচ্ছেন, বিভিন্ন আইনজ্ঞ আত্মার কাছ থেকে। তারপর 'সিসেরো' (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বিখ্যাত রোমান বাগ্মী, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিশারদ) এবং তাঁর দশজন পরামর্শদাতার নির্দেশে' শ্রীমতী ডিস

ডেবার ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর সম্পত্তির দলিল ফিরিয়ে দিলেন মার্শের হাতে। কিন্তু ফৌজদারী মামলা তাতে বন্ধ হল না।

শ্রীমতী ডিস ডেবারকে প্রতারণার অভিযোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেলো না। তিনি বললেন, "আমি যা করেছি সবই খাঁটি আত্মিক ক্ষমতায়—এর ভেতর কোনো ফাঁকি ছিলো না।"

কিন্তু ফাঁকি যে ছিলোই এবং ফাঁকিই যে ছিলো, সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই সরকারপক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আদালতে উপস্থিত করলেন তখনকার বিখ্যাত যাত্নকর কার্ল হার্টজ্‌কে (Carl Hertz)। তিনি মুক্ত আদালতে দিনেদুপুরে সর্বসমক্ষে হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখাবেন যে, তথাকথিত ভৌতিক খেলাগুলো মোটেই ভৌতিক বা অলৌকিক নয়, নিছক হাতসাফাই বা ভেল্কির ব্যাপার, স্রেফ চাতুরি, এর সঙ্গে পরলোক বা আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে যাত্নকর কার্ল হার্টজ্‌ তাঁর একটি বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে উদ্ধৃত করি :

"শ্রীমতী ডিস ডেবার তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আমি তাঁকে আর জুরিদের একফালি সম্পূর্ণ সাদা চিঠির কাগজ দেখালাম। কাগজটি শ্রীমতীর হাতে দিয়ে বললাম সেটিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে পর পর চারবার ভাঁজ করতে। চারবার ভাঁজ করা ঠিক ঐরকম আরেক ফালি চিঠির কাগজ—তার ভেতরের দিকে ছোট্ট একটি চিঠি লেখা—গোপনে লুকানো ('পাম' করা) ছিলো আমার হাতে। শ্রীমতী তাঁর হাতের কাগজটি চারবার ভাঁজ করে আমার হাতে দিতেই সবার অলক্ষ্যে চোখের নিমেষে আমার আসল কাজটি করা হয়ে গেলো —শ্রীমতীর পরীক্ষিত কাগজটি লুকিয়ে পড়লো আমার হাতের তালুতে, আর তার জায়গায় আমার আঙুলের ডগায় ধরা রইলো ভেতরে লেখাসুদ্ধ ভাঁজ করা কাগজ। আমি বললাম, 'এবারে এই কাগজটিকে আমার কপালে চেপে ধরে রাখুন।' শ্রীমতী বললেন, 'দাঁড়ান, কাগজে আমি একটা চিহ্ন দিয়ে দিই।' অর্থাৎ আমি যেন কাগজ বদল করে ফেলতে না পারি। কিন্তু তিনি (আমাকে জব্দ করবার জন্য) ঠিক এমনটিই করবেন ধরে নিয়ে আমি কাগজ-বদলটা যে আগেই সেরে রাখবো তা তিনি বুঝতে পারেন নি। হাতের ভাঁজকরা কাগজটির ভাঁজ না খুলেই তিনি একটি কোণ ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ; ঐ ছেঁড়া কোণ দিয়েই কাগজটিকে চেনা যাবে। তারপর ঐ চিহ্নিত কাগজটির

ভাঁজ নিজের হাতে খুলে তার ভেতর লেখা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন।......"

এর পর শ্রীযুত লুথার মার্শকে সহকারীরূপে নিয়ে যাতুকর হার্টজ শ্রীমতীর আরেকটি ফাঁকির কৌশল ফাঁস করে দিলেন।

"এ খেলাটিতে," যাতুকর হার্টজ্ লিখছেন তাঁর বন্ধুকে, "একটি একশো শাদা পৃষ্ঠার যে প্যাড দেখালাম, তাতে কোনো পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে তার একদিক ধরতে দিলাম মার্শকে। অন্যদিক ধরলাম আমি। একটু পরেই খস খস করে লেখার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেলো। তারপর খবরের কাগজের ভেতর থেকে প্যাডটি বার করে দেখা গেলো ভেতরের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।"

এই ভুতুড়ে মার্কা ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হলো? কাল হার্টজ লিখছেন:

"এ খেলার জন্য আমার ছিলো দুটি একরকম প্যাড। একটি লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ওয়েস্টকোটের তলায় (এটির কথা আর কেউ জানতো না); অন্যটি দিয়েছিলাম মার্শকে পরীক্ষা করতে। বলা বাহুল্য ওয়েস্টকোটের তলায় লুকানো প্যাডের ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো ছিলো লেখায় ভর্তি। তারপর পরীক্ষিত প্যাডটি খবরের কাগজে জড়াবার ছলে ঐ খবরের কাগজের আড়ালেই সবার অলক্ষ্যে প্যাড বদল করে ফেললাম। (অর্থাৎ পরীক্ষিত শাদা প্যাডটি চলে গেলো ওয়েস্টকোটের তলায়, আর ওয়েস্টকোটের তলা থেকে 'লেখায় ভরা' প্যাডটি জড়ানো হতে লাগলো ঐ খবরের কাগজে)। শ্রীমতী ডিস ডেবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্যাডে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখুন। বোকা বনবেন না।' প্যাডের ওপরের পাতার একটা কোণ ছিঁড়ে প্যাডটিকে চিহ্নিত করা হলো, কিন্তু তাতে কিছু এলো গেলো না, কারণ আসল কাজটি আগেই করে ফেলা হয়েছিলো।"

সেই খবরের কাগজে জড়ানো প্যাডটির একদিক ধরলেন মার্শ, অন্যদিক যাতুকর হার্টজ্। আদালত ঘরে যেন একটি আলপিন পড়লেও শোনা যাবে। সেই নীরবতার বক্ষে সুড়সুড়ি দিয়ে লেখার খস্খস্ আওয়াজ শুরু হলো। তারপর খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে প্যাডটি বার করে শ্রীযুত মার্শ পরম বিস্ময়ে দেখলেন প্যাডটির পাতার পর পাতা লেখায় ভরে গেছে। অথচ একটু

আগে নিজেই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন প্যাডের সবগুলো পাতাই শাদা।

কিন্তু লেখার খস্‌খস্‌ আওয়াজটা কিভাবে হয়েছিল? যাদুকর হাটজ্‌ দেখালেন তাঁর তর্জনীর নখটি ছুঁচলো করে কাটা, এবং মাঝামাঝি ফাড়া। এ নখই কাগজের তলায় ঘসে ঘসে তিনি লেখার খস্‌খস্‌ আওয়াজের নকল করেছিলেন।

এই রকম আরো নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলে কোনো মনেই কোনো সংশয় রইলো না, কিন্তু শ্রীমতী ডিস ডেবারের অসামান্য ব্যক্তিত্বের এমনি যাদু যে একজন জুরী শেষ পর্যন্ত তাঁকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হলেও অনেকক্ষণ এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং তাঁকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করতে রাজী হয়েছিলেন শুধু একটি সর্তে: শ্রীমতীকে অনুকম্পার যোগ্যা বিবেচনা করে হাল্কা শাস্তি দিতে হবে। হাল্কা শাস্তিই দেওয়া হয়েছিলো—ছয় মাসের সরকারী আতিথ্য।

উত্তর দেশের যাদুকর

শহর—লণ্ডন। সাল···১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। ঋতু—গ্রীষ্মের শেষভাগ। ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা মহারানী ভিক্টোরিয়া। লাইসিআম (Lyceum) থিয়েটারে কিছুদিন ধরে চলছে একজন বিখ্যাত যাদুকরের যাদু প্রদর্শন। যাদু প্রদর্শনের বিজ্ঞাপিত মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, এমনি সময় দুটি মহিলার স্বাক্ষরিত একটি ছাঁপানো প্রচার-পত্র বহু সংখ্যায় বিতরিত হয়ে সারা শহরে সাড়া জাগালো। প্রচার-পত্রটির যথাসম্ভব হুবহু বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়:

"ইংলণ্ডের মহিলাদের প্রতি···

"লাইসিআম থিয়েটার থেকে সাবধান! প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের অদ্ভুত ব্যবহার। ভগিনীগণ, বড় দুঃখের সহিত আমরা একটি নালিশ জানাচ্ছি, আমরা দুজন দরিদ্র অসহায় বিধবা, আমাদের এই সাম্প্রতিক বৈধব্যের জন্যে দায়ী অদ্ভুত চরিত্রের মিস্টার অ্যাণ্ডারসন, লাইসিআমের শয়তান যাদুকর। আমাদের নাম শ্রীমতী মার্গারেট উইলসন এবং শ্রীমতী ডরোথি জোন্স্। আমাদের স্বামীর একজন ছিলেন দরজি, তাঁর নাম ছিলো মিস্টার উইল্সন, আরেকজন টিন প্লেটের কাজ করতেন, তাঁর নাম ছিলো মিস্টার জো । যাদুকরের খুব নামডাক শুনে গত সোমবার রাত্তিরে আমরা গেলাম লাইসিআম থিয়েটারে। আমাদের স্বামীরা মাথাপিছু দু শিলিং করে প্রবেশমূল্য দেবার পর আমরা ঢুকতে পেলাম। ভেতরে এতো ঠেলাঠেলি ভিড়, যে মাত্র তিন হপ্তা আগে বানানো আমাদের নতুন জামাকাপড়ের দফা প্রায় রফা হবার যোগাড়। যাহোক, অনেক হাঙ্গামা হুজ্জুত করে তো জায়গা দখল করে বসা গেলো। তারপর খেলা শুরু হলে যে সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগলাম তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।···অনেক বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে তারপর মিস্টার অ্যাণ্ডারসন (লোকটাকে 'প্রফেসর' অ্যাণ্ডারসন কেন বলা হয় জানি না) এক মস্ত ঝুড়ি এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটি ফুটফুটে ছোট্টো ছেলেকে টেবিলের ওপর বসিয়ে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর

বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে তিনি ঝুড়িটি তুলে নিতেই আমরা দেখলাম—কী সর্বনাশ! ছেলেটি বেমালুম উধাও! এর পরে আর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকেও যাদুকর বেমালুম উড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে আমাদের পতি দেবতারা—এঁরা দুজনেই যেমন গোঁয়ার তেমনি বোকা – জেদ ধরলেন স্টেজে উঠে গিয়ে দেখবেন যাদুকর ওঁদেরও উড়িয়ে দিতে পারেন কিনা। আমরা অনেক বোঝালাম, 'যেও না, গেলেই অনর্থ ঘটবে।' কিন্তু পুরুষ মানুষের গোঁ, অবলা নারীর সাধ্য কি তাতে বাধা দেয়? মিস্টার উইল্‌সন প্রথমে গেলেন, ঢাকা পড়লেন ঝুড়ির তলায়। যাদুকর ঝুড়ি তুললেন—মিস্টার উইল্‌সন হাওয়া! তারপর গেলেন মিসটার জোন্‌স্। তিনিও হাওয়া হয়ে গেলেন! আমরা দুজন অবলা স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রইলাম, কিন্তু স্বামীরা ফিরলেন না। খেলার শেষে হল্ ফাঁকা হয়ে যেতে লাগলো, আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের স্বামীরা তবু ফিরছেন না। ওঁরা বেরিয়ে গেছেন ভেবে বাইরে গিয়ে গরু খোঁজা খুঁজলাম। ওঁদের টিকিও দেখতে পেলাম না। বাড়ী ফিরে গেলাম, অপেক্ষা করে রইলাম সারারাত জেগে জেগে। বৃথা রাত জাগা। ফিরলেন না আমাদের স্বামীরা।

"পরদিন ভোরবেলা শয়তান যাদুকরের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টে বিকেলবেলা তাঁর দেখা পেলাম। বললাম, 'ফিরিয়ে দাও আমাদের স্বামীদের।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, দেখবোখন কি করা যায়।' দেখবোখন কি করা যায়! ততক্ষণ কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমরা খাই কি? শুনে মনিব্যাগ খুলে উনি আমাদের দুজনের হাতে এক পাউণ্ড করে দিলেন। সারা মঙ্গলবারটা কাটলো মহা উদ্বেগে, তারপর বুধবার বিকেলে গেলাম, যাদুকরের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করা গেলো না। বিষ্যুৎবার অনেক কষ্টে দেখা মিললো বটে, কিন্তু উনি বললেন, 'আমি বড় দুঃখিত, আপনাদের স্বামীরা দুজনেই এতো দূরে চলে গেছেন যে ওঁদের খুঁজে আনবার মতো সময় আমার নেই। এই ক্রীসমাসের মরশুমে কোভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে আমার নতুন যাদুপ্রদর্শন শুরু হবে, তারই তোড়জোড়ে আমি এখন বড়ো ব্যস্ত। অবশ্য পরে ফুরসৎ পেলেই আপনাদের স্বামীদের খোঁজ করবার চেষ্টা করবো। যতোদিন তাঁদের ফেরৎ না পান ততোদিন চুপচাপ থাকুন, এ নিয়ে সোরগোল করবেন না। এই চুপ করে থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে

হপ্তায় এক পাউণ্ড করে দেবো।' কি ধৃষ্টতা। স্বামীর বদলে হপ্তায় এক পাউণ্ড!

"ভগিনীগণ! আমরা বিচার চাই, স্বামীদের ফিরে পেতে চাই! গরিব অবলা নারী আমরা, আদালতে মোকদ্দমা করবার পয়সা আমাদের নেই। বিধবা না হয়েও আমরা বিধবার চাইতে বেশি অসহায়া। একজন সহৃদয় ছাপাখানার মালিক দয়াপরবশ হয়ে বিনামূল্যে আমাদের এই আবেদন-পত্র ছেপে দিয়েছেন। আশা করি অন্তত কয়েকজন সহৃদয়া ভগিনী আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন উকিলের বন্দোবস্ত করে দেবেন, যিনি আদালতে আমাদের হয়ে মোকদ্দমা লড়ে আমাদের সুরাহা করে দিতে পারবেন। আপনাদের কাছে এই আমাদের মর্মান্তিক প্রার্থনা। ইতি।

মার্গারেট উইল্‌সন, ৪৯, ফুলউড্‌স্ রেন্টস, হবার্ন্।
ডরোথি জোন্‌স্, ঐ (দোতলা)।

* * * *

প্রথমেই বলেছি, বহু সংখ্যায় প্রচারিত এই অ-সাধারণ ইস্তাহারটি সারা শহরে বেশ চমক এবং সাড়া জাগিয়েছিলো। যাদু প্রদর্শনের জগতে চমকদার বিজ্ঞাপনের (sensational publicity) এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। মজাদার এই আবেদন-পত্রটির খসড়া করেছিলেন স্বয়ং যাদুকর জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন, যিনি নিজেকে 'উত্তর দেশের যাদুকর' (Wizard of the North) বলে প্রচার করতে করতে ঐ উপনামেই বিখ্যাত হয়ে যান। প্রচারের মাহাত্ম্য তিনি বেশ ভালোই জানতেন, এবং পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করতে কখনো চেষ্টার ত্রুটি রাখতেন না। সাধারণ মামুলী ধরনের বিজ্ঞপ্তির চাইতে ঐ অভিনব চমক জাগানো আবেদন-পত্রের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপন যে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য। লাইসিআম থিয়েটারে প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের (নামের আগে এ ধরনের 'প্রফেসর' বসানোর রেয়াজটা নতুন নয়) যাদু প্রদর্শন দেখতে যাঁরা তখনো পর্যন্ত যান নি, এই বিচিত্র আবেদন-পত্রটি পড়ে তাঁদের অনেকেই গিয়েছিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছিলো যে কোভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে আসন্ন ক্রীসমাসে 'উত্তর দেশের যাদুকর'-এর নতুন যাদু প্রদর্শনের মরশুম শুরু হবে।

'উত্তর দেশের যাদুকর' উপনামে খ্যাত ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত

ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট, যাঁর বিখ্যাত্ত উপন্যাস "আইভান-হো"-র সঙ্গে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী"-র আশ্চর্য মিল আছে। স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের উত্তরে, এবং ওয়ালটার স্কট কথাসাহিত্যের 'যাত্বকর' লেখক, এই জন্যেই সাহিত্যামোদী মহলে তিনি 'উইজার্ড অভ্ দ্য নর্থ' উপনামে খ্যাত হয়েছিলেন। সম্ভবত স্কটের এই উপনামটি শুনেই পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এবং নিজেও উত্তর দেশের মানুষ এবং পেশায় যাত্বকর হওয়ায় অ্যাণ্ডারসন এটিকে আপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলতেন এই উপনামটি স্বয়ং স্যার ওয়াল্‌টার স্কট তাঁকে দিয়েছিলেন। অ্যাবট্‌স্ ফোর্ড শহরে যাত্বকর অ্যাণ্ডারসনের যাত্বর খেলা দেখে স্কট নাকি বলেছিলেন, "লোকে আমাকে বলে 'উত্তর দেশের যাত্বকর', কিন্তু মিস্‌টার অ্যাণ্ডারসন, আমার মনে হয় এই নামটি আপনার পক্ষেই বেশি উপযোগী। স্থতরাং আপনি এই নামই গ্রহণ করুন।"

এখানে বলে রাখা দরকার, অ্যাণ্ডারসনের উল্লেখযোগ্য যাত্ব প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৩৭ সালে, কিন্তু ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। তার আগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই স্কটের শরীর ও মন ত্বই-ই ভেঙে পড়েছিল। তাই মনে হয় ঔপন্যাসিক স্কট অ্যাণ্ডারসনকে 'উত্তর দেশের যাত্বকর' নাম দিয়েছিলেন একথা হয়তো ঠিক নয়। ঐ উপনামটুকু সম্ভবত নিজেই নিজেকে দিয়েছিলেন যাত্বকর অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু তাঁর বড় সাধের এই উপনামটির জন্যে তাঁকে কয়েকবার কি রকম বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল তাই বলছি। একবার স্কটল্যাণ্ডের এল্‌গিন শহরে বেশ সাফল্যের সঙ্গে যাত্ব প্রদর্শন করে তিনি গেলেন তার মাইল বারো দূরে ফরেস (Forres) নামে একটি ছোটো শহরে যাত্ব প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতে। ফরেসের অনতিদূরে ধূ ধূ করা নির্জন প্রান্তর, সেই প্রান্তরের নিরালাতেই ম্যাক্‌বেথ তিনটি রহস্যময়ী যাত্বকরী ডাইনীর দেখা পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি ছিলো। এই তিনটি ডাইনীর অশুভ প্রভাবের ফলেই বীর সেনাপতি ম্যাকবেথ তাঁর গৃহে অতিথি বৃদ্ধ রাজা ডানকানকে হত্যা করে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এবং পরে নিয়তির বিধানে এই পাপের শাস্তি হিসেবে তাঁকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল— যে কাহিনী শেক্সপিয়ারের "ম্যাকবেথ" নাটকে অমর হয়ে আছে। ঐ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার পর কেউ যাতায়াত করতে ভরসা পেতো না, এমন

কি দিন ত্বপুরেও ওপথে যেতে অনেক সাহসী মানুষেরও গা ছমছম করতো। ডাইনীদের যাত্বর পাল্লায় পড়েই ম্যাকবেথকে অমন শোচনীয় পরিণাম সইতে হয়েছিলো, সুতরাং ঐ প্রান্তরের আশেপাশের মানুষের মনে যাত্ববিদ্যা এবং যাত্বকরের সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

যাত্বকর অ্যাণ্ডারসন প্রথমেই ফরেস শহরের এক ছাপাখানায় গিয়ে তাঁর আসন্ন যাত্ব প্রদর্শনীর আগাম জানানি দেবার জন্যে হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দিলেন। তারপর ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কয়েকদিনের জন্যে কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়।" মালিক তাঁকে এক বিধবা ভদ্রমহিলার খোঁজ দিয়ে বললেন, "এঁর বাড়িতে খান ত্বয়েক ঘর খালি আছে। আপনি ভাড়া নিতে পারেন।"

অ্যাণ্ডারসন গেলেন, ঘর দেখলেন, পছন্দ হলো। বললেন, "সাত দিনের জন্যে ভাড়া নিলুম।"

বিধবা বাড়িওয়ালি বললেন, "কিছু মনে করবেন না, অনেক ঠকে ঠকে এখন আর ঠকবার সাধ নেই। আপনি দেখতে শুনতে খুবই ভদ্রলোক, তবু কথায় বলে সাবধানের মার নেই। অর্ধেক ভাড়া আগাম দিতে হবে।" অ্যাণ্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে আগাম টাকা দিয়ে দিলেন বাড়িওয়ালিকে। বুড়ি ভারি খুশি।

ঘর ভাড়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। অ্যাণ্ডারসন ভাবলেন একবার ছাপাখানায় গিয়ে দেখে আসা যাক হ্যাণ্ডবিল ছাপার কাজ ক'দূর এগুলো। বৃষ্টি হবার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বলে সঙ্গে ছাতা এনেছিলেন, কিন্তু এখন দেখলেন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতএব অনর্থক ছাতার বোঝা বইবেন কেন? বললেন, "আমার ছাতাটা আপনার কাছেই রাখুন, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।" বাড়িওয়ালির কাছে ছাতা রেখে তিনি চলে গেলেন ছাপাখানায়।

নগদ টাকা হাতে পেয়ে নতুন অতিথির ওপর বুড়ির মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অতিথি বেরিয়ে যাবার পর তাঁর ছাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি দেখলেন ছাতার হাতলের ওপর লেখা রয়েছে "Great wizard of the North"—অর্থাৎ "উত্তর দেশের মহা যাত্বকর!"

ছাপাখানা থেকে ফিরে এসে যাত্বকর দেখলেন বুড়ির হাবভাব একেবারে

বদ্‌লে গেছে। তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন ভদ্রমহিলা, আর নিজে আপাদমস্তক কাঁপছেন থর্‌থর্‌ করে, দুই চোখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

বিষম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি বললেন, "আপনি কে? কি করা হয় আপনার?"

বুড়ির ভয় দেখে একটু কৌতুক বোধ করে অ্যাণ্ডারসন হেসে বললেন, "আমি একজন ভয়ানক চরিত্রের লোক। আমাকে হয়তো আগে দেখেন নি কখনো, কিন্তু আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমার নাম অ্যাণ্ডারসন, 'উত্তর দেশের যাদুকর' বলে আমায় একডাকে সবাই চেনে।"

বিধবা বাড়িওয়ালি ভীষণ ভয় পেয়ে ছাতাটা যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "দয়া করে তাহলে শিগগির বেরিয়ে যান। আমার বাড়াতে যাদুকরকে ঠাঁই দিতে পারবো না। এই নিন আপনার টাকা। আর কখনো এ মুখো হবেন না।" বলে যাদুকরের দেওয়া টাকাগুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। পড়বার সময় একটা টুলে তাঁর মাথা ঠুকে গেলো, গায়ের ছাল উঠে গেলো খানিকটা। বুড়ির চিৎকার শুনে পাড়াপড়শিরা ছুটে এসে দেখেন বুড়ি অজ্ঞান হয়ে মরার মতো পড়ে আছেন। ফাটা মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। দেখে মেয়েরা চিৎকার করে উঠলেন, "লোকটা খুন করেছে বুড়িকে।" আর পুরুষরা পাকড়াও করলেন 'খুনী' যাদুকরকে।

এমনি সময় এলগিন শহরে যাবার ঘোড়ার গাড়ি এসে হাজির। গাড়োয়ান চিনতো যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে, অনেকবার তাঁর যাদুর খেলা দেখে দেখে তাঁর বেশ ভক্তও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কথা কে তখন শোনে? 'খুনী' লোকটাকে ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয় তারা।

অ্যাণ্ডারসন দেখলেন গতিক সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না; বুড়ি কি মরেই গেলো নাকি? বললেন, "আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে চলো।" মনে ভাবলেন ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে বলাই নিরাপদ।

কিন্তু মাইল সাতেকের মধ্যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। এই সন্ধ্যায় কে আবার হাঙ্গামা করে অতো মাইল দূরে যায়? সুতরাং দুজন পুলিশ কনস্টেবল ডেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে সে রাতটা বন্দী থাকবার জন্যে জেলখানার হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান অগত্যা

উত্তর দেশের যাদুকরকে না নিয়েই চলে গেলো এলাগিন শহরে সেই থিয়েটারে, যেখানে সেই সন্ধ্যাবেলায় যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যাদু প্রদর্শন হবার কথা। যাদু দর্শনার্থীরা হল্ ভর্তি করে ফেলেছে, আর সময় হয়ে গেছে অথচ যাদুকরের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না বলে অনেকে ক্ষেপে উঠেছেন। এমনি সময় সেই গাড়োয়ান গিয়ে খবর দিলো যাদুকর এক বুড়িকে খুন করে ফর্বস-এর জেল হাজতে বন্দী রয়েছেন, যাদুর জোরে সেখান থেকে বেরোতে পারেন নি।

বুড়িকে খুন করেছেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন! শুনে সারা হলময় একটা শিহরণের সাড়া জাগলো যেন। তারপর সবাই হৈ হৈ শুরু করে বললেন, "টিকিটের দাম ফেরৎ চাই।" নিশ্চয়, নিশ্চয়। এতো খুবই ন্যায্য কথা। দাম ফেরৎ দেওয়া হলো সবাইকে। এলগিন শহরে সে রাতে সবার মুখে এক কথা, 'যাদুকর অ্যাণ্ডারসন এক বুড়িকে খুন করে ফেলেছেন! কি আশ্চর্য! কি সর্বনাশ!"

খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এসে পড়লেন পরদিন ভোরবেলা। ততক্ষণে বুড়ি সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। তার মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট তাড়াতাড়ি হাজত থেকে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং অসুবিধার জন্য তাঁর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ খবরটা যথারীতি পৌঁছে গেলো এলগিন শহরে, আর এ-দ্বারা চমৎকার প্রচার বা 'পাবলিসিটি'র কাজ হলো যাদুকরের। অ্যাণ্ডারসন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তাঁর যাদু প্রদর্শনীতে ভিড় করতে লাগলো। ফলে যে ক'দিন তার এলগিন শহরে যাদু প্রদর্শন করার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দিন তাঁকে থাকতে হলো। সুতরাং বলা চলে এক রাত জেলখানায় হাজতবাস আপাত দুঃখকর হলেও যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে শাপে বর হয়েছিলো।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৮৪২ সালে। এর এগারো বছর বাদে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যে আরেকটি অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেটিও অনেকটা ঐ ধরনের। বলা যায় ট্র্যাজি-কমিক (tragi-comic), অর্থাৎ ব্যাপারটা প্রায় ট্র্যাজেডি হতে হতে শেষ পর্যন্ত কমেডিতে পরিণত হলো। সেই কাহিনীটি বলি।

মহারানী ভিক্টোরিয়া তখন স্কটল্যাণ্ডে বালমোরাল-র (Balmoral) প্রাসাদে অবস্থান করছেন। যাদুকর অ্যাণ্ডারসন পেলেন মহারানীর আমন্ত্রণ—প্রাসাদে একদিন যাদু প্রদর্শন করবার। অ্যাণ্ডারসন উঠলেন এসে মহারানীর

প্রাসাদের কাছাকাছি ক্রেইথি (Craithie) নামক জায়গায় একটি সরাইখানায়। সেখানে সে সময় অতিথিদের ভেতর ছিলেন একজন রসিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি অ্যাণ্ডারসনকে ছোটোবেলা থেকেই চিনতেন। সরাইখানার মালিক যে অত্যন্ত ভীতু, কুসংস্কারগ্রস্ত চরিত্রের লোক, তাও তাঁর জানা ছিল। তিনি ভাবলেন সরাইওয়ালাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একটু রগড় দেখা যাক।

"ওহে বাপু, নতুন অতিথিকে যে বড়ো আদর আপ্যায়ন করে ঠাঁই দিলে, জানো লোকটা কে?" দূর থেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের দিকে ইঙ্গিত করে রসিক বৃদ্ধ বললেন সরাইওয়ালাকে কানে কানে ফিস ফিস করে, অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে।

সরাইওয়ালা বললে, "আজ্ঞে না, কর্তা। কোনো বড়োলোক টড়োলোক হবেন, এদিকে বেড়াতে এসেছেন; ওঁর চেহারা আর সাজপোশাক দেখেই বুঝে নিয়েছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "ছাই বুঝেছো। ইনি একজন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন যাদুকর। উত্তর দেশের যাদুকরের নাম শোনো নি? ইনি সেই।"

শুনে পরম উদ্বিগ্ন হয়ে সরাইওয়ালা বললে, "যা—দু—ক—র! সত্যি সত্যি যাদু জানেন?"

রসিক বৃদ্ধ আরো গম্ভীর, আরো রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, "ভয়ানক সত্যি সত্যি। যাদুর জোরে তোমার পকেটের সব টাকা উনি নিজের পকেটে নিয়ে নিতে পারেন। তোমার সোনা রূপোর টাকা বা অন্য যা কিছু আছে, যাদুর ছোঁয়ায় সীসে বানিয়ে দিতে পারেন। তোমার রুমাল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে তোমার চোখের সামনে সেই ছাইকে আবার আস্তো রুমাল বানিয়ে দিতে পারেন। আরো যে কতো রকম অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারেন, তা তোমায় আর কি বলবো? তালা-চাবি বন্ধ করে এঁকে আটকে রাখা যায় না। বন্দুকের গুলি চালিয়ে এঁকে ঘায়েল করা যায় না, দাঁত দিয়ে কামড়ে ইনি গুলি ধরে ফেলেন।"

সর্বনাশ! তাহলে এখন উপায়? না জেনে এমন সাংঘাতিক লোককে আশ্রয় দিয়ে ফেলে তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে! ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো সরাইওয়ালা। কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে সে বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে যাদুকরকে পরম বিনীতভাবে অনুরোধ করলো তার সরাইখানা ছেড়ে যেতে। কিন্তু আশ্রয় নেবার মতো জায়গা কাছাকাছি আর কোথাও ছিলো না, তাই

অ্যাণ্ডারসন রাজী হলেন না সরাইখানা ছাড়তে। অথচ তাঁকে জোর করে তাড়াবার মতো সাহস বা ক্ষমতাও নেই সরাইওয়ালার। সে বেচারা এ ব্যবসায় যা কিছু পয়সা কামিয়েছিলো সব ধাতুর মুদ্রায় জমিয়ে রেখেছিলো তার ঘরেই। তার মনে হলো এই যাত্নকরটির সঙ্গে একই ছাতের তলায় যখন থাকতে হচ্ছে, তখন ঘরে ধাতুর মুদ্রা রাখা নিরাপদ নয়। তার সব টাকাগুলো থলিতে পুরে নিয়ে এক ফাঁকে ব্যাংকে চলে গিয়ে মুদ্রার বদলে কাগজের নোট নিয়ে এসে তার নিজের বিছানায় একটি বালিশের ভেতর সবগুলো নোট লুকিয়ে রেখে দিলো।

তারপর ঘটলো মজার ব্যাপার। সরাইখানায় অতিথির আধিক্য ঘটলো। সরাইখানার পরিচারিকা একজন নতুন অতিথিকে দেবার জন্য সরাইওয়ালার বিছানা থেকে একটি বালিশ নিয়ে গেলো সরাইওয়ালার অজানিতেই। বিধাতার ছিলো রগড়ের মতলব, তাই পরিচারিকার হাতে ঠিক সেই বালিশটিই গেলো যার ভেতরে ছিলো সরাইওয়ালার জীবনের সঞ্চয়—সব নোটের টাকায়। রাতে শুতে এসে বিছানার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো সরাইওয়ালা। একটা বালিশ নেই, আর সেই বালিশেই লুকানো তার সমস্ত টাকা। এ নিশ্চয় সেই সর্বনেশে যাত্নকরের কাজ। নিশ্চয় সেই লোকটাই যাত্নর জোরে টাকাওয়ালা বালিশটি সরিয়েছে!

এতোগুলো টাকার শোক সোজা নয়। সেই শোকে ভয় ভুলে গিয়ে শাসাতে লাগলো যাত্নকরকে—"শিগগির আমার বালিশ বার করুন মশাই, নইলে আমি পুলিশ ডাকবো।" খবর পেয়ে ছুটে এলো পরিচারিকা, সেই বালিশটি নিয়ে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, সব টাকাই পাওয়া গেলো বালিশের ভেতর। তখন শুরু হলো সরাইওয়ালার ক্ষমা চাওয়ার পালা। হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করেও দিলেন যাত্নকর অ্যাণ্ডারসন।

এবারে শোনাই "উত্তর দেশের যাত্নকর"-এর মার্কিন অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি যখন তাঁর যাত্ন প্রদর্শনী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম গেলেন, তখন সেখানে ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর প্রচণ্ড মতভেদ এবং সংঘর্ষ চলেছে। উত্তুরেরা দাবী করছে, "ক্রীতদাস প্রথার অবসান হোক"; আর দক্ষিণেরা তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে, জোর গলায় বলছে, "ক্রীতদাস প্রথা আলবৎ চালু থাকবে। ক্রীতদাস প্রথা যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আইন করে লোপ করে দেওয়া হয় তা হলে আমরা উত্তরীদের সঙ্গে

এক রাষ্ট্রে থাকবো না, আমরা দক্ষিণীরা দক্ষিণে রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে আলাদা যুক্তরাষ্ট্র করবো।" রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার এই সর্বনেশে দক্ষিণী সংকল্পে তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। এর ফলে যদি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তবুও গৃহযুদ্ধের আশু অকল্যাণ এড়াবার জন্যে তিনি দেশ বিভাগের চরম অকল্যাণ কিছুতেই মেনে নেবেন না। স্বদেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের এই অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে দাস-প্রথা-অবসান-বিরোধী দক্ষিণেরা আরো ক্ষেপে উঠলো। সংঘর্ষ বাধল উত্তরে দক্ষিণে।

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতরেই—কি ছিলো বিধাতার মনে!—যাদু প্রদর্শনের মতলবে যাদুকর অ্যাণ্ডারসন প্রথম দর্শন দিলেন মার্কিন দেশে। অ্যাণ্ডারসনের ম্যানেজার সাটন চলে গেলেন ভার্জিনিয়ায়, আগাম প্রচারের ব্যবস্থা করবার জন্য। (ভার্জিনিয়া দক্ষিণেদের এলাকা, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।) বিরাট বিরাট পোস্টার তৈরি করিয়েছিলেন সাটন। পোস্টারের বুকে বড়ো বড়ো হরফে লেখা: "Wizard of the North" (উত্তর দেশের যাদুকর) আর তার ওপর যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের মুখের মস্ত ছবি। পোস্টারে ঘোষণা ছিলো, "উত্তর দেশের যাদুকর" শিগগিরই ভার্জিনিয়ায় আসছেন তাঁর অসাধারণ অতুলনীয় অননুকরণীয় যাদুর খেলা দেখাতে। ভালো জায়গা বেছে বেছে সাটনের ভাড়া করা লোকেরা এই পোস্টার লাগাতে লাগলো। দক্ষিণেদের মেজাজ তো এমনিতেই মহা খাপ্পা হয়ে ছিলো। এই পোস্টার দেখে সে মেজাজ আরও খাপ্পা হয়ে উঠলো। "উত্তুরে" যাদুকরের এতো বড়ো আস্পর্ধা, দক্ষিণ এলাকায় এসে 'অতুলনীয়' ভেলকি দেখাবে বলে দক্ষিণের দেয়ালে দেয়ালে নিজের ঢাক পিটছে! দক্ষিণেরা বিষম ক্ষেপে উঠে সবগুলো পোস্টার ছিঁড়ে ফেললো, পোস্টার লাগানেওয়ালা লোকগুলোকে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে তাড়িয়ে দিলো, আর উত্তর দেশের যাদুকরের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে (পোস্টার থেকে অবশ্য) তাই নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যে ভাবে চেঁচালো তা থেকে আন্দাজ করা শক্ত ছিলো না যাদুকরকে হাতের সামনে পেলে ওরা কি করতো। যাদুকরের ম্যানেজার সাটন অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন।...

যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক বিচিত্র কাহিনী আছে। তাই থেকে বেছে কয়েকটি কাহিনী বললাম।

হল ভর্তি লোক ক্ষেপে আগুন। সাড়ে সাতটা বাজতে চললো, এখনো পর্দা উঠছে না। অথচ ঠিক সন্ধ্যা ছটায় ম্যাজিক শুরু হবার কথা.

ম্যাজিক যিনি দেখাবেন, চারদিকে তাঁর ম্যাজিকের খ্যাতি। অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে তিনি অনেককে তাক লাগিয়েছেন। তার ওপর আজ তিনি নাকি কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন 'যুগান্তকারী' খেলা দেখাবেন, যার জুড়ি নেই। এই 'যুগান্তকারী' খেলা দেখে অবাক হবার লোভে লোভেই ভিড় হয়েছে অসম্ভব। হলের ভেতর আর তিল ধারণের জায়গা নেই, টিকিট না পেয়ে অনেকে হায় হায় করতে করতে ফিরে গেছেন।

সমবেত জনতার উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছোবার উপক্রম, এমন সময় ঘণ্টা পড়ল ঢং করে। ওপরে উঠে গেলো স্টেজের পর্দা, দেখা গেলো হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন 'ম্যাজিশিয়ান'। খাশ্চর্য তাঁর বেহায়াপনা। বিজ্ঞাপিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে এসে হাজির হয়েছেন, এতে এক ফোঁটা লজ্জা হওয়া দূরের কথা, তিনি নমস্কার জানিয়ে অম্লান বদনে ঘোষণা করলেন, এইবার খেলা আরম্ভ হচ্ছে।

একদল ক্রুদ্ধ দর্শক দাবি করলেন, তিনি যে এতোগুলো লোককে ঘণ্টা দেড়েক বসিয়ে রেখেছেন তার কৈফিয়ত চাই। ছটায় খেলা শুরু হবার কথা, তিনি সাড়ে সাতটায় এসে হাজির হলেন কোন আক্কেলে?

ম্যাজিশিয়ান তাঁর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "মাপ করবেন। আপনারা বোধ হয় একটু ভুল করছেন। দয়া করে যাঁর যাঁর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাবেন কি?"

যাঁদের যাঁদের হাতঘড়ি ছিলো—অনেকেরই ছিলো—তাঁরা তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা হল জুড়ে বিস্ময়ের একটা বিপুল স্রোত বয়ে গেলো। প্রত্যেকেরই ঘড়িতে তখন ছটা।

এতক্ষণ পর্যন্ত যাঁরা ম্যাজিশিয়ানের ওপর ক্ষেপে আগুন হয়েছিলেন, এইবারে তাঁরা তাঁর এই অদ্ভুত যাত্ন দেখে বিস্ময়ে গলে জল হয়ে গেলেন।

ম্যাজিশিয়ান আবার অমায়িক হাসি হাসলেন। বললেন, "এই হলো আমার প্রথম খেলা।"

ম্যাজিক সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা হবে সেখানে এ গল্পটি কোনো না কোনো রকমে শোনা যাবেই, এ প্রায় অবধারিত। এ গল্প আমি যে কতোবার কতো-মুখে শুনেছি তার হিসেব নেই। গল্পটির মূল কাঠামোটুকুকে বিভিন্ন বক্তা নিজের খেয়ালখুশি এবং সাধ্যমতো শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত করবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তাকে চেপে ধরলে দেখা যায় খেলাটি তিনি ঠিক নিজে দেখেন নি, দেখেছিলেন তাঁর পিসেমশায়ের জ্যাঠামশায়, মেজোকাকার মামাশ্বশুর, অথবা এমনি অপর কেউ, যাকে বলা চলে 'বিশ্বস্ত সূত্র'। দু-চারজন অবশ্য বলেন, "হ্যাঁ মশাই, এ আমার নিজের চোখে দেখা।" কিন্তু যে ভাবে বলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় কথাটা নিজেকেও বিশ্বাস করাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি।

আমি বাল্যকাল থেকেই ম্যাজিকের ভক্ত। দেশী বিদেশী অনেক যাদুকরের যাদুর খেলা দেখেছি, কিন্তু এই আশ্চর্য খেলাটি দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হয় নি। সত্যি সত্যি কারও কখনও হয়েছে বা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে।

বক্তাভেদে এ গল্পটির স্থান, কাল ও পাত্র ভেদ হয়ে থাকে। এদেশে এই গুজবটি শুরু হয়েছিলো মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটন (Howard Thurston) সম্বন্ধে। থার্সটন তাঁর বিরাট যাদু-প্রদর্শনী নিয়ে ভারতে এসেছিলেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি যে অসামান্য খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং অর্থলাভ করেছিলেন তা-ই তাঁর ভবিষ্যৎ অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিলো। পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে খ্যাত হয়ে যাদু-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তাঁর যাদু-জীবন সম্বন্ধে যে বইখানা লিখে গেছেন তাতে তাঁর ভারত বিজয়ের বিচিত্র বিবরণ বেশ রং চড়িয়েই লিখেছেন কিন্তু এই ঘড়ির খেলাটির কোনো উল্লেখই তাতে নেই। এমন একটি আশ্চর্য খেলা সত্যিই তিনি দেখিয়ে গিয়ে থাকলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকবার মতো বিনয়ী আত্মজীবনী-লেখক তিনি ছিলেন না।

থার্সটনের পরে এ কাহিনী আরো যে সব যাদুকরের সম্বন্ধে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে আছেন গণপতি, রাজা বোস, 'রয় দি মিস্টিক' এবং পি. সি. সরকার।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হয়ে থাকে, তাই নিয়েও নানারকম জল্পনা-কল্পনা শোনা যায়। কেউ বলেন ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, গণ-সম্মোহন, যাকে ইংরেজীতে বলা যায় 'মাস হিপনোটিজম্' (mass hypnotism)।

হলসুদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে এমন ভাবে সম্মোহিত অর্থাৎ 'হিপনো-টাইজ' করা হয় যে সবাই হাতঘড়ির সাড়ে সাতটাকেই ভুল করে ছটা দেখেন, অথবা মোটেই দেরি না হলেও ভুল করে ভাবেন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ব্যাপারটার আরেক রকম ব্যাখ্যা একদিন শুনেছিলাম এক ভদ্রলোকের মুখে। তিনি বলেছিলেন, "এ হলো আসলে ভয়ানক শক্তিশালী চুম্বকের ব্যাপার, ভেরি পাওয়ারফুল ম্যাগনেট, বুঝলেন না? ঐ জোবালো এক চুম্বকের হুকুমের চাকর হলের ভেতরকার সবগুলো ঘড়ির কাঁটা; চুম্বকটি যেমন ঘোরাবেন, হলের ভেতরকার সবগুলো ঘড়ির কাঁটা ঠিক তেমনি ঘুরবে, একচুল এদিক-ওদিক নেই। একজন ড্রিল মাস্টার মাঠ-ভর্তি ডজন ডজন লোককে একসঙ্গে ড্রিল করায় দেখেন নি? তেমনি ঐ একটি চুম্বক কায়দা মাফিক ঘুরিয়ে হলের সবগুলো ঘড়িতে ছটা বাজিয়ে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানের কাছে ছেলেখেলা, যাকে বলে চাইল্ডস্ প্লে।"

এর চাইতে বিস্তারিত ব্যাখ্যার আসরে ভদ্রলোককে নামাতে পারি নি। তিনি বলেছিলেন, "রহস্যটা হচ্ছে চুম্বক, এই আন্দাজটুকুই আপনাকে বলে দিলাম। কি সাইজের চুম্বক, কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় রেখে কিভাবে ঘোরাতে হবে, সারা হলময় চুম্বকী আকর্ষণের তরঙ্গ কিভাবে প্রবাহিত করে দিতে হবে, অতো জানলে তো নিজেই ম্যাজিশিয়ান হয়ে বসতুম।"

ম্যাজিকের গল্পসাহিত্যে এই আশ্চর্য খেলার গল্পটি প্রায় স্থায়ী-সম্পদে অর্থাৎ 'ক্লাসিক'-এ দাঁড়িয়ে গেছে। এর কারণ তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে আমরা নিজেরা যেমন বিস্মিত হতে ভালোবাসি, তেমনি ভালোবাসি অপরকে বিস্মিত করতে। ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগানো সাধনা-সাপেক্ষ, প্রতিভা-সাপেক্ষ। জলের মতো তা সহজ নয়। তার চাইতে সহজতর পন্থা হচ্ছে ম্যাজিকের গল্প বলে তাক লাগানো। এই তাক লাগানোর উদ্দাম আগ্রহ থেকেই আসে পরের মুখে শোনা কাহিনীকে নিজের চোখে দেখা সত্য ঘটনা বলে চালাবার দুরন্ত লোভ; আর লোভ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আসে অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি।

এই যে তাক লাগাবার লোভ, এর আরেকটি উদাহরণ রূপে আরেকটি গল্প বলি, গল্পটি যাঁর মুখে শুনেছিলাম যথাসম্ভব তাঁরই জবানীতে।

"রেল স্টেশনের ধারে ছোট্ট এক রেস্তোরাঁয় বসে আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে চা খাচ্ছিলাম। আর এমনি আশ্চর্য যোগাযোগ, দেখি আমাদের ওপাশের টেবিলে দুজন বন্ধু নিয়ে বসে আছেন যাদুকর সরকার। আমাদের ভেতর একজনের যাদুকরের সঙ্গে অল্প আলাপ ছিলো। আমরা তাকে দিয়েই যাদুকর সরকারকে ধরলাম—যাদুর খেলা দেখাবার জন্য। ঠিক তখন—এও আবেক আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে পারেন!—রেস্তোরাঁর পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে দুজন দুধওয়ালা, মাথায় দুধের ড্রাম নিয়ে! ড্রামের ভেতর দুধে ডোবানো রয়েছে খড়, যাতে তাদের চলার তালে তালে ড্রামের দুধ ছলকে উঠে বাইরে না পড়ে। যাদুকর তাদের ডেকে বললেন, কিছু দুধ দিয়ে যেতে। ওরা বললে, 'কর্তা মাপ করবেন। এ দুধ বায়না করা। এ থেকে এক ফোঁটা দেবার উপায় নেই।' বলে চলে যেতে লাগলো। যাদুকরের দিকে তাকিয়ে আমাদের সেই বন্ধুটি একটু হাসলেন, যাদুকরের যাদু হুকুমকে এতোটুকু পরোয়া না করে দুধওয়ালা অনায়াসে চলে যেতে পারলো দেখে যাদুকরও হাসলেন। ভাবটা যেন 'দেখুন না মজাটা! ওরা ফিরে এলো বলে।'...একটু পরেই লোক দুটো ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে যাদুকরের কাছে কেঁদে বললে, 'এ আপনি কি করলেন কর্তা? অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা চাইছি, আমাদের দুধ আপনি ফিরিয়ে দিন। আপনার কতোটা লাগবে বলুন দিয়ে যাচ্ছি।' চেয়ে দেখি দুটি ড্রামই যাদুকরের মন্ত্রবলে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে; এক ফোঁটা দুধ নেই, পড়ে আছে শুধু খড়! আশ্চর্য কাণ্ড! কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো এতোটা দুধ?..."

গল্পটি এই পর্যন্ত শুনে আমি বললাম, "তারপর?"

তিনি বললেন, "যাদুকরের আদেশে দুজন দুধওয়ালা দুটো ড্রাম মাথায় নিয়ে রওনা হলো। যাদুকর কি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন জানি না, ওরা একটু দূরে যেতে না যেতেই দেখা গেলো দুটি ড্রামই আবার প্রায় কাণায় কাণায় দুধে ভরে উঠেছে।"

আমি বললাম, "এতো রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার—মিরাক্‌ল্। এ ঘটনা কি সত্যি? আপনি কি নিজে—"

ভদ্রলোক বললেন, "তা না হলে আর বলছি কি আপনাকে? এ আমার পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়, নিজের চোখে দেখা।"

আমি যতোই তাঁর এই কাহিনীকে অলীক অবাস্তব বলে বাতিল করে দিতে চাইলাম, ততোই তিনি জোর গলায় বলতে লাগলেন, "আরে রাম রাম এযে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা।'

এ কাহিনী যাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম পবিত্রবাবু। তিনি প্রবীণ এবং ধীরস্থির দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রলোক তিনি রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েই এ কাহিনী আমাকে শুনিয়ে-ছিলেন, তামাশার ছলে বা ধাপ্পা দিয়ে নয়। বলা বাহুল্য ভদ্রলোকের এ কাহিনী আমি অবিশ্বাস্য বলে মনে করে আষাঢ়ে গল্পের পর্যায়েই ফেলি। তবে কি তিনি মিথ্যাবাদী? না, অত সহজ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চলে না। অন্যভাবে কি করে ব্যাখ্যা করা যায় ভেবে দেখা যাক। যাদুকর সরকার যে সব যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে একটি ছোট অথচ চমৎকার খেলা হচ্ছে পুরো দুধ ভর্তি বেশ বড় [illegible] কাচের 'জাগ' (jug) থেকে সবটা দুধ যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দেওয়া। এ খেলায় যাদুকর সকলের চোখের সামনে চৌকো একটুকরো কাগজ দেখিয়ে তাই দিয়ে একটা ঠোঙার মতো (cone) তৈরি করেন, তারপর কাঁচের জাগ থেকে সবার চোখের সামনে প্রায় সমস্তটা দুধ—কমপক্ষে সেরখানেক তো হবেই—ঐ ঠোঙার মধ্যে ঢেলে দেন। জাগটা সবার চোখের সামনে খালি হয়ে যায় সবটা দুধ নিঃসন্দেহে আশ্রয় পায় ঐ কাগজের ঠোঙার ভেতর। ঠোঙার কোণ ধরে ভেতরের দুধটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করেন যাদুকর। চমকে ওঠেন দর্শকবৃন্দ, এই বুঝি দুধটা তাঁদের গায়ে এসে পড়ে!। কিন্তু কোথায় দুধ? ঠোঙা খুলে গিয়ে দেখা গেলো যাদুকরের হাতে রয়েছে সেই চৌকো একটুকরো কাগজমাত্র, সম্পূর্ণ শুকনো, এক ফোঁটা দুধের চিহ্ন নেই তাতে। একি আশ্চর্য ভুতুড়ে কাণ্ড। এমন অসম্ভব কি করে সম্ভব হলো?

যাদুকর সরকারের এই চমৎকার খেলাটি অনেকেই দেখে থাকবেন। তাঁদের ভেতর একজন হয়তো কোথাও কথা-প্রসঙ্গে খেলাটি বর্ণনা করেছিলেন। খেলাটি তাঁর ভালো লেগেছিলো, সুতরাং বর্ণনায় একটু অতিরঞ্জন অর্থাৎ রং-চড়ানো স্বাভাবিক। তাঁর কাছে যিনি খেলাটির রং-চড়ানো বর্ণনা শুনেছিলেন তিনি অপরকে শোনাবার সময় আরেকটু রং চড়িয়েছিলেন, হয়তো প্রমাণ সাইজের দুধের 'জাগ'টি তাঁর বর্ণনায় 'ইয়া পেল্লায়' এক জাগে পরিণত হয়েছিল। এ ভাবে এ খেলার গল্প এক কান থেকে অন্য কানে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত যখন পবিত্র-

বাবুর কানে এসে পৌঁছেছিলো তখন মূল গল্পের জাগটা হয়তো বড় হতে হতে ড্রামে পরিণত হয়েছে এবং মূল গল্পের ঘরোয়া আসর বা থিয়েটার হল পরিণত হয়েছে রেল স্টেশনের ধারে একটি রেস্তোরাঁয়। অথবা ঐ ড্রাম এবং রেল স্টেশনের ধারে রেস্তোরাঁর পরিবেশ পবিত্রবাবুর নিজস্ব সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে যাদুকর জাগ থেকে দুধ ওড়াতে পারেন, তিনি ড্রাম থেকেই বা পারবেন না কেন? এবং বাড়ীতে বা থিয়েটার হলে যা করতে পেরেছেন, স্টেশনের ধারে রেস্তোরাঁতেও নিশ্চয়ই তা করতে পারবেন। সুতরাং সত্যের মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে বাইরের বাহার একটু বাড়ালে ক্ষতি কি? পবিত্রবাবু হয়তো এও ভেবেছিলেন যে ব্যাপারটা তিনি ঠিক নিজের চোখে না দেখলেও এমন 'পরম বিশ্বস্তসূত্রে' যা শুনেছেন তা নিশ্চয় সত্যি, সুতরাং এ তো একরকম নিজের চোখে দেখারই সামিল। বিবেককে বুঝ দেবার জন্যে বলেছিলেন, 'ওহে, নিজের চোখে দেখার সামিল আর নিজের চোখে দেখা একই জিনিষ। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।' আর আমি সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমাকে বলেছিলেন "আরে রাম রাম, এ যে আমার নিজের চোখে দেখা।"

ইংরাজিতে একটা কথা আছে "The will to believe ultimately becomes belief itself" অর্থাৎ "কোনো কিছু বিশ্বাস করবার প্রবল ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসে পরিণত হয়।" পবিত্রবাবুর ক্ষেত্রে সম্ভবত তাই হয়েছিলো, যেমন অনেকেরই ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যাদুকর পি. সি. সরকার সম্বন্ধে এই ধরনের একাধিক অতিরঞ্জিত কাহিনী বা আষাঢ়ে গল্প প্রচলিত আছে। জীবিতাবস্থাতেই এই ধরনের কিম্বদন্তীর বিষয় হওয়া (যাকে আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রভাষায় বলে "a legend in one's life time") অসামান্য জনপ্রিয়তারই পরিচয়।

এই ধরনের অতিরঞ্জন প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর চার্লস বারট্রাম Charles Bertram)—ব্যক্তিগত জীবনে জেম্‌স্ ব্যাসেট (James Bassett)—তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি মজার গল্প বলেছেন। যথাসম্ভব বারট্রামের নিজের জবানীতেই বলি:

"মাঝে মাঝে দর্শকদের ভেতর এমন বদ লোকও দেখা যায়, যিনি যাদুকরকে জব্দ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তেমনি আবার এমন সহৃদয় দর্শকও অনেক

দেখা যায় যাঁরা তাঁদের প্রিয় যাদুকরের বাহাদুরি বাড়াবার জন্য তাঁর যাদুর খেলার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অতি ভক্তদের সহৃদয়তা মাঝে মাঝে যাদুকরকে কি বিপদে ফেলে তার একটি উদাহরণ দিই। আমার একটি খেলায় দর্শকরা দেখেন আমি আমার সরু যাদুদণ্ড (magic wand) থেকে একটি বল বার করি; সেই একটি বল দুটিতে, এবং দুটি বল তিনটিতে পরিণত হয়। তারপর তিনটি বল কমতে কমতে একটি হয়; সেই একটির রং বদলে যায়, তারপর বলটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এ খেলায় প্রথম বলটি আমার হাতের তালুতে লুকানো থাকে, সেটাকেই যাদুলাঠির ডগা থেকে বার করবার ভান করি। বাকি দুটি বল সুযোগমতো দর্শকদের অলক্ষ্যে পকেট থেকে নিয়ে নিই।'

"একদিন সান্ধ্য প্রদর্শনীতে এ খেলাটি দেখিয়ে সে রাতের জন্য হোটেলে ফিরলাম। কফি-রুমে ঢুকে দেখি আমার দিকে পেছন ফিরে দুজন ভদ্রলোক গল্প করছেন আমারই সম্বন্ধে। একজন আমার এই খেলাটি স্বচক্ষে দেখার বিবরণ গদগদ কণ্ঠে অন্যজনকে শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন 'এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। বারট্রাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, জামার দুটো হাতাই একেবারে কনুইর ওপরে গুটানো। এইভাবে সামনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। পরিষ্কার দেখা গেলো দুহাতই সম্পূর্ণ খালি। এক হাতে যাদুলাঠিটা নিয়ে তার ডগা দিয়ে অন্য হাতের তালুতে এইভাবে কিছুক্ষণ সুড়সুড়ি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো যেন তাঁর হাতের তালুর ভেতর থেকে একটা সাদা বল বেরিয়ে এলো। সেটা টেবিলের ওপর রেখে হাতের তালুতে আবার সুড়সুড়ি দিতেই একটি লাল বল বেরিয়ে এলো। এইভাবে ঐ এক হাতের তালু থেকে একটির পর একটি বল বার করে তিনি টেবিল ভরে ফেললেন।' শুনে আমি আর সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না, পাছে আমায় চিনতে পেরে ভদ্রলোক আমাকে বলে বসেন, 'এই যে মিঃ বারট্রাম। আপনার বলের খেলাটা এঁর সামনে একবার দেখিয়ে প্রমাণ করে দিন তো আমি মিছে কথা বলি নি।'..."

এ ব্যাপারটি ঘটেছিলো উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির কাছাকাছি। তার কয়েক বছর পরে ১৯০৭ সালে চার্লস বারট্রামের মৃত্যু হয়।

যাদুকর গণপতির প্রিয় শিষ্য স্বনামধন্য যাদুকর "দেবকুমার" (দেবকুমার

ঘোষাল) জালন্ধরে নাজ সিনেমা হলে তিন সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শন করেছিলেন ১৯৫৭ সালে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, দেবকুমারের যাদু বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। পথে ঘাটে তাঁর যাদু-ক্ষমতা সম্পর্কে যে সব আজগুবি গল্প চলতো তার একটি নমুনা শুনেছি দেবকুমারেরই মুখে। শেষ প্রদর্শনীর পর জালন্ধর থেকে ট্রেনে ফিরে আসছেন যাদুকর দেবকুমার এবং তাঁর 'ইম্‌প্রেসারিও' (Impresario) অর্থাৎ প্রদর্শনী-উদ্যোক্তা। তাঁদের মুখোমুখি বসে নিজেদের ভেতর আলোচনা করছিলেন দুজন হিন্দী-ভাষী ভদ্রলোক। দেবকুমার তখন সাধারণ বেশে, তাঁকে যাদুকর দেবকুমার বলে ওঁরা কেউ চিনতে পারেন নি। তাঁদের ভেতর যে কথোপকথন চলছিল তার বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায়:—

"আরে ভাই, বাংলা মুল্লুক থেকে যে দেবকুমার যাদুকর এসেছেন, ওঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। জিন, ব্রহ্মদত্যি—এসব নিশ্চয় ওঁর হাতের মুঠোয়। কাল রাতে যা কাণ্ড হলো, বড় তাজ্জব।"

"কি কাণ্ড হলো কাল রাতে ?"

"আমি আর আমার বিবি পাশাপাশি বসে দেখছি দেবকুমারের যাদুর খেলা, নাজ সিনেমায়। বিবির কোলে আমাদের পাঁচ বছরের ছোট্ট বাচ্চা। দেবকুমারজি করলেন কি, আমার বিবির কোল থেকে বাচ্চাটাকে বেমালুম উড়িয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে দিলেন।"

"কি তাজ্জব! এতো বড়ো ভয়ানক কথা। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা গায়েব হয়ে গেলো ?"

"বিলকুল গায়েব হয়ে গেলো।"

"আর পাত্তা মিললো না ?"

"মিললো বই কি ? সেও আরেক তাজ্জব। দেবকুমারজির এক ফুসমন্তর, ব্যাস মা'র ছেলে ফের মায়ের কোলে।"

এই কথোপকথন শুনে যাদুকর দেবকুমারের মনের অবস্থাটা হলো অনেকটা পূর্ববর্তী কাহিনীর যাদুকর বারট্রামের মতো। তিনি ভাবলেন, ভাগ্যিস জালন্ধরের খেলা শেষ হয়ে গেছে, নইলে উক্ত কথোপকথনের দু নম্বর ভদ্রলোক যদি তাঁর বিবি আর বাচ্চা নিয়ে যেতেন যাদুকরের যাদু-ক্ষমতা নিজে বাজিয়ে দেখতে, তাহলেই হয়েছিলো আর কি!

আসল ব্যাপারটা যা ঘটেছিলো (অথবা যাদুকর দেবকুমার ঘটিয়েছিলেন) তা দেবকুমারের নিজের কথাতেই বলি। তিনি বলেছেন :

"স্টেজে দেখাচ্ছিলাম ব্ল্যাক আর্টের খেলা। প্রেক্ষাগৃহের সামনের দিকের এক সারিতে এক মহিলা, তাঁর কোলে বসে তাঁর ছোট্ট ছেলেটি। ছেলেটিকে আমি স্টেজের ওপর এনে ব্ল্যাক আর্টের কৌশলে অদৃশ্য করে পরে আবার দৃশ্য করে ভদ্রমহিলার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। খেলাটি দেখে অন্যান্য অনেকের মতো—ব্ল্যাক আর্টের কৌশল যাঁদের জানা ছিলো না—ছেলেটির বাবা ভদ্রলোক খুবই অবাক হয়েছিলেন। বন্ধুকে গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি—হয়তো অবচেতন মনে ইচ্ছে করেই—খেয়াল করেন নি যে মার কোল থেকে উড়িয়ে দেওয়া আর সেই ছেলেকে স্টেজে তুলে এনে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই এক কথা নয়; ঐ একটুখানি তফাতেই অনেকখানি তফাৎ, অসম্ভব আর সম্ভবের তফাৎ।"

এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে সেই মহাবিখ্যাত এবং মহা-অসম্ভব ঘড়ির খেলা, যার কথা প্রথমেই বলেছি। এই খেলাটি সম্বন্ধে যাদুকর দেবকুমার তাঁর যাদুগুরু গণপতিকে প্রশ্ন করে জেনেছিলেন, অমন খেলা গণপতি কখনো দেখান নি, এবং হলসুদ্ধ সবাই নিজ নিজ আসনে বসেই দেখবেন তাঁদের সবার হাত-ঘড়ির (বা পকেট ঘড়ির) সময় বদলে গেছে, অমন যাদুর খেলা দেখানো কোনো যাদুকরের পক্ষে সম্ভব বলেও তিনি মনে করতেন না। যাদুকর কর্তৃক হলসুদ্ধ সকলের ঘড়ির সময় একসঙ্গে বদলে দেওয়ার গুজবটা যে মূল খেলা থেকে মুখে মুখে অতিরঞ্জনের সূত্রে চালু হয়েছে, সে খেলায় হয়তো যাদুকর দর্শকদের ভেতর থেকে কাউকে 'স্টেজের ওপর ডেকে এনে' সম্মোহন, চুম্বক বা অন্য কোনো বস্তু বা কৌশলের সাহায্যে তাঁর ঘড়ির সময় বদলে দিয়েছিলেন (অথবা তাঁকে চোখে ভুল দেখিয়েছিলেন)। বিভিন্ন দর্শক (১) আলাদা আলাদা ভাবে এবং (২) স্টেজের ওপরে উঠে, নিজের ঘড়ির সময় পরিবর্তিত দেখা এবং প্রেক্ষাগৃহে স্টেজ থেকে দূরে যে যার নিজের আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় একই সঙ্গে বিভিন্ন দর্শকের ঘড়িতে সময় বদলে যাওয়া যে এক কথা নয়, গুজব বিলাসীদের এই সোজা কথাটা খেয়াল থাকে না।

যাদুকরদের যাদু সম্বন্ধে গুজব রটবেই, নানা রকমের আষাঢ়ে গল্পও চালু হবে, চালু থাকবে। এর একটি কারণ আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং স্মৃতিশক্তির

দুর্বলতা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে যাদুখেলার বেলায়) ভুল দেখি, যা দেখি তাও ঠিক মতো মনে রাখতে এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করতে পারি না ; পারম্পর্য ভুল করি, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাই। এর ওপর আছে আমাদের স্বাভাবিক অতিরঞ্জন-প্রিয়তা। আমরা সবাই অল্পবিস্তর সৃষ্টিধর্মী, তাই যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটি না বলে তার ওপর—অনেক সময় নিজের অজ্ঞাত-সারেই—রং চড়িয়ে বসি।

এবারে একজন পশ্চিম ভারতীয় যাদুকরের মুখ থেকে শোনা একটি 'সত্য কাহিনী' বলে এখনকার মতো আষাঢ়ে গল্পের প্রসঙ্গ শেষ করি।

ব্রিটিশ আমল। যুক্তপ্রদেশের একটি রাজ্য, অর্থাৎ 'রাজা' উপাধিধারী একজন বড় জমিদারের এলাকা। এলাকার পাশ দিয়ে একটি ছোটো নদী বয়ে চলেছে। (কেন বয়ে চলেছে সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে।) রাজার হাঁক-ডাক-দাপট খুব ; প্রজারা তাঁকে তাদের 'মা-বাপ' বলে মানে, এতে তিনি মহা খুশী। তাঁর রাজ্যে বারো মাসে তেরো পার্বণের তিনি পক্ষপাতী, আর গুণগ্রাহী বলে নাম কিনবার লোভ ছিলো তাঁর প্রচণ্ড।

তাই 'উজীর সাহেব' অর্থাৎ মন্ত্রীমশাই যাকে তাকে সহজে রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না।

একবার পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে একজন যাদুকর এসে রাজা সাহেবের দর্শন ভিক্ষা করলেন। বললেন, "আমি ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ। আমরা সাত পুরুষ ধরে যাদুকর। শুনেছি রাজা সাহেব বড় সমঝদার, আমার যাদুখেলার কদর বুঝবেন। ওঁকে খেলা দেখিয়ে খুশী করে কিছু বখ্‌শিস্ নিয়ে যাবো।"

উজীর সাহেব ভাবলেন, এই ভেল্‌কিবাজের পাল্লায় রাজা সাহেবকে পড়তে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না বলে ভেল্‌কি-ওয়ালাকে তিনি ভাগিয়ে দিলেন।

একদিন রাজা সাহেব তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হাওয়াগাড়িতে উঠেছেন ; সঙ্গে যথারীতি উজীর সাহেব। দুজনে মিলে হাওয়া খেতে রওনা হবেন, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেলো গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারছে না হাওয়াগাড়ির ড্রাইভার। কেন ? গাড়ির ঠিক সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে একটি পাতলা ছোটোখাটো মানুষ, দুটি চোখের তারায় অদ্ভুত উজ্জ্বলতা আর অদম্য আত্মপ্রত্যয়ের ভাব, আর গোঁফজোড়ার ডগা দুটি সরু করে পাকানো।

রাজা সাহেব চটে উঠবেন ভাবছেন, এমন সময় লোকটির চোখের দিকে একবার তাকাতেই চটে উঠবার কথা ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি চাই ?"

জবাব শুনলেন, "খুদাবন্দ ! গরিবের নাম নিয়াজ মহম্মদ, যাছুকর ।"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের আশ্চর্য যাছুর কাহিনী পৌঁছেছিলো রাজা সাহেবের কানেও । তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, তোমার নাম শুনেছি ওস্তাদ ।"

"সে আপনার বহুৎ মেহেরবানি, খুদাবন্দ !"—বললেন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ । "কিন্তু আপনাকে খেলা দেখাবার সৌভাগ্য আমার কখনো হয় নি। এবার আপনাকে খেলা দেখাবো বলে এসেছি ।"

উজীর সাহেব বললেন, "বাজে খেলা দেখে নষ্ট করবার মতো সময় হুজুরের নেই । এমন কিছু খেলা দেখাতে পারো যা অন্য কোনো যাছুর ওস্তাদ দেখাতে পারবে না ?"

অল্প দূরে পড়ে ছিলো একটি পাথরের খণ্ড । অনেক মণ তার ওজন । আর দূরে দেখা যাচ্ছে নদীর স্রোত । তামাশা করার ইচ্ছা প্রবল হযে উঠলো রাজা সাহেবের মনে ; তিনি হেসে বললেন, "এই আস্তো পাথরের খণ্ডটিকে ঐ নদীর জলে ভাসাতে পারবে ?"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ অম্লান বদনে বললেন, "পারবো ।"

বলে কি লোকটা ? মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো ? না, মোটেই পাগল নয়, বরং রীতিমতো সেয়ানা বলেই তো মনে হচ্ছে লোকটিকে !—ভাবলেন উজীর সাহেব । কোনো রকম কথার মার-প্যাঁচে জব্দ করে বোকা বানাবে না তো ? লোকটি যে রকম ফন্দীবাজ তাতে একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার । কোথাও কোনো ফাঁকি দেবার ফাঁক থেকে না যায় ।

"সোজা জলের ওপর ঐ পাথরটাকে ভাসাতে হবে, যেমন করে বরফের টুকরো জলে ভাসে ।" বললেন উজীর সাহেব ।—"পারবে ?"

"জী হাঁ ।" বললেন যাছুকর নিয়াজ মহম্মদ । "যাছুর জোরে ঐ অতো বড়ো পাথরকে বরফের টুকরোর চাইতেও পাতলা বানিয়ে দেবো ।"

তখন রাজা সাহেব আর উজীর সাহেবের মধ্যে কি গোপন কথাবার্তা হয়ে গেলো । তার পর উজীর সাহেব ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদকে বললেন : "তোমার আরজি রাজা সাহেব মঞ্জুর করেছেন ওস্তাদ । আগামী রবিবার নদীর ধারে

তোমার এই খেলা দেখবার জন্য ছোটোবড়ো, অনেককে নিমন্ত্রণ করা হবে। তার আগের এই ক'টা দিন তুমি তোমার দলবল নিয়ে রাজা সাহেবের অতিথি-শালায় থাকবে।"

যাত্নকর নিয়াজ মহম্মদ বললেন, "এ তো রাজা সাহেবের বহুৎ মেহেরবানি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

"কি শর্ত ?"

"এই পাথরটাকে আপনারা মেহেরবানি করে ঐ নদীর ধারে পৌঁছে দেবেন। সেখান থেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো আমি।"

এইবার হেসে উঠলেন রাজা সাহেব। বললেন, "যাত্নর জোরে এটাকে নদীর জলে ভাসাতে পারবে, আর এখান থেকে নদীর ধারে নিয়ে যেতে পারবে না ?"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ বললেন, "খুদাবন্দ, এতো বড়ো ওজনের পাথর জলে ভাসাতেই অনেকখানি যাত্ন খরচা হবে। তার ওপর আবার একে এতোটা রাস্তা বয়ে নিয়ে যাত্নর খরচটা আর বাড়াতে চাই না খুদাবন্দ। যাত্নর বাজে লোকসান করতে আমার ওস্তাদের মানা আছে।"

রাজা সাহেব বললেন, "বেশ। নদীর কিনারায় আমরাই পাথরটাকে পৌঁছে দেবো, আর নদীর জলে তাকে ভাসাবে তুমি। কিন্তু যদি ভাসাতে না পারো ?"

"এ বান্দাকে ধাপ্পাবাজ বলে কতল্ করে ঐ নদীর জলেই ভাসিয়ে দেবেন খুদাবন্দ !"—বললেন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ।

রাজা সাহেবের বিরাট অতিথিশালার একটি চমৎকার অংশে পরম আদরে থাকতে লাগলেন যাত্নকর নিয়াজ মহম্মদ, তাঁর দলবল নিয়ে। আদরে বটে, কিন্তু নজরবন্দী হয়ে। লোকটা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে কড়া পাহারা রেখেছিলেন উজীর সাহেব।

বিরাট পাথর। যেমনি বিরাট, তেমনি তার ওজন। অনেক লোক, অনেক মেহনত, অনেক সময়, অনেক খরচ লাগলো তাকে নদীর ধারে নিয়ে দাঁড় করাতে।

রবিবার। নদীর ধারে লোকে লোকারণ্য। যেখানে নদীর কিনারায় বিরাট পাথরের গুঁড়িটি দাঁড়িয়ে আছে, তার অনতিদূরে একটি ছোট্ট তাঁবু। এই তাঁবুর পাশ দিয়েই একটি পায়ে-চলার পথ নদীর ঘাট থেকে বরাবর চলে গিয়ে মিশেছে রাজপথে। রাজপথে পাহারা দিচ্ছে একঝাঁক ঘোড়সওয়ার। পাহারাওয়ালা আর ঐ যে পায়ে-চলার পথ, তার দুধারে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে

সাজানো সোফা, গদিওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি। তাতে বসে আছেন নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথিরা। সেরা জায়গায় বসে আছেন রাজা সাহেব, উজীর সাহেব এবং রাজা সাহেবের বিশিষ্টতম নিমন্ত্রিত অতিথি কয়েকজন। জলে ভাসাবার বিরাট পাথরটা এবং সেই ছোট্ট তাঁবুটা তাঁদের চোখ থেকে বেশি দূরে নয়। উর্দি-পরা চাপরাশি বেয়ারারা নানা রঙের পানীয় এবং ভোজ্য পরিবেশন করছে, আর রাজপথের ওধারে কৌতূহলী জনতা।

হঠাৎ উঠলো গুঞ্জন। দেখা গেলো আসছে রাজা সাহেবের অতিথিশালার গাড়ি। সেই গাড়িতে পাইক বরকন্দাজ পাহারায় এলেন যাদুকর ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ আর তাঁর দুজন সাগরেদ। ওস্তাদের পরনে জমকালো সোনালি জরির কাজ করা লাল মখমলের পোশাক, বুকে ঝুলছে একঝাঁক পদক, আর মাথায় ঝিকমিক করছে জমকালো উষ্ণীষ। তাঁর দুটি সাগরেদের পরনেও মখমলের পোশাক; শুধু ওস্তাদের পোশাকের তুলনায় তাদের পোশাক একটু কম জমকালো, আর তাদের বুকে নেই পদকের ঝাঁক, মাথায় নেই উষ্ণীষ।

নদীর ঘাট থেকে পায়ে-চলার পথটি যেখানে এসে মিশেছিলো রাজপথে, সেইখানে নির্মিত হয়েছিলো একটি সুদৃশ্য তোরণ। গাড়ী থামলো এসে এই তোরণের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে তোরণ-দ্বারের দুধারে দাঁড়িয়ে পড়ল ওস্তাদের দুজন সাগরেদ, দুজন দেহরক্ষী যেন! তার পর গাড়ি থেকে নামলেন—যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ!

উল্লাসধ্বনি উঠলো বহু কণ্ঠ থেকে। ব্যাণ্ডপার্টি তৈরি ছিলো আগে থেকেই। যাদুকর গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা শুরু হলো আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে। সবাই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সবাই একসঙ্গে দেখতে চাইছে যাদুকরকে,—বিরাট প্রস্তরখণ্ড যিনি যাদুবলে জলে ভাসাবেন।

বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত যাঁরা চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা সাহেবের বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি—তাঁর গৃহচিকিৎসক, ডাক্তার সাহেব। তাঁর সঙ্গে এসেছিলো তাঁর বারো বছরের ছেলে শঙ্করপ্রসাদ। ভেল্কি-ভোজ-বাজির শখ তার প্রচণ্ড, ক্লাশের পড়ার চাইতে নানা রকমের যাদুর খেলা শেখবার দিকে তার ঝোঁক বেশি। ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের অদ্ভুত যাদু-ক্ষমতার কাহিনী শুনে শুনে মনে মনে সে তাঁকে দেবতা বানিয়ে রেখেছে।

দুধারে আগ্রহাকুল চোখের সারি। পায়ে-চলা পথ বেয়ে বীর-বিক্রমে অগ্রসর হয়ে এলেন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ, তাঁর দুপাশে দুজন সাগরেদ। ছোট্ট যে তাঁবুটি দাঁড়িয়ে ছিলো পাথরটি থেকে একটু দূরে, ওস্তাদ আর তাঁর দুই সাগরেদ তার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আবার নতুন করে জল্পনা শুরু হলো দর্শক মহলে। এতো বড়ো পাথর জলে ভাসবে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। ওস্তাদ কি সবাইকে এপ্রিল-ফুল বানিয়ে পালাবে? কিন্তু পালাবে কি করে —এই দিন-দুপুরে এতোগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আর কড়া পাহারা এড়িয়ে? অথবা কি শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে লোকটা বদ্ধ পাগল, আর এই বদ্ধ পাগলের কথা বিশ্বাস করেই রাজা সাহেব আর উজীর সাহেব এমন বিরাট এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন? ভেলকি-ভোজবাজি-বুজরুকি দেখাতে দেখাতে শেষটায় ওস্তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর সেই মাথাখারাপটা টের পান নি রাজা সাহেব আর উজীর সাহেব? অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতূহলপ্রিয় রাজা সাহেবের (হয়তো বা সেই সঙ্গে উজীর সাহেবেরও) এক প্রচণ্ড কৌতুক, বিরাট তামাশা? সমবেত সবাইকে বোকা বানাবার খেলায় ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ ওঁদের হুকুমের তাঁবেদার—একজন সহায়ক খেলোয়াড় মাত্র? ওদিকে তাঁবুর ভেতর যাদুকর আর তাঁর দুই সাগরেদ অদৃশ্য, আর এদিকে এই রকম নানা রকমের গবেষণা চলছে, তার কিছু কিছু ভেসে আসছে সেই বারো বছরের ছেলেটির কানে, যার নাম শঙ্করপ্রসাদ। শঙ্করপ্রসাদ ভাবছে, তাঁবু থেকে বেরোচ্ছে না কেন ওস্তাদ? তবে কি ঐ তাঁবুর তলায় লুকোনো আছে সুড়ঙ্গ, সেই সুড়ঙ্গ-পথে নদীর ভেতর চলে গিয়ে ডুব-সাঁতার কেটে পালিয়ে যাবে যাদুকর ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ?

কিন্তু না, ঐ তো তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ওস্তাদ, পেছনে পেছনে দুই সাগরেদ। তিন জনেরই বেশ গেছে বদলে। তিন জনেই খালি গা, খালি পা, খোলা মাথা, আর তিনজনেরই পরনে কুস্তিগীরদের পরবার জাঙিয়া। চেহারা কিন্তু একজনেরও কুস্তিগীরের মতো নয়। ওস্তাদ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন মস্ত পাথরের সামনে। তার পর পাথরটির গোড়া ঘেঁষে বসে পড়লেন এক পা সামনে আর এক পা খানিকটা পেছনে দিয়ে। ওস্তাদের পা দুটি যেন মাটির ওপর পিছলে সরে যেতে না পারে সেজন্য দুই সাগরেদ ওস্তাদের দুই পা চেপে ধরে বসে পড়লো।

ওস্তাদ সেই বিরাট পাথরটাকে "হেঁইও" বলে একটু ঠেলতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার! যাকে সরিয়ে এখানে নিয়ে আসতে অনেক জোয়ানের অনেক পরিশ্রম আর অনেক সময় লেগেছিলো, সেই বিরাট পাথরটি যাত্নুকরের ছুটি পাতলা হাতের ঠেলায় নদীর দিকে অনেকখানি সরে গেলো। সমবেত দর্শক-মহলে বিস্ময়ের শিহরণ। পাথরটির দিকে আবার এগিয়ে গেলেন যাত্নুকর, আবার বসলেন তেমনি করে, তেমনি করে "হেঁইও" বলে আবার ঠেললেন পাথরটাকে, পাথরও আবার তেমনি করে আরো এগিয়ে গেলো নদীর দিকে। বার কয়েক এই রকম হেঁইও-র ফলে পাথরটি যখন জলের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেলো, তখন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ একাই পাথরটিকে ঠেলতে ঠেলতে নদীর জলে নেমে গেলেন। যেতে যেতে তাঁর গলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেলো, কিন্তু সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দেখলো বিরাট পাথরটি তার নিজের ওজন বেমালুম ভুলে গিয়ে ফাঁপা বয়ার মতো জলের ওপর ভাসছে!

সেই গলা-জলে দাঁড়িয়ে তখন অলৌকিক যাত্নুকর রাজা সাহেবকে সেলাম জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "খুদাবন্দ, বান্দা যে যাত্নুর খেলা দেখাবে বলে জবান দিয়েছিলো, সে খেলা দেখাতে পেরেছে কিনা?" রাজা সাহেব বিস্ময় আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘোষণা করলেন—ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ যাত্নু-জগতের বাদশাহ। তখনও পাথরটি ভাসছে নদীর জলে। পারে উঠে আসতে আসতে ওস্তাদ অনুমতি দিলেন, "আচ্ছা বেটা, আভি তুম ডুব যাও।" পাথরটা যেন ওস্তাদের যাত্নু-হুকুমে এতক্ষণ অনেক মেহনৎ করে জলের ওপর ভেসে ছিলো, এইবার ডুববার অনুমতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, ভুস করে ডুবে গেলো জলের তলায়। সমবেত লোকারণ্যে ধন্য ধন্য রব উঠলো।

এ গল্প পড়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগবে, এই অলৌকিক ঘটনাটি কি সত্যিই ঘটেছিলো? গল্পটি আমাকে শুনিয়েছিলেন পশ্চিম ভারতের একজন যাত্নুকর; তখন তার বয়স কম-বেশি পঞ্চাশ বছর। এই যাত্নুকরই ছিলেন উক্ত গল্পের বারো বছরের বালক শঙ্করপ্রসাদ (নামটা আমারই দেওয়া, আসল নামটা প্রকাশ করবো না বলে); সুতরাং ঘটনাটি তিনি সত্যিই দেখে থাকলে দেখে ছিলেন বারো বছরের চোখে। দেখে সেই ওস্তাদের অলৌকিক যাত্নু-ক্ষমতায় অভিভূত হয়েই নাকি তিনি অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁর যাত্নু-শিষ্য হয়েছিলেন।

"জানেন কি করে আপনার ওস্তাদ জলে পাথর ভাসিয়েছিলেন? পারেন ঐ রকম পাথর জলে ভাসাতে?" প্রশ্ন করেছিলাম যাদুকরকে।

যাদুকর বলেছিলেন, "জানি না। পারিও না। কিন্তু ওস্তাদের সেই অলৌকিক যাদু দিনের আলোয় চোখের সামনে স্পষ্ট দেখেছিলাম। এতে কোনো ভুল নেই।" এ কথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন।

যাদু-জগতে অনেক আষাঢ়ে গল্প চালু আছে, এ কাহিনীটিকেও আমার সেই শ্রেণীভুক্ত বলেই মনে হয়। গল্পটি হয়তো যাদুকরের আগাগোড়া বানানো; উদ্দেশ্য—তাঁর ওস্তাদের মহিমা বাড়ানো। অথবা হয়তো তাঁর মনে সত্যি বিশ্বাস তিনি ঐ রকম দেখেছিলেন, কিন্তু আসলে বালকসুলভ কল্পনা-প্রবণ চোখে কি দেখতে কি দেখেছিলেন তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আটত্রিশ বছব আগে দেখা ঘটনা যথাযথ মনে রাখাও শক্ত।

কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় গল্পটি ওঁর বানানো ধাপ্পা নয়, এবং সত্যিই তিনি ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের নদীর জলে বিবাট প্রস্তরখণ্ড ভাসাবার ঘটনা দেখে-ছিলেন, তাহলে কি ভাবে সেই অদ্ভুত ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

আমার মনে যে ব্যাখ্যাটির উদয় হয়েছে সেইটে বলি। এই উদয় সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পড়ে (কবিতাটির নাম "নকল গড়") এবং কলকাতার হুগলী খালের বুকে একটি জিনিস ভাসতে দেখে—বিরাট পাথরখণ্ডেব মতো বড় একটি বয়া।

কবিগুরুর উক্ত কবিতায় আছে:

"জলস্পর্শ করবো না আর—
চিতোর-রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।"

তখন, "মন্ত্রী কহে যুক্তি করি
আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।"

আসল কেল্লা যখন ভাঙা সম্ভব নয়, তখন রাজামশাইকে দিয়ে নকল কেল্লা ভাঙানো ছাড়া আর উপায় কি? সুতরাং

"মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।"

ঠিক তেমনি, আসল পাথরের খণ্ড জলে ভাসানো যখন মানুষের অসাধ্য, তখন অগত্যা চাই ঐ মস্ত পাথরের খণ্ডের মতোই আয়তন এবং চেহারার 'নকল' পাথরখণ্ড, যা বিরাটকায় বয়ার মতোই ফাঁপা, এবং জলে ভাসবে। রাজা সাহেবের প্রাসাদের অনতিদূরে যে বড় ওজনদার পাথরখণ্ডটি ছিলো, সেটাকে অনেক লোক এবং মেহনত লাগিয়ে 'হেঁইও হেঁইও' করে চারিদিকে বেশ সোরগোল জাগিয়ে নদীর ধারে নেওয়া হলো। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো এক বিশাল ওজনদার পাথরটিকে ই অসামান্য যাদুকর নদীর জলে ভাসাবেন। আসন্ন যাদু-প্রদর্শনীর দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন হয়ে গেল।

বাইরের কেউ জানে না যে রাজা সাহেবের সঙ্গে যাদুকর নিয়াজ মহম্মদের গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। তামাশা আর হুজুগের ভক্ত রাজা সাহেব চাইছিলেন জাঁকালো রকম নতুন ধরনের কিছু একটা ব্যাপার তাঁর রাজ্যে হোক, যাতে চারদিকে 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যায়। যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ যদি এই অলৌকিক কাণ্ডটি করে দেখাতে পারেন তবে, তখন, তাঁর সভা-যাদুকর পরিচয় দিয়ে নিজে অমন বিরাট গুণীর পৃষ্ঠপোষক হবার সম্মান লাভ করবেন, সেটা কি কম কথা? গোপনে বুদ্ধি দিলেন যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ; সেই বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করে ঠিক সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা সাহেব। তাঁর অখণ্ড প্রতাপ, দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। টাকা ছিলো প্রচুর আর তা হুজুগে বা স্ফূর্তিতে ওড়াতে তাঁর আলস্য ছিলো না। বিরাট পাথরটির হুবহু নকল তৈরি হয়ে গেলো, যা জলে ভাসবে, আর কিছুক্ষণ পরেই তলাটা জলে গলে গিয়ে ধীরে ধীরে গোটা জিনিষটা জলে ডুবে যাবে। রাতের গোপনে রাজা সাহেবের কিছু বিশ্বস্ত লোক বা যাদুকরের লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় আসল পাথরটিকে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে তার জায়গায় রাতারাতি ঐ নকল পাথর-খণ্ডটি রেখে দেওয়া হলো। বাইরের কেউ এই বদলের কথাটা জানতে পারলো

না। যাত্বকর নিয়াজ মহম্মদ যেটিকে জলে ভাসালেন এবং কিছুক্ষণ বাদে জলে ডুবিয়ে দিলেন, সেটা বিশেষ জিনিস দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি এই নকল পাথরখণ্ড।...

এই ব্যাখ্যাটি আমার কল্পিত, এবং হয়তো এটিকে কারো কারো খুবই উৎকট রকমের উদ্ভট বলে মনে হবে। কিন্তু যাত্ব-প্রদর্শনের বাস্তব জগতে এই ধরনের অনেক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হয়েছে; সেইজন্তেই এ কাহিনীটি বলা একেবারে অবান্তর বলে মনে করি নি।

আসল ও মেকি

তখন যাদুকর পি. সি. সরকারের যাদু প্রদর্শন চলছে কয়েকদিন ধরে নিউ এম্পায়ার হলে। এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "এবার সরকারের ম্যাজিক দেখেছেন? একটি খেলা যা দেখলুম, সে তো রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার। চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। এমন কি চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত।"

বললাম, "বলেন কি? বলুন তো খেলাটা কি।"

ভদ্রলোক বললেন, "সরকার এসে স্টেজের ওপর দাঁড়ালেন, হাতে একখানা বড় শাদা চাদর। আমাদের চোখের সামনে ঐ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে ঐ চাদরের তলায় ঘুরে ঘুরে হেলে দুলে কি তাঁর নাচ! দেখে আমরা তো হেসে বাঁচি নে।"

"কিন্তু এর ভেতর অলৌকিকটা কোথায়?" বললাম আমি।

"বলছি। চাদর-ঢাকা সরকার আমাদের চোখের সামনে নাচছেন, নাচছেন, নাচছেন, হঠাৎ চাদরখানা একেবারে ফাঁকা—লুটিয়ে পড়লো স্টেজের ওপর! সরকার বেমালুম হাওয়া। হলসুদ্ধ আমরা সবাই অবাক। কোথায় সরকার? সকলের মনে এই এক প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে হলের একেবারে পেছন দিকে দোতলার গ্যালারির পেছনে—স্টেজ থেকে কতো দূরে ভেবে দেখুন একবার—শোনা গেলো 'এই যে আমি।' সবাই ঐ দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই দাঁড়িয়ে হাসছেন যাদুকর সরকার। স্টেজ থেকে উধাও হওয়া আর সঙ্গে সঙ্গেই সশরীরে অদ্দূর চলে যাওয়া—সিকি সেকেণ্ডও বোধ হয় লাগে নি—ব্যাপারটা অলৌকিক নয়? সরকার মুখে যতোই বলুন না কেন ম্যাজিক মানেই চালাকি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওঁর আসলে কিছু কিছু অলৌকিক, ভুতুড়ে ক্ষমতা আছে, যা উনি স্বীকার করেন না।"

যে খেলাটির কথা উনি বললেন, সেটি যে আধুনিক যাদুবিদ্যার একটি অতি সহজ ফাঁকির খেলা মাত্র, ওর ভেতরে অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নেই, সেটা তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারা গেলো না। ফাঁকিটা কোথায় সেইটে ওঁকে

পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না দিলে উনি কিছুতেই খেলাটিকে ফাঁকির খেলা বলে মানতে রাজী নন।

কিন্তু যাদুমঞ্চের এই খেলাটি মোটেই 'আসল' অলৌকিক ব্যাপার নয়, 'মেকি' অলৌকিক ; এর মূলে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ফাঁকি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মেকির আসল থাকা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে মুহূর্তের ভেতর সশরীরে বহু দূরে চলে যাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকতে পারে কিনা। আমার একজন অধ্যাপক বন্ধুর বিশ্বাস তা পারে। এবং তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ একটি কাহিনী তিনি আমাকে বলেছেন।

ফেনি শহরে থাকতেন এক ফকির। শহরের সবাই তাঁর ভাগনে বা ভাগনি, তিনি সবার মামা। ছোট বড় সবাই তাঁকে ডাকতো 'ফকির মামু' বলে। (বলা বাহুল্য 'মামু' ডাকটি 'মামা' ডাকের আদুরে সংস্করণ)। ঐ ডাক থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেলো মামু ফকির।

এবার আমার অধ্যাপক বন্ধুটির জবানিতে বলি :

আমার জ্যাঠামশাই তখন ফেনির একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজকর্মচারী। আর ইংরেজ শাসনের তখন পুরো দাপট। জ্যাঠামশাই লোক খারাপ ছিলেন না, জনপ্রিয়ও ছিলেন ; কিন্তু সব সময় তিনি ঠাট বজায় রেখে চলতেন, তাই লোকে তাঁকে মানুষ হিসেবে যেমন পছন্দ করতো, জাঁদরেল রাজকর্মচারী হিসেবে তেমনি ভয়ও করতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা জ্যাঠামশাই যাবেন সার্কাস দেখতে। ফেনি শহরের বড়ো মাঠের ওপর পড়েছে সার্কাস দলের তাঁবু ; ওদের খেলা নাকি চমৎকার, দেখবার মতো। মামু ফকির যেমন খামখেয়ালি আর পাগলাটে, তেমনি শিশুর মতো সরল ; তাই মামু ফকিরকে ভারি পছন্দ করতেন জ্যাঠামশাই। বললেন, 'মামু, চলো আমার সঙ্গে সার্কাস দেখতে যাবে। মামু ফকির রাজি নন। বললেন, 'তুই যা। সার্কাস ফার্কাস আমার ভালো লাগে না।' সবাই ওঁর ভাগনে, তাই সবাইকেই 'তুই' সম্বোধন ; ছোটো বড়ো ভেদ নেই, কাউকে পরোয়া নেই।

জ্যাঠামশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'মামু, সবাই বলছে এমন সার্কাস আর কখনো এদিকে আসে নি। খেলা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।'

'ও তাক তোরই লাগুক। আমার লাগার দরকার নেই।' বললেন মামু ফকির।

মামু ফকির অনেক চেষ্টা করলেন জ্যাঠামশাইয়ের আবদার এড়াতে, কিন্তু পারলেন না। জ্যাঠামশাই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সন্ধ্যাবেলা সার্কাস দেখতে। দুপাশে দুই আরদালি, মাঝখানে জ্যাঠামশাই আর মামু ফকির। জ্যাঠামশায়ের বেশভূষা ভয়ানক রকম জাঁকালো নয় বটে, কিন্তু দস্তুরমতো কেতাদুরস্ত। আর মামু ফকির? তাঁর মাথার চুল রুক্ষ আর এলোমেলো, খালি পা, পরনের ময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর উঠে আছে। যাকে বলে পাগলের মতো চেহারা, ঠিক তাই।

জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছে মামু ফকিরকে আজ তিনি সার্কাস দেখাবেনই, আর মামু ফকিরের পাশে বসে সার্কাস দেখবেন। তারপর সার্কাসের আশ্চর্য খেল দেখে মামু ফকিরের যখন তাক লেগে যাবে, তখন বলবেন, 'দেখলে তো কি চমৎকার? এখন বোঝো, না এলে কি হারাতে।' তাছাড়া মামু ফকির পাগলাটে মানুষ, পাছে হঠাৎ ছুটে পালান, এই ভযেই দুধারে আর পেছনে পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন জ্যাঠামশাই।

আগে সামনের আরদালিরা 'সাহেবের' জন্য লোক সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছে, জ্যাঠামশাই সার্কাসের বড় গেটটি দিয়ে মামু ফকিরকে নিয়ে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় আশ্চর্য ব্যাপার। জ্যাঠামশাই হঠাৎ দেখলেন মামু ফকির পাশে নেই। এক মুহূর্ত আগেও যাঁকে দেখেছিলেন তিনি চোখের পলকে কোথা দিয়ে পালালেন এমন কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে? ফকিরকে সবাই চেনে, দুপাশে আর পেছনের কেউ তাঁকে চলে যেতে দেখে নি। জ্যাঠামশাইকে 'বাই একবাক্যে বললে, 'আপনার পাশে পাশেই তো ওঁকে দেখছিলাম। এখন দেখছি উনি নেই। কিন্তু ঠিক কখন থেকে উনি নেই, আর কোথা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।'

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, পাত্তা মিললো না মামু ফকিরের। মামুর উদ্ভট পাগলামি খামখেয়ালের সঙ্গে ফেনি শহরের সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু এতোগুলো লোকের মাঝখান থেকে এমন বেমালুম হাওয়া হয়ে যাওয়া, এ যে রীতিমত ভুতুড়ে ব্যাপার। এ রহস্য নিয়ে অনেক মাথা ঘামতে লাগলো, কিন্তু সন্তোষজনক কোনো সমাধান পাওয়া গেলো না।

পরদিন। জ্যাঠামশায়ের এক বন্ধু কুমিল্লা থেকে এসেছেন। তিনি জ্যাঠা-মশাইকে বললেন, 'ওহে, কাল সন্ধ্যাবেলা মামু ফকিরকে কুমিল্লায় দেখলুম।'

শুনে জ্যাঠামশাই চমকে উঠে বললেন, 'কাল? সন্ধ্যাবেলা?'

বন্ধু বললেন, 'হ্যাঁ। দেখলুম কুমিল্লা স্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। মনে হলো অনেকখানি রাস্তা একটানা দৌড়ে এসেছে যেন। আমি বললুম, 'একি মামু, অমন হাঁফাচ্ছো কেন?' মামু ফকির বললে, 'বললাম সার্কাস দেখবো না, দেখবো না, তবু ধবে নিয়ে গেলো। তাই এক ফাঁকে ছুটে পালিয়ে এলাম।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'নিজের চোখে দেখেছো? ভুল হয় নি তো?'

বন্ধু বললেন, 'না হে না। মামুর হাত ধরলুম, মামু ঝটকা মেরে হাত ছাড়িযে নিয়ে ছুটে কোথায় উধাও হয়ে গেলো। অদ্ভুত পাগলাটে মানুষ।'

জ্যাঠামশাই শুধালেন, 'ঠিক কোন সময়ে কাল মামুকে কুমিল্লায় দেখেছিলে মনে আছে?"

বন্ধু বললেন, 'সন্ধ্যা ছটা সওয়া ছটা।'

জ্যাঠামশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'বলো কি? ঠিক অমনি সময় মামু ফকির এখানে সার্কাসি তাঁবুব গেটের সামনে থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলো।'

ফেনি থেকে কুমিল্লা প্রায় চল্লিশ মাইল দূব। তাহলে যে সময় মামু ফকিব ফেনিতে অদৃশ্য হলেন, প্রায় সেই সময়েই তাঁকে কুমিল্লায় দেখা গেলো কি করে? অসামান্য দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সশরীরে চলে যাওয়ার সত্যি সত্যি অলৌকিক ক্ষমতা মামু ফকিরের ছিলো, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যাখ্যা চলে না—আমার উক্ত অধ্যাপক বন্ধুটির এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ঐ অদ্ভুত ব্যপারটি কি করে সম্ভব হলো, এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব হচ্ছে: মামু ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা ছিলো।

উক্ত কাহিনীটি যদি হুবহু যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায তাহলে অবশ্য এই জবাব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায থাকে না। কিন্তু এই 'যদি-র ফ্যাকড়াটাই একটা বড়ো রকমের ফ্যাকড়া। প্রবাদেই বলে "To err is human" অর্থাৎ ভুল করাটা মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। চোখের ভুল আর মনের ভুল আমরা যে কতো করি তার ঠিক নেই, আর সে ভুল অনেক ক্ষেত্রেই আমরা টের পাই না। এমন কি ভুল করেছি, এই সন্দেহ কেউ প্রকাশ করলেই চটে উঠি। পরের মুখে শোনা কাহিনীর কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ কাহিনী

এক মুখ থেকে অন্য মুখে ঘুরতে৹ঘুরতে অনেক সময় এমন বদলে যায় যে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে মিল থাকে না। প্রত্যক্ষদর্শীও যখন তাঁর 'নিজের চোখে দেখা' ঘটনার কাহিনী বলেন তখন অনেক সময় তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেও কাহিনীতে আসল ঘটনার সঙ্গে এখানে সেখানে গরমিল হয়ে যায়। হয়তো ঘটনাটির এমন কয়েকটি অংশ তিনি খেয়াল করেন নি অথবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবেন নি যে অংশগুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো লক্ষ্য করলে ব্যাপারটার রঙই বদলে যেতো।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত বিষয় হচ্ছে টেলিপ্যাথি (Telepathy) বা থট-ট্রানস্‌ফারেনস্ (Thought transference)— অর্থাৎ এক মন থেকে অন্য মনে অন্য কোনো মাধ্যমের সহায়তা না নিয়ে চিন্তা বা ভাব সঞ্চারিত করে দেওয়া। অনেকে বিশ্বাস করেন যোগী বা সাধু মহাপুরুষেরা আত্মিক ক্ষমতার সাহায্যে এ জিনিস করতে পারেন। বেতার স্টেশন থেকে ব্রডকাস্ট করা গান, বক্তৃতা ইত্যাদি আমরা আমাদের রেডিও সেটে ধরে বেতার প্রোগ্রাম শুনি। বিলেতে বক্তৃতা হচ্ছে, সে বক্তৃতা রেডিও সেটে ভারতে বসে শুনছি। বিজ্ঞানের এও তো একটি পরম বিস্ময়, শুধু এতে আমরা অভ্যস্ত হযে গেছি বলে এখন আর বিস্ময় বোধ করি না। টেলিপ্যাথিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন এক মন থেকে আরেক মনে চিন্তা পরিচালনার ব্যাপারটা বেতারেরই অনুরূপ। একটি মগজ হচ্ছে বেতার প্রেরক-যন্ত্র, আরেকটি মগজ হচ্ছে বেতার 'রিসিভার' বা গ্রাহক-যন্ত্র। যে ভাবে বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে কোনো বাণী প্রেরিত হয়ে দূরের রিসিভার যন্ত্রে ধরা পড়ে, তেমনি একটি মনের চিন্তাধারা তার মগজ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত হয়ে দূরের কোনো মগজে ধরা পড়তে পারে—এ কথা অবিশ্বাস করবো কেন? অবশ্য এজন্য প্রেরক এবং গ্রাহক দুজনেরই অসাধারণ ক্ষমতা থাকা চাই; এই কারণেই এ ধরণের শক্তিকে আমরা বলি অলৌকিক শক্তি।

টেলিপ্যাথির একটি কাহিনী বলি। একজন বড়োলোকের বাড়িতে ছোট্টো একটি চায়ের বৈঠক বসেছে। বৈঠকে একজন যাদুকরও হাজির। তিনি ম্যাজিক দেখাবার জন্যে আসেন নি, এসেছেন গৃহস্বামীর একজন বন্ধুর বন্ধু হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে।

কথাপ্রসঙ্গে টেলিপ্যাথির কথা উঠল। সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে অনেক

আসরে, বৈঠকে আর সাময়িক পত্রে আলোচনা চলেছিলো। গৃহস্বামী বললেন, তিনি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাসী নন; একজন লোক এখানে বসে বসে দূরের কোনো লোকের মনের ভেতরে তাঁর নিজের মনের কথা শুধু মানসিক শক্তিতেই পাঠিয়ে দিতে পারবেন, এ তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন।

এক ভদ্রলোক বললেন, "ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। আপনি মনে করুন এইখানে বসে বসে একটা কথা ভাবছেন। সেই কথাটা আপনার মগজের যন্ত্রে যে সুরের তরঙ্গ জাগালো, সেই তরঙ্গ হাওয়ায় বলুন, অথবা ইথারে বলুন, ভাসতে ভাসতে গিয়ে আরেক জনের মগজের যন্ত্রে আঘাত করে তাতে সেই সুরের তরঙ্গটিই জাগিয়ে দিলো: ঐ ভাবেই আপনার মনের কথাটি তাঁর মনে পৌঁছে গেলো। মানে, তিনি আপনার মনের কথাটি ধরে ফেললেন. বেতার টেলিগ্রাফের মতো।"

গৃহস্বামী বললেন, "কথাটা শুনতে বেশ ভালো, এর ভেতর বেশ একটু কবিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ কি বাস্তবে সম্ভব?"

চায়ের কাপে চুমুক শেষ করে একজন বলে উঠলেন, "এই তো একজন যাদুকর রয়েছেন আমাদের ভেতর। অদ্ভুত আর রহস্যময় নিয়েই তো এঁর কারবার। এ বিষয়ে এঁর মতটা জানা যাক না কেন।"

গৃহস্বামী তখন যাদুকরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন এ ধরনের ব্যাপার সত্যি সত্যি সম্ভব?"

যাদুকর ছিলেন বেশ রসিক, তামাশাপ্রিয় ভদ্রলোক। তিনি বললেন, "এ বিষয়ে তত্ত্ব-আলোচনা না করে বরং হাতে কলমে পরীক্ষা করেই দেখা যাক না কেন। তাতে আমারও খানিকটা অভিজ্ঞতা বাড়বে। কি বলেন আপনি?" প্রশ্নটা গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করে।

গৃহস্বামী উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে তো বেশ ভালোই হয়।"

চা-চক্রের সবাই খুশী হয়ে উঠলেন। যাদুকরের নানারকম আশ্চর্য যাদুর খেলা দেখে তাঁরা অনেকে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দেখানো খেলাগুলো যেমন মজাদার, তেমনি বিস্ময়কর। এই চায়ের আসরে 'টেলিপ্যাথি' সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন আর কি দেখাবেন তাই নিয়ে সবারই মনে কৌতূহল জাগলো।

যাদুকর তখন গৃহস্বামীকে বললেন, "এ বিষয়ে কিছু দিন ধরে একটি বন্ধুর সঙ্গে আমি গবেষণা আর পরীক্ষা চালাচ্ছি। কিন্তু বন্ধুটি এখন এখানে উপস্থিত নেই,

স্থতরাং তার জায়গায় আপনাকেই নেওয়া যাক। লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কালো, সবুজ, শাদা—এই সাতটির ভেতর একটি রঙের নাম আমি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করবো, অর্থাৎ কল্পনার চোখে দেখবো। আপনি খুব নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগ করে চেষ্টা করে দেখুন আমার মনের চিন্তাটাকে আপনার মনে ধরে ফেলতে পারেন কিনা।"

গৃহস্বামী বললেন,"তার মানে, আপনি কি রঙের নাম ভাবছেন সেইটে আমি বলে দেবো?"

"ঠিক তাই।"

গৃহস্বামী বললেন, "এও কি কখনো সম্ভব?"

যাত্নকর বললেন, "সম্ভব কিনা সেটাই তো আমারও প্রশ্ন। সেটাই এখন আমাদের পরীক্ষা। আমাদের দুজনের মন যদি এক স্থরে মেলে তাহলেই এটা সম্ভব হবে, নতুবা নয়। এক শীট সাদা কাগজ দিতে পারেন?"

এক শীট সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভাঁজ করে তাই থেকে ছোট্টো চৌকো একটুকরো কাগজ সযত্নে ছিঁড়ে নিয়ে গৃহস্বামী থেকে দূরে চলে গেলেন যাত্নকর। তারপর ঐ কাগজের টুকরোর ওপর কি যেন লিখে পকেটে রেখে দিয়ে গৃহস্বামীকে বললেন, "এবারে আমাদের পরীক্ষা শুরু করা যাক।"

পরীক্ষা চললো কিছুক্ষণ ধরে। যাত্নকর চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন একটি রঙের নাম; গৃহস্বামী চোখ বুজে মনে মনে সেই নামটি ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যাত্নকর বলে দিলেন, ""যখন মনে হবে একটি রঙ বেশি করে চোখে ভাসছে, তখন বলবেন সেই রঙের নামটি।"

কিছুক্ষণ বাদে গৃহস্বামী বললেন, "সবুজ।"

যাত্নকর বললেন, "চমৎকার ধরেছেন। সবুজই আমি মনে করেছিলাম আর এই কাগজে লিখে রেখেছিলাম। দেখুন।" বলে পকেট থেকে সেই টুকরো কাগজটি খুলে দেখিয়ে দিলেন। সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন কাগজে লেখা রয়েছে "সবুজ"।

গৃহস্বামী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "আশ্চর্য! আপনার চিন্তা আমি কি করে ধরে ফেললাম?"

যাত্নকর হেসে বললেন, "তবে যে বলছিলেন টেলিপ্যাথি সত্যি বলে আপনি বিশ্বাস করেন না? অথচ টেলিপ্যাথির ক্ষমতা আপনার নিজের ভেতরই রয়েছে।"

গৃহস্বামী বললেন, "এখন দেখছি টেলিপ্যাথি সত্যিই সম্ভব।"

যাত্নকর বললেন, "অতো চট করে বিশ্বাস করে ফেলবেন না। বরং আরেকটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনারা যে কোনো একটি তাসের নাম আমাকে বলুন। আমি এইখানে বসে মনে মনে সেই তাসের ছবিটি ভাবতে থাকলে আমার সেই বন্ধুটি—যার সঙ্গে কিছুদিন ধরে আমি টেলিপ্যাথি অভ্যাস করছি বলেছি—দূর থেকে সে ছবি মনে মনে ধরে নিতে পারে কিনা দেখা যাক।"

চা-চক্র থেকে অনেক ভেবে চিন্তে পছন্দ করা হলো ইস্কাপনের নওলা। যাত্নকর বললেন, "আমি চোখ বুজে চুপচাপ একমনে এই তাসটির কথা ভাবতে থাকি। আপনারা ফোন করে দেখুন বন্ধুটিকে বাড়িতে পান কিনা। যদি পান তো আমাদের এই পরীক্ষার ব্যাপারটা ওকে বুঝিযে দিযে জিজ্ঞাসা করুন ওর মনে কোনো তাসের ছবি ধরা পড়ছে কি না।"

"কতো নম্বর ফোন? আর কাকে ডাকব? নাম কি আপনার বন্ধুর?"

"অনিলবাবুকে ডাকুন। ফোন নম্বর ৭৮-১৩২৫।"

অনিলবাবুকে ফোনে ডেকে পাওযা গেলো। তিনি বললেন, "আমি এখ্খুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপার কি বলুন তো?"

ব্যাপারটা বোঝানো হলো তাঁকে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "চোখ বুজেছি। মনে হচ্ছে ঝাপসা ছবি দেখছি একখানা তাসের। এইবার যেন আরেকটু স্পষ্ট হয়েছে। তাসটি—ইস্কাপনের নওলা।"

ইস্কাপনের নওলা! যাত্নকর এবং সেই বন্ধুর মাঝামাঝি পোয় সাড়ে পাঁচ মাইলের ব্যবধান। যাত্নকরের মন থেকে ইস্কাপনের নওলার ছবি অনিলবাবুর মনে চলে গেলো কি করে? চা-চক্রের সবাই বিস্মিত হয়ে বিশ্বাস করলেন খাঁটি টেলিপ্যাথি সত্যই যে আছে তার ছুটি প্রমাণ তাঁরা এইমাত্র পেলেন।

গৃহস্বামী বললেন, "এখন মনে হচ্ছে হ্যামলেট সত্যি কথাই বলেছিলো হোরেশিওকে: 'দেয়ার আর মোর থিঙ্স্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ হোরেশিও দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ্ ইন্ ইওর ফিলজফি।' ছুনিয়ায় এমন অনেক আশ্চর্য সত্য আছে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

যাত্নকর বললেন, "সে বিষয়ে হ্যামলেট এবং আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আসল টেলিপ্যাথি সম্ভব হতে পারে এ আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু এইমাত্র আপনারা টেলিপ্যাথির যে নমুনা দেখলেন সে ছুটিই মেকি। অর্থাৎ ফাঁকির খেলা।"

"কিন্তু ফাঁকির ফাঁক কোথায়?" গৃহস্বামী বললেন বিস্মিত হয়ে।

যাদুকর টেলিপ্যাথির ঐ দুটি মেকি নমুনার যে ফাঁকিগুলো সেদিন ঐ চায়ের বৈঠকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন নি, সেগুলো এখানে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি।

প্রথমে এক নম্বর খেলার কথা বলি। চা-চক্রের অতিথিরা জানতেন না, আগে থেকেই যাদুকরের পকেটে লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কালো আর সবুজ লেখা ছয়টুকরো কাগজ ছিলো। চা-চক্রে খেলা দেখাবার সময় সকলের সামনে যাদুকর শাদা কাগজের ফালি থেকে ঠিক পকেটের কাগজের টুকরোগুলির মতো সাইজ করে একটা টুকরো কেটে নিয়ে (যেন সাতটা টুকরোই এক সাইজের হয়) তাতে কাউকে না দেখিয়ে 'শাদা' লিখে পকেটে রেখে দিলেন। টুকরোগুলো পর পর এমনভাবে সাজানো, যেন যাদুকর সহজেই যে কোন রঙের নাম লেখা কাগজের টুকরো চট করে বার করে আনতে পারেন। গৃহস্বামী বললেন 'সবুজ', সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে 'সবুজ' লেখা কাগজের টুকরোটি বার করে দেখালেন যাদুকর। গৃহস্বামী অন্য কোনো রঙের নাম বললে যাদুকরও সেই রঙের নাম-লেখা কাগজের টুকরো বার করে দেখাতেন।

এইবার বলি দু নম্বর খেলার ফাঁকির কথা। যাদুকরের বন্ধুটির সঙ্গে চা-চক্রের কেউ পরিচিত ছিলেন না, কেউ জানতেন না বন্ধুর নাম কি। যাদুকর চা-চক্রে যাবার আগে বন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন বাড়ি থাকতে। বন্ধুর কাছে একটি ফর্দ ছিল, তাতে বাহান্নটি মানুষের নাম লেখা, আর প্রত্যেকটি মানুষের নামের পাশে একটি বিভিন্ন তাসের নাম। বন্ধুটি যেইমাত্র শুনলেন ফোনে খোঁজ হচ্ছে 'অনিল' বাবুর, অমনি তাঁর ফর্দ মিলিয়ে দেখলেন 'অনিল' নামের পাশে লেখা রয়েছে 'ইস্কাপনের নওলা।' বুঝে নিলেন তাসের এই নামটিই বলতে হবে। কিন্তু চট্ করে বলে ফেললে ব্যাপারটার রহস্য দানা বাঁধবে না। তাই তিনি যেন কিছুই জানেন না এমনি ভান করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই অনিলবাবু।...কি ব্যাপার বলুন তো?' ইত্যাদি। তারপরও পক্ষকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইস্কাপনের নওলা।' এদিকে নামের ফর্দটি যাদুকরের মুখস্থ। স্থতরাং 'ইস্কাপনের নওলা' যেইমাত্র পছন্দ করা হয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিলো 'অনিল'; তাই তিনি ফোনে 'অনিল' বাবুকে ডাকতে বলেছিলেন।

খেলার কৌশলটি অতি সরল, সহজ। (বেশির ভাগ আশ্চর্য খেলারই

কৌশল তাই)। কিন্তু খেলাটি বেশ স্বচ্ছভাবে দেখাতে পারলে কৌশলটুকু যাঁরা জানেন না তাঁদের মনে হবে এ বুঝি সত্যি সত্যি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, আসল টেলিপ্যাথি। আরেকটা কথা বলি। সেদিন চা-চক্রের অধিকাংশ অতিথিই ভেবেছিলেন টেলিপ্যাথির প্রসঙ্গটা বুঝি দৈবাৎ উঠে পড়লো। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। যাত্বকরই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন টেলিপ্যাথির আলোচনা ওঠে, আর সেই সূত্রে তিনি এই খেলা ত্বটো দেখাতে পারেন। আগে বলেছি, আবারও বলি চাতুর্যপূর্ণ কৌশলে মেকি টেলিপ্যাথিকে আসল টেলিপ্যাথি বলে চালানো যায় বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে সত্যিকারের টেলিপ্যাথি অসম্ভব।

ফরাসী যাদুসম্রাট উদ্যাঁ

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি। শহর প্যারী ফরাসী দেশের রাজধানী। রঙ্গালয়ে যাদুর খেলা দেখে সারা প্রেক্ষাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধ, স্তম্ভিত। যাদুকর তাঁর ছ'বছরের ছেলেটিকে মঞ্চের সমান্তরালভাবে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে দিয়েছেন। ছেলেটির ডানহাতের কনুইটুকুই শুধু ভর করে রয়েছে একটি খাড়া লাঠির ডগায়। মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দিয়েছে যাদুকরের যাদু। কি করে? দর্শকের চোখের সামনে এক বোতল 'ইথার' ঐ ছোট্টো ছেলেটির নাকের সামনে ধরে তাকে জোর করে সেই 'ইথার' শুঁকিয়েছেন যাদুকর। (অস্ত্রচিকিৎসা বা সার্জারির জগতে তখন রোগীদের অজ্ঞান করবার জন্য ইথারের ঐরকম ব্যবহার সুরু হয়েছে।) ইথার শুঁকে শুঁকে ছেলেটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থায় রহস্যময়ভাবে তার দেহ ভাসছে হাওয়ায়। মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানছে না নীচের দিকে।

অদ্ভুত। অভাবনীয়! কিন্তু নিষ্ঠুর ঐ মারাত্মক ইথার শুঁকিয়ে শুঁকিয়ে ঐ দুধের শিশুর ওপর অমন অত্যাচার করছেন যাদুকর! ছেলেটা যে শেষে একদিন হার্টফেল করে মারা যাবে। আইনের চাপ দিয়ে এ খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাদু প্রদর্শনের নামে শিশুর ওপর রাতের পর রাত এ অত্যাচার চলতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন বিপুল বিস্ময়ের শিহরণ, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঐ বেচারা ছোট ছেলেটির প্রতি দরদ এবং হৃদয়হীন যাদুকর পিতার বিরুদ্ধে নালিশের গুঞ্জন।

যাদুকর আর কেউ নন, ফরাসী দেশের ভাবী 'যাদুসম্রাট', আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক রবেয়র উদ্যাঁ (Robert Houdin)। ছেলেটি তাঁর ছয় বছর বয়সের ছেলে ইউজেন। উক্ত খেলাটি সম্পর্কে যাদুসম্রাট উদ্যাঁ তাঁর স্মৃতি কথায় এইভাবে লিখেছেন:

"১৮৪৭ সালে শুধু হয়েছিলো অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে ইথার শুঁকিয়ে রোগীদের অজ্ঞান করার পদ্ধতি। ব্যথাবোধের শক্তি লুপ্ত করে দিতে ইথারের যাদু-

মন্ত্রের মতো ক্ষমতা সারা দুনিয়ায় বিস্মিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলো। সাধারণ মানুষের চোখে এ ব্যাপারটাও যাদুরই সামিল। ভাবলাম সার্জনরা যখন এভাবে যাদুর এলাকায় হস্তক্ষেপ করছেন, তখন যাদুকর হিসেবে আমারও এর একটা পাল্টা জবাব দেওয়া উচিত। এই ভেবেই ইথারের সাহায্যে ছেলেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার এই খেলাটি আমি আবিষ্কার করলাম, সার্জনদের হারিয়ে দেবার জন্যে। ইথারের প্রয়োগ করে সার্জনরা যা কিছু করেছেন তার চাইতে আমার এ আবিষ্কারটি নিশ্চয়ই অনেক বেশি বিস্ময়কর।…"

আসলে কিন্তু খেলাটার কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। এ খেলায় 'ইথার' আদৌ ব্যবহার করা হতো না ; ইথারের বোতল বলে যেটি নাকের কাছে ধরা হতো, তার বাইরে "ইথার" লেবেল আঁটা থাকলেও ভেতরে এক ফোঁটা ইথারও ছিলো না। ইউজেনকে ইথার শোঁকানোর অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিলো দর্শকের কল্পনাকে ভুল পথে চালিত করা, এবং রহস্যটির একটা আধা-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে রহস্যটিকে আরো ঘনিয়ে তোলা। এইখানেই উদ্যাঁর স্বজনী কল্পনার পরিচয় মেলে। এইখানেই তিনি শিল্পী, 'আর্টিস্ট'।

এই খেলাটির নীতিগত দিকটা নিয়ে কাগজে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিলো। অসহায় শিশুর ওপর এই ইথারীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কড়া কড়া মন্তব্য করে বহু পত্রলেখক যাদুকরকে তুলো ধুনেছিলেন। জাতির বিবেকের কাছে নানা-ভাবে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন : জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য একটি শিশুর স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন, রাতের পর রাত এভাবে বিপন্ন করা উচিত কি ?

কাগজে কাগজে এই তুমুল প্রতিবাদের ফলে খেলাটির প্রচার হয়েছিলো অসামান্য। এই প্রচারের অন্যতম ফল স্বরূপ উদ্যাঁ পেয়েছিলেন বেলজিয়ামের রাজপ্রাসাদে যাদু প্রদর্শনের সাদর আমন্ত্রণ। খবরের কাগজে যাদুকর উর্দ্যাকে তুলো ধুনে যে চিঠির পর চিঠি ছাপা হয়েছিলো, সেগুলো স্বয়ং যাদুকর উদ্যাঁই বিভিন্ন লোককে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, এ সন্দেহ (অথবা নিঃসংশয় ধারণা) করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা-পাবলিসিটির মূল্য-বোধের ব্যাপারে উর্দ্যা তাঁর সময়ের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিলেন।…

"লাইফ বিগিনস অ্যাট ফরটি" (জীবন সুরু হয় চল্লিশ বছর বয়সে) এই ইংরেজী বচনটি কে উচ্চারণ করেছিলেন মনে নেই, কিন্তু এটি আশ্চর্যরকম সত্য হয়েছিলো ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁর জীবনে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বছর

বয়সে তাঁর সত্যিকারের পেশাদারী যাদু জীবন শুরু হলো প্যারী শহরে। এর চল্লিশ বছর আগে ফ্রান্সের ব্লোয়া শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। পিতৃদত্ত নাম ছিলো জঁা ইউজেন রবেয়ার (Jean Eugene Robert)।

রবেয়ারের বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে উকিল বা ডাক্তার বানাতে। কোনোটাই রবেয়ারের মনপুত হলো না, কিছুদিন বাদে তিনি পৈতৃক ঘড়ি তৈরির কাজেই লেগে গেলেন। কলকব্জার কাজে তিনি অসাধারণ দক্ষও হয়েছিলেন। প্যারী শহরের একজন প্রতিষ্ঠাবান ঘড়ি-নির্মাতার কন্যা কুমারী উদ্যাঁকে বিয়ে করে রবেয়ার প্যারী শহরে শ্বশুরের প্রতিষ্ঠানেই কাজে লেগে গেলেন এবং ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য নিজেরই নামের সঙ্গে শ্বশুরের পদবী যোগ দিয়ে হয়ে গেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ, যে নামে তিনি যাদুবিদ্যার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

বলেছি রবেয়ার উদ্যাঁ স্বাধীনভাবে যাদুকররূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন চল্লিশ বছর বয়সে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির সূত্রপাত হয়েছিলো অনেকদিন আগেই। জন্মস্থান ব্লোয়া শহরে তিনি তখন ঘড়ির কাজ করছেন, বয়স আঠারো বছর। বইয়ের দোকানে ঘড়ি নির্মাণ সম্বন্ধে একটি বই খুঁজতে গিয়ে তাঁর হাতে পড়লো কয়েক খণ্ড পুরাতন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থ, যার এক খণ্ডের একটি অধ্যায় ছিলো বৈজ্ঞানিক আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে। সে অধ্যায়ে কতগুলো যাদুক্রীড়ার কৌশল চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা ছিলো। তাই পড়ে তিনি যাদুবিদ্যায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ঐ গ্রন্থটি ঐভাবে তাঁর হাতে না পড়লে যাদুজগৎ হয়তো পেতো না যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁকে। কিন্তু বিধাতা যে ঘাড়-বিশারদকে ঘড়ি ছাড়িয়ে যাদুকর বানাবেন, তাঁর জীবনে ঐরকম একটা যোগাযোগ হতেই হবে।

একটাই বা বলি কেন, আরেকটি আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটলো রবেয়ারের জীবনে তেইশ বছর বয়সে। তুর (Tours) শহরে এক ঘড়ির কারখানায় কাজ করছেন তিনি তখন। একদিন ফুড পয়জনিং অর্থাৎ খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে রবেয়ার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন; প্রায় প্রলাপের অবস্থা শুরু হলো। সন্দেহটা খুব সম্ভব অমূলক,তবু রবেয়ারের মনে সন্দেহ জাগলো তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে রওনা হলেন ব্লোয়া শহর অভিমুখে। দেহত্যাগ যদি করতেই হয়তো নিজের ঘরেই করবেন, বিদেশে বিভুঁয়ে নয়। অমন অসুস্থ অবস্থায় একা পথে বেরিয়ে পড়ে তিনি বুদ্ধির কাজ করেননি, কিন্তু এই নিতান্ত দুর্বুদ্ধির কাজটি না করলে এর পরের

অমূল্য যোগাযোগটি ঘটতো না। অসুস্থ দেহে কিছুদূর গিয়ে রবেয়ার মূর্ছিত হয়ে নিরালা পথের ধারে পড়ে রইলেন। বিধাতার বিধানে ঠিক সেই সময় সেই পথ দিয়ে অ্যাঙ্গার্স-এর মেলায় চলেছিলেন তাঁর যাদুর পসরা নিয়ে তখনকার প্রতিষ্ঠাবান যাদুকর টরিনি। টরিনি রবেয়ারকে তুলে নিলেন এবং কয়েকদিনের ভেতরেই তাঁর যত্নে ভালো হয়ে উঠলেন রবেয়ার। রবেয়ার ভালো হয়ে ওঠার পর এক দুর্ঘটনায় টরিনি এমন আহত হলেন যে কিছুদিনের জন্য তাঁর পক্ষে যাদু প্রদর্শন করা চলবে না, অথচ যাদু দেখিয়েই তাঁর রুটির জোগাড় হতো, যাদু বন্ধ হলে রুটিও যে বন্ধ হবে। এখন উপায়?

রবেয়ার টরিনির কাছে ঋণী, কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে তাঁর মন। তিনি এ অবস্থায় টরিনিকে ফেলে চলে গেলেন না, টরিনির যে যে জায়গায় খেলা দেখাবার কথা ছিলো সেখানে সেখানে তিনি টরিনির প্রতিনিধিরূপে খেলা দেখাতে লাগলেন, অবশ্য টরিনির সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে। টরিনি খুশী হয়ে যাদুবিদ্যার বেশ ভালো তালিম দিয়েছিলেন রবেয়ারকে, হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার অনেকগুলো সেরা যাদুর খেলা। বলা বাহুল্য, এই দামী তালিমের ফলে রবেয়ায় প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন।

অ্যাঙ্গার্স-এর মেলায় রবেয়ার একটি মজার কাণ্ড দেখেছিলেন. এক ফাঁকে তার বর্ণনা করে রাখি সংক্ষেপে। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি এলাকার কাস্টেলি নামে একজন যাদুকর খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবার তিনি একটি অসাধারণ খেলা দেখাবেন :

"জীবন্ত মানুষ ভক্ষণ।"

"আপনাদের চোখের সামনে এইখানে একটি জ্যান্ত মানুষকে আমি চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।" বললেন কাস্টেলি। "বলুন কাকে খাব।"

একটা আস্ত মানুষ চিবিয়ে খাবে লোকটা? এও কি কখনো সম্ভব? কাস্টেলিকে কোণঠাসা করে জব্দ করবার জন্য দর্শকের মধ্য থেকে দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভাবটা যেন "এই যে এসেছি। আমাদের দুজনের যাকে খুশি খাও।"

যাদুকর তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজনকে বেছে নিয়ে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এইবার তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি খাওয়া শুরু করি।" বলে ভদ্রলোকটির ঘাড়ে

এক কামড়। কামড় খেয়েই ভদ্রলোক যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ছুটে পালালেন। কাস্টেলি মুখ বেজার করে বললেন, "খাওয়া শুরু করতে না করতেই এভাবে ছুটে পালালে খাবো কি করে? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা অপর কাউকে পাঠান আমার কাছে।"

বলা বাহুল্য, রাক্ষুসে যাদুকরের জীবন্ত খাদ্য হতে আর কোনো ভদ্রমহোদয় এগিয়ে আসেন নি। যাদুকরেরও কথার খেলাপ ধরতে পারেন নি কেউ। যাদুকর তো জ্যান্ত মানুষ খেতে রাজী—খাদ্য হতে কেউ রাজি না হলে তিনি খাবেন কি করে?...

টরিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠে আবার যাদু প্রদর্শন শুরু করবার লায়েক হলেন, রবেয়ার তখন টরিনির দল ছেড়ে ফিরে গেলেন নিজের বাড়িতে, ব্লোয়া (Blois) শহরে। এই সময়ে ব্লোয়া-তে বেড়াতে এলেন প্যারী শহরের এক বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতার কন্যা কুমারী উদ্যাঁ (Houdin) রবেয়ারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হলো, তারপর বিবাহ প্রস্তাব, তারপর বিবাহ, তারপর রবেয়ার হয়ে গেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সাল ১৮৪৩। প্যারী শহরে একটি ঘড়ির দোকান আর কারখানা। বাইরে ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা মালিকের নাম: রবেয়ার উদ্যাঁ। তার তলায় লেখা: "এখানকার ঘড়ি নিখুঁত সময় দেয়।" শুধু ঘড়িই নয়, নানারকম আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি তৈরিতেও উদ্যাঁর দক্ষতা অসাধারণ। সম্প্রতি উদ্যাঁ কটি আশ্চর্য দেয়াল ঘড়ি তৈরি করে বিক্রি করেছেন ধনকুবের কাউণ্ট দ্য লেস্কালোপিয়েরে কাছে। আশ্চর্য সময় দেয় ঘড়িটা, অথচ কি করে চলে, কোথায় এর কল-কব্জা, কিছুই বোঝা যায় না, দেখা যায় না। এ যেন এক যাদু ঘড়ি। কাউণ্ট এই ধরনের কৌতুক আর রহস্যভরা আর্ট বা কারুশিল্প খুব পছন্দ করেন, উদ্যাঁর এই ধরনের চাতুর্যে ভরা কারিগরির তিনি পরম ভক্ত। প্রায়ই তিনি এসে বসেন উদ্যাঁর কারখানায়, দেখেন উদ্যাঁকে কাজ করতে, নানারকম আলোচনাও চলে। কথায় কথায় উদ্যাঁর মনের বাসনা টের পেলেন কাউণ্ট। উদ্যাঁর বড় সাধ সব কিছু ছেড়ে পুরোপুরি যাদুকর হয়ে যান। কিন্তু বিবাহ করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে। কাজেই ঘড়ির কাজের নিশ্চিত বাঁধা আয় ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যাদুকর-জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়াটাও বিপজ্জনক, বিশেষ

করে পুরোপুরি পেশা হিসেবে যাদু বিদ্যায় সাফল্য লাভের মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর আছে কি না সেটাও ভাববার কথা। সংসারী মানুষের কি যা তা একটা ঝুঁকি নিলে চলে ?

কাউণ্ট তাঁর ভবনে বহু বিশিষ্ট অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে এনে প্রায়ই তাঁদের সামনে ঘরোয়া পরিবেশে রবেয়ার উদ্যাঁকে যাদু প্রদর্শনের সুযোগ দিতে লাগলেন। ফলে উদ্যাঁ যাদু-দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে লাগলেন দ্রুতবেগে। মন থেকে দূর হয়ে গেলো শঙ্কা, সন্দেহ; যাদু-জীবনের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন তিনি। এর আগে যাদু অভিযানে কাউণ্টের অর্থ গ্রহণ করতে রাজী হন নি উদ্যাঁ; এইবার রাজী হলেন, অবশ্য ঋণ হিসেবে। পনেরো হাজার ফ্রাঁ (ফরাসী মুদ্রা) দিলেন কাউণ্ট।

প্যারী শহরের বিশিষ্ট অঞ্চলে একটি ছোট্ট অন্তরঙ্গ রঙ্গালয় নির্মাণ করালেন উদ্যাঁ,তাঁর নিজস্ব "যাদু-মন্দির"। প্রেক্ষাগৃহে দুশো জন দর্শকের বসবার জায়গা। এই যাদু-মন্দিরে ১৮৪৫ সালের ৩রা জুলাই তারিখে চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম তাঁর নিজস্ব যাদু প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করলেন রবেয়ার উদ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য সাফল্য, অপূর্ব জনপ্রিয়তা। এক বছরের ভেতর কাউণ্টের পনেরো হাজার ফ্রাঁ সুদে আসলে শোধ করে দিলেন যাদুকর উদ্যাঁ।

যাদু জগতে তিনি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিলেন জবড়জং মঞ্চসজ্জা, আসবাব এবং পোশাক বাতিল করে দিয়ে মঞ্চ যথাসম্ভব ফাঁকা এবং সাদাসিধে করে, আসবাবপত্র সরল করে এবং যাদুকরের পোশাক এবং সাধারণ ভদ্রলোকের দৈনন্দিন পোশাকে কোনো তফাৎ না রেখে। যাদুকরোচিত (?) ঢোলা হাতার আগুল্‌ফ লম্বিত আলখাল্লা নয়, সাধারণ সান্ধ্য পোষাক পরে যাদু দেখাতেন উদ্যাঁ। মঞ্চ সাজানো থাকতো যে কোনো সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ির ড্রইংরুম বা বৈঠকখানার মতো। সেকেলে স্থূল এবং জবড়জং থেকে আধুনিক সূক্ষ্ম এবং সারল্যের দিকে এই যে যাদু প্রদর্শনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে নানাভাবে যাদুর সেবায় নিয়োজিত করা শুরু করেছিলেন, এই জন্যেই তাঁকে বলা হয় "আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক"।

উদ্যাঁর "যাদু-মন্দির"-এর উদ্বোধনী প্রদর্শন হলো ১৮৪৫-এর জুলাই মাসে। পরের বছর ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি একটি নতুন খেলা মঞ্চস্থ করেন। খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁর প্রোগ্রামে এইভাবে লেখা ছিলো :

"এই খেলায় রবেয়ার উদ্যাঁর পুত্র যাহার দ্বিতীয় দৃষ্টির (অথবা দিব্যদৃষ্টির) অলৌকিক ক্ষমতা বিস্ময়কর—চোখের উপর পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদেব পছন্দ করা যে কোনো জিনিস বর্ণনা করিবে।"

এই পুত্রটি উদ্যাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এমিল, বয়স চৌদ্দ পনেবো বছব; পিতাব সহযোগে স্মৃতির চর্চা কবে করে এমিলের স্মৃতিশক্তি হযে উঠেছিলো অসাধারণ। চোখ বাঁধা এমিল বসে থাকতো মঞ্চে, উদ্যাঁ ঘুরে বেড়াতেন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ভেতব। দর্শকদের যাঁর যা খুশি তুলে দিতেন উদ্যাঁব হাতে, উদ্যাঁ প্রশ্ন করতেই এমিল সেগুলোর নিখুঁত বর্ণনা দিযে যেতো। দর্শকেবা বিস্মিত হতেন কাবণ তাঁবা জানতেন না উদ্যাঁ নানা সংকেত আর ইঙ্গিতে এমিলকে যা জানিযে দিচ্ছেন এমিল শুধু তাই বলে যাচ্ছে মাত্র। তাব চোখে দেখাব কিছু দবকার নেই, দরকার শুধু বিভিন্ন দ্রব্য, সংখ্যা, রং, ওজন, টাকা প্রভৃতির গোপন সংকেতের ফর্দ নির্ভুলভাবে মনে রাখা। পিতাপুত্র দুজনেব স্মবণশক্তি ছিলো অসাধাবণ তৈরি—বহু বিভিন্ন বকম জিনিসের বিববণ একে অন্যকে গোপন সংকেতে জানিযে দিতে পারতেন তাঁরা।

অন্যান্য আরো খেলার সঙ্গে এই খেলাটির খ্যাতি চাবদিকে ছড়িযে পড়ল। বেলজিয়ামের রাজপ্রাসাদে খেলা দেখাবার জন্য উদ্যাঁ রওনা হলেন রাজধানী ব্রুসেল্‌স্‌ অভিমুখে। সীমান্তে এক মজার ব্যাপাব হলো। বেলজিয়ান শুল্ক বিভাগের কর্মচারী উদ্যাঁর যাত্ন সরঞ্জামের জন্য শুল্ক দাবী করলেন। উদ্যাঁ বললেন, "এগুলো বিক্রী করবাব মাল নয়, ব্যক্তিগত প্রয়োজনেব জিনিষপত্র।"

কর্মচারী বললেন, "কি করে তা বিশ্বাস করব? এসব কি ধরণের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিষপত্র?"

পুত্র এমিল তখন পথেব ধাবে দাঁড়িয়ে দূরের দৃশ্য দেখছিলো। তাকে ডেকে রবেয়ার উদ্যাঁ বললেন, "এমিল, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দাও তো আমরা যাত্নকর। বলে দাও ওর পকেটে কি কি আছে।"

কর্মচারীর অজ্ঞাতসারে বহুদিনের অভ্যস্ত দ্রুত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে উদ্যাঁ লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন ভদ্রলোকের পকেটের জিনিষগুলি। "দ্বিতীয় দৃষ্টি"র খেলায় ব্যবহৃত ইঙ্গিতের সাহায্যে তিনি তাদের বিবরণ গোপনে টেলিগ্রাফ করে দিলেন এমিলের মগজে। তখন এমিল এদিকে না তাকিয়েই অনায়াসে

বলে দিলো, "একটা রুমাল, তাতে নীল নীল ডোরা। একটি চশমার খাপ। আর এক চাক চিনি।"

শুল্ক বিভাগের কর্মচারী জীবনে কখনো এতো বিস্মিত হন নি। তিনি বললেন, "সত্যিই আপনারা যাদুকর। আমার আর সন্দেহ নেই।" বিনা শুল্কেই ছাড়া পেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ।

বেলজিয়মের পর ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে যাদু প্রদর্শন করেছেন যাদুকব উদ্যাঁ। ইংল্যাণ্ডে মহারাণী ভিকটোরিযার ঘরোয়া আসরে তিনি বার-বার তিনবার যাদু প্রদর্শনের সৌভাগ্য এবং সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৮৫২ সালে জার্মাণীর বিভিন্ন স্থানে যাদু প্রদর্শন করে তিনি যাদুমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর 'যাদু মন্দিরে'র ভার দিলেন হ্যামিল্টন নামে এক ইংরেজ যুবককে। হ্যামিল্টন রবেয়ার উদ্যাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করলেন এবং উদ্যাঁর যাদু-প্রদর্শনীর উত্তরাধিকারী হলেন। ভগ্নীপতি হ্যামিল্টনকে রবেযার হাতে কলমে কতকগুলো অদ্ভুত খেলার কৌশলাদি শিখিয়ে দিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ। আপন গৃহে অবসর ভোগ করছিলেন উদ্যাঁ। এলো ফরাসী সরকার থেকে আমন্ত্রণ। সেই আমন্ত্রণে—অর্থাৎ পরোক্ষ আদেশে—তিনি আলজিরিয়াতে (আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশ) গিয়ে সেখানকার আরবদের কাছে তাদের নিজস্ব যাদুকরের যাদুর চাইতে ফবাসী যাদুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ফরাসী জাতির, তথা ফরাসী সরকারের মান মর্যাদা বাড়িয়ে এলেন। ফিরে এসে জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি ব্যাপৃত রইলেন নিজের বিভিন্ন আবিষ্কার-গুলোর উন্নতি সাধনে এবং গ্রন্থ রচনায়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ভেতর সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর "আত্মস্মৃতি"। অনেকের বিশ্বাস সে গ্রন্থ তিনি নিজে লেখেন নি। লিখিযে নিয়েছিলেন কোনো পেশাদার পাকা লেখককে দিয়ে। তাই যদি হয় তাহলেই বা আমাদের দুঃখ বা আপত্তি হবে কেন? যাদুবিদ্যায় দক্ষ হাত যে গ্রন্থরচনাতেও তেমনি দক্ষ হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিজে ভালো লিখতে পারেন না বলে তিনি যদি সেই পাকা পেশাদার লেখকের সাহায্য না নিতেন, তাহলে পৃথিবীর যাদুসাহিত্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকতো।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি উদ্যাঁর "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থ থেকে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। রাজা লুই

ফিলিপ আমন্ত্রণ (অর্থাৎ আদেশ) পাঠালেন উদ্যাঁকে অমুক তারিখে রাজপ্রাসাদে যাদুর খেলা দেখাতে হবে।

অমুক তারিখের তখন ছয় দিন বাকি। এই সময়েব ভেতর উদ্যাঁ গোপনে একটি ব্যবস্থা করে রাখলেন।

এলো যাদু প্রদর্শনের দিন। শুরু হলো যাদুব খেলা। সর্বশেষে এলো সেই চরম বিস্ময়েব খেলাটি। উদ্যাঁর উক্তিই সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া যাক :

"দর্শকদের কাছ থেকে কয়েকখানা রুমাল চেয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট পুঁটুলি করে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। তারপর সেই রুমাল যাঁরা ধার দিয়েছিলেন তাঁরা এক একটি কার্ডে তাঁদের খুশিমতো এক একটি জায়গার নাম লিখলেন। আমি রাজা মশাইকে বললাম এই কার্ডগুলোর লেখা থেকে বেছে যে কোনো একটি জায়গার নাম আমাকে বলুন, আমি সেইখানেই যাদুমন্ত্রে রুমালগুলোকে পাঠিয়ে দেবো। তিনি কার্ডের লেখাগুলো দেখে দেখে একটি লেখা পছন্দ করে বললেন, 'বাগানের ওধারে ঐ যে কমলালেবুর গাছটি দেখা যাচ্ছে, ঐ গাছের গুঁড়িব তলায় পাঠাতে পারেন?' আমি বললাম, খুবই সহজে। সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশে কয়েকজন প্রহরী ছুটে গিয়ে সেই কমলাগাছটি ঘিরে পাহারা দিতে লাগলো, যেন আমার দিক থেকে সেখানে কোনো রকম কারসাজি করা সম্ভব হতে না পাবে। দেখে আমি মনে মনে হাসলাম, কারণ ঐ গাছের তলায় যা করবার আমি করে রেখেছি, এখন আব ঐ পাহারায় আমার কি আসে যায়?...

"আমি একটা ঢাকনা দিয়ে টেবিলেব ওপরকার রুমালগুলোকে ঢেকে দিলাম। তারপর ঢাকনা তুলে নিতেই দেখা গেলো রুমালগুলো উধাও, তাব বদলে সেখানে রয়েছে একটা ছোটো পাখী, তার গলায় ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা চাবি।

"পাহারাধীন কমলালেবুর গাছেব গোড়ার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেলো তালা বন্ধ মরচেধরা পুরোনো লোহার বাক্স একটা। এটা প্রাসাদে নিয়ে এলো ভৃত্যদল। পাখীটির গলায় বাঁধা ফিতা থেকে চাবি নিয়ে লোহার বাক্সটি খুলে দেখা গেলো বাক্সের ভেতর রয়েছে একটা পার্চমেন্ট, তার ওপর লেখা. 'আজ ৬ই জুন ১৭৮৬, আমি কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো, এ লোহার বাক্সের ভেতর এ রুমালগুলি পুরে এই কমলালেবু গাছের তলায় পুঁতে রাখছি। এগুলো কাজে লাগবে আজ থেকে ষাট বছর পরে, রাজা লুই ফিলিপ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে একটি যাদুব

খেলা দেখাবার ব্যাপারে।' তলায় ক্যালিওস্ট্রোর স্বাক্ষর এবং তাঁর শীল-মোহরের ছাপ। দেখে রাজা লুই ফিলিপ এবং অন্যান্য সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। পার্চমেণ্টটি তুলে ফেলতেই দেখা গেলো তার তলায় একটা ছোট পুঁটুলির মুখ শীল করা, তাতেও বিগত শতাব্দীর কুখ্যাত যাদুকর ক্যালিওস্ট্রোর নামাঙ্কিত শীল-মোহরের ছাপ! শীল ভেঙে পুঁটুলিটি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সেই রুমালগুলো, যেগুলো একটু আগেই টেবিলের ওপর থেকে রহস্যজনকভাবে উড়ে গেছে!…"

রাজা লুই ফিলিপ এবং অন্যান্য দর্শকেরা এই 'অলৌকিক' ব্যাপার দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু উদ্যাঁর আত্মস্মৃতিতে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি ব্যাপারটা মোটেই অলৌকিক নয়, অনায়াসেই ধরে নিতে পারি ঐ বাক্স পুঁতিয়ে রেখেছিলেন ক্যালিওস্ট্রো নয়, উদ্যাঁ, এবং যাদু দেখাবার আমন্ত্রণ পাবার পরে। রাজা যাতে ঠিক এই গাছের তলাটাই পছন্দ করেন সে ব্যবস্থা করা চতুর যাদুকরের পক্ষে কঠিন হয় নি। আর রুমালগুলি? কি রকম রুমাল ধার পাওয়া যাবে তা আগে জেনে নিয়ে ঠিক ঐ রকম রুমালই হয়তো বাক্সের ভেতর রেখে দিয়েছিলেন উদ্যাঁ।

বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর অলৌকিক রহস্যসম্রাট ক্যালিওস্ট্রোকে এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে উদ্যাঁ খেলাটিকে আরো রোমাঞ্চকর করে তুলেছিলেন। ক্যালিওস্ট্রোর শীল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ক্যালিওস্ট্রোর বন্ধু যাদুকর টরিনির কাছ থেকে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যাদুসম্রাট উদ্যাঁ পরলোকে রওনা হয়ে যান। তাঁর ছেলেরা কিন্তু তাঁর যাদুকর জীবনের উত্তরাধিকারী হন নি।

* * * *

ফরাসী সরকারের অনুরোধে যাদুকর রূপে উদ্যাঁর আলজিরিয়া অভিযানের উল্লেখ করেছি সংক্ষেপে। কিন্তু তাঁর জীবনের এই অসাধারণ অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী করতে পারে। ফরাসী সরকার কেন বাধ্য হয়েছিলেন উদ্যাঁকে আলজিরিয়ায় পাঠাতে? কি উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন উদ্যাঁ, এবং কি কি কৌশলে? সেই কাহিনীই বলছি। আলজিরিয়ার অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ আরব বংশোদ্ভূত। যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি অশিক্ষিত, সরল বিশ্বাসী, কুসংস্কারগ্রস্ত। তাদের সরল বিশ্বাস আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল আরব মোল্লা বা পুরোহিত জাতীয় চতুর ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের ভেলকি ভোজবাজি দেখিয়ে

নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করে তাদের উপর বেশ গভীর এবং ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আলজিরিয়ার অশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী দুর্ধর্ষ আরবদের কাছে এদের কথা ছিলো বেদবাক্যের মতো, সেই সুযোগে এই মোল্লারা তাদের নানাভাবে উস্‌কানি দিয়ে ফরাসী সরকারের প্রতি বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন করে তুলতো। ক্রমে ক্রমে আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, ফরাসীরা কিছুতেই আর আলজিরিয়ায় তাদের আধিপত্য রক্ষা করতে পারবে না, ফুরিয়ে এসেছে তাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির দিন। ফরাসী সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভীতির ভাব দ্রুতবেগে মুছে যেতে লাগলো তাদের মন থেকে। তারা ভাবলো তাদের এই মোল্লাদের যাদুবিদ্যার ক্ষমতা অদ্ভুত অলৌকিক, অসম্ভবকে সম্ভব করা যে এদের কাছে ছেলেখেলা, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ভোজবাজির অনেক খেলায়, সুতরাং এরা যখন ফরাসী আধিপত্যের পতন আসন্ন বলে ঘোষণা করছে তখন সত্যিই তা আসন্ন। তা ছাড়া আর কিছু না হোক, এদের অলৌকিক যাদুর জোরেই ফরাসী সরকার হটে যাবে, বাপ বাপ বলে পালাতে পথ পাবে না।

আলজিরিয়ার ফরাসী শাসন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারের ভেতর আগামী মহা-বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা জানিয়ে খবর পাঠালেন খোদ ফরাসী সরকারের কাছে। ফরাসী সরকার গভীরভাবে ব্যাপারটি ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত করলেন পুলিশ, মিলিটারী বা গোলাগুলি দিয়ে এ জিনিসের মূল ওপড়ানো যাবে না, মূল ওপড়াবার সেরা এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ চতুর ভেলকিবাজ মোল্লাদের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ফরাসী সরকার আমন্ত্রণ জানালেন ফরাসী যাদু-গৌরব রবেয়ার উদ্যাঁকে। ইউরোপময় তখন তাঁর অসামান্য 'অলৌকিক' যাদুর অসাধারণ খ্যাতি।

এতদিন শুধু জনমনোরঞ্জনের জন্যই তিনি যাদুর খেলা দেখিয়ে এসেছেন। এবার যাদু দিয়ে রাজনৈতিক জগতে দেশকে সেবা করবার সুযোগ পেয়ে তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব শিরোধার্য করে নিলেন। যাদু প্রদর্শনের সরঞ্জামাদি নিয়ে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স শহরে উপস্থিত হলেন যাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ ও সম্প্রদায়। সেখানকার সেরা থিয়েটার হলে শুরু হলো তাঁর যাদু প্রদর্শন। তামাশা দেখবার সুযোগ পেয়ে পুলকিত হলো সেখানকার আরব

জনসাধাবণ, কিন্তু তাদেব নিজেদের মোল্লা-যাত্বকরদের যাত্বর তুলনায় এই সাদা যাত্বকবের যাত্ব যে নিতান্তই ছেলেখেলা মাত্র হবে, সে বিষয়ে এদের কাবও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে বলে মনে হলো না।

কিন্তু উদ্যাঁ-র "হালকা আব ভারি বাক্স" (Light and heavy chest) খেলাটি দেখে সমবেত আরবদের মনে জাগলো বিস্ময় আতঙ্ক। খেলাটা এই: একটা ছোটো হালকা বাক্স মঞ্চেব উপব বেখে একজন ভীমকায পালোযান আরবকে উদ্যাঁ বললেন, "দেখ তো এই বাক্সটা তুলতে পাবো কিনা।" বলা বাহুল্য অনায়াসে বাক্সটা তুলে ফেললো সেই পালোয়ান লোকটা। তুলে আবার রেখে দিয়ে তাচ্ছিল্যভবে হাসলো একটু। সেই তাচ্ছিল্যেব হাসিব ছোঁয়াচ লাগলো সাবা হলের আরবদেব মুখে। উদ্যাঁ তখন সেই আবব পালোযানটিকে বললেন, "এইবাব আমি আমাব যাত্বব বলে তোমাব দেহ থেকে শক্তি কেড়ে নিচ্ছি। ধীবে ধীবে তোমাব শক্তি কমে যাচ্ছে। আচ্ছা এইবাব চেষ্টা কবে দেখ তো বাক্সটি তুলতে পাবো কিনা।" আবার পরম তাচ্ছিল্যভরে সেই বাক্সেব হাতলে হাত লাগালো সেই অস্থবেব মতো শক্তিশালী আরব। কিন্তু বাক্সটি তুলবাব চেষ্টা কবতে গিয়েই তাব মুখেব হাসি ঘুচে গেলো। দেহেব সমস্ত শক্তি প্রযোগ কবলো সে দাঁতে দাঁত লাগিযে। দেহেব পেশীগুলো শক্ত হযে উঠলো, সাবা দেহ কাঁপতে লাগলো থব থব করে। কিন্তু বাক্সটা সে কিছুতেই তুলতে পাবলো না! একি অলৌকিক ব্যাপার! কলিব এই ভীমকে কি যাত্বব বলে শিশুর চাইতে ত্বর্বল বানিযে দিয়েছেন যাত্বকব উদ্যাঁ, তাব দেহ থেকে শক্তি শুষে নিযে? সমবেত দর্শকদের মুখ থেকেও হাসি অদৃশ্য হযে গেলো এই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখে।

ব্যাপাবটা আর কিছুই নয, বৈত্ব্যতিক চুম্বকেব (electro magnet) প্রয়োগ। মঞ্চের নেপথ্যে উদ্যাঁর সহকাবী উদ্যাঁর ইশাবা অনুযায়ী বিত্ব্যৎ তবঙ্গ চালু করে দিলেই বাক্সর তলার লোহা মঞ্চের ওপরে লোহার সঙ্গে বৈত্ব্যতিক চুম্বকের আকর্ষণে আটকে থাকত, সে অবস্থায় (অর্থাৎ বিত্ব্যৎ তরঙ্গ চালু থেকে বৈত্ব্যতিক চুম্বকের আবর্ষণ যতক্ষণ বজায় থাকতো) মঞ্চ থেকে বাক্সটি তোলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের পক্ষেও সম্ভব হতো না। নেপথ্যে সহকারী বিত্ব্যৎ-তরঙ্গটি বন্ধ করে দিলেই বৈত্ব্যতিক চুম্বকের আকর্ষণ আর থাকতো না, স্থতরাং বাক্সটি অনায়াসে তোলা যেতো। কিন্তু সে সময় (অর্থাৎ এখন থেকে

একশো বছরেরও বেশি আগে) বিদ্যুৎশক্তি মাত্র নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে; ইউরোপেও তখন অল্প লোকই এই শক্তির খবর জানতো। আলজিরিয়ার এই আরবরা তো এ ব্যাপারে ছিলো একেবারে অজ্ঞ, সুতরাং তারা যে এ ব্যাপারটাকে ভুতুড়ে, অলৌকিক ভাববে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? যাদুকর উদ্যাঁ শুধু যাদুর চর্চাই করতেন না, বিজ্ঞান চর্চাও করতেন, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎতত্ত্বের। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুতের কার্য্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য প্যারী (Paris) শহরের একটি প্রদর্শনীতে তিনি একটি পদকও পেয়েছিলেন। যাদু-বিদ্যায় বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগে তিনিই বিশ্বের সর্বপ্রথম যাদুকর।

বাক্সটি তুলতে না পেরে সেই পালোয়ান আরবটি একবার হাল ছেড়ে দিযে তারপর মরিয়া হযে আবার চেষ্টা করতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যাঁর গোপন ইঙ্গিতে নেপথ্যের সহকারী এমনভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালালেন যে বিদ্যুতের শক খেয়ে লোকটা হঠাৎ অবসন্ন বোধ করলো। তার দুটি হাঁটু বেঁকে গেলো আর কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়তে বাধ্য হলো। নেপথ্য থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতেই পেছন দিকে ছিটকে পড়ে গেলো লোকটা। তারপর "ইয়াল্লা!" বলে চিৎকার করতে করতে পালিযে গেলো। জীবনে সে বুঝি কখনো এমন নাকাল হযনি, এমন ভয় পাযনি।

আরবদের আরো যেসব খেলা উদ্যাঁ আলজিরিয়ায় দেখিয়েছিলেন, তাদের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি বা ফর্দ দেবার দরকার নেই, যে খেলাগুলো তাদের সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিলো তাদের কথাই বলি। একটি খেলায় একজন আরবকে তিনি মঞ্চের ওপর ডেকে আনলেন। এনে বেতের তৈরি একটা বড়ো ঝুড়ি চাপা দিলেন তার ওপর। তারপর ঝুড়িটি তুলে নিতেই দেখা গেলো জলজ্যান্ত লোকটা বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে কয়েকজন আরব দর্শক ভয়ে চিৎকার করতে করতে হল থেকে বেরিয়ে গেলো, পাছে এই শ্বেতকায় যাদুকর বেতের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে তাদেরও অমনি করে উড়িয়ে দেন। কিছুক্ষণ বাদে সেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া লোকটাকে আবার সশরীরে হাজির হতে দেখে সবাই দুচোখ কপালে তুলে বললে, ইয়া আল্লা!"

বন্দুকের গুলি ধরার খেলাটা প্রথমে একটু নতুন ভাবে দেখালেন উদ্যাঁ। একটা চিহ্নিত গুলি ভরা হলো বন্দুকে। একটি ছুরির ফলা উঁচু করে তাতে

একটি আপেল বিঁধিয়ে ধরে রইলেন যাছকর উদ্যাঁ। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হলো আপেলটিকে লক্ষ্য করে। গুলির ধাক্কায় নড়ে উঠলো আপেল, কেঁপে উঠলো উদ্যাঁর হাত। ছুরি দিয়ে আপেলটি কেটে তার ভেতর থেকে তিনি বার করে দেখিয়ে দিলেন বন্দুক থেকে সদ্য ছোঁড়া সেই চিহ্নিত গুলিটি।

আলজিয়ার্স শহরটি সমুদ্র উপকূলে। উপকূল পিছনে ফেলে উদ্যাঁ তাঁর যাছ প্রদর্শনী নিয়ে চলে গেলেন আলজিরিয়ার অভ্যন্তরে। সেখানে তিনি যাছর খেলা দেখাচ্ছেন, এমন সময় একজন আরব এগিয়ে এসে বললে, "আপনি তো মস্ত যাছকর। আমার নিজের পিস্তল দিয়ে আমাকে নিজের হাতে আপনার ওপর গুলি চালাতে দিতে পারেন?"

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে জান বিপন্ন হবে বটে, কিন্তু গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে সঙ্গে সঙ্গে মান যাবে; শুধু নিজের মান নয়, ফরাসী জাতির। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলজিরিয়ায় এসেছেন, তা ব্যর্থ হযে যাবে। সুতরাং জান বিপন্ন করেও তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বললেন, "পারি, এবং দেবো। কিন্তু তার আগে আমার সহায়ক শক্তির আবাহন করে নিতে হবে। কাল রাত্রে তোমাকে আমি সুযোগ দেবো।"

পরদিন ভোরবেলা উদ্যাঁ এই বিপদসংকুল ছুরূহ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। মোম এবং ভুসা (lamp black) মিশিয়ে তাই দিয়ে পিস্তলের এক-জোড়া নকল টোটা তৈরি করলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই যন্ত্রপাতির কাজে আর বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে অসামান্য দক্ষতা ছিলো তাঁর। টোটা ছুটি প্রায় হুবহু আসল টোটার মতো হলো। একটি টোটার বহিরাবরণ জমে শক্ত হতেই তাতে একটি ফুটো করে ভেতরের মোম বার করে ফেলে সেই ফাঁপার ভেতর খানিকটা রক্ত পুরে দিয়ে মুখটা আবার বুজিয়ে দিলেন।

পরের রাত্রিতে যাছ প্রদর্শনের সময় সেই সন্দেহগ্রস্ত আরব লোকটির হাতে একটি ছোটো প্লেটে কতকগুলো পিস্তলের টোটা দিয়ে বললেন, "পরীক্ষা করে দেখো এগুলো সত্যি সত্যি সীসার তৈরি কিনা।"

লোকটি টোটাগুলো পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের পিস্তলটা দিলো যাছকর উদ্যাঁর হাতে। প্লেট থেকে একটি টোটা নিয়ে সেটিকে ঐ পিস্তলে পুরে তাতে বারুদ ঠেসে ঐ আরব লোকটির হাতে দিলেন যাছকর। টোটাটি তিনি যখন পিস্তলে পুরে দিচ্ছিলেন, তখন কড়া নজরে তার হাতের দিকে তাকিয়েছিলো

লোকটা। একটু কেঁপে উঠেছিলো যাদুকরের বুক, কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। তাঁর দক্ষ হাতের কৌশলে আগে থেকে হাতে লুকিয়ে রাখা একটি নকল টোটা (যার ভেতরে রক্ত নেই) চলে গেলো পিস্তলের ভেতব, আসল টোটাটি লুকিয়ে রইলো তার হাতে। অভ্যস্ত পাকা হাতে লুকানো টোটা ধরা পড়লো না আরব লোকটির চোখে।

পেছনদিকে কিছুদূর গিয়ে বুকের ওপর দু হাত আড়াআড়িভাবে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যাদুকর উদ্যাঁ। বললেন, "চালাও গুলি।"

লোকটা টিপে দিল পিস্তলের ঘোড়া। 'গুড়ুম' আওয়াজও শোনা গেল। কিন্তু একি? এতোটুকু টললেন না তো যাদুকর! দেখা গেলো দুই দাঁতের ফাঁকে তিনি সদ্য-নিক্ষিপ্ত টোটাটি ধরে ফেলেছেন! পিস্তল যে ছুঁড়েছিল সে নিজেই এসে উদ্যাঁর দাঁত থেকে টোটাটি নিয়ে দেখল সত্যিই এ তার পরীক্ষিত সীসার টোটা। (বোধকরি বলে দিতে হবে না সবার অলক্ষ্যে এক ফাঁকে হাতের টোটাটি মুখের ভেতর নিয়ে নিয়েছিলেন উদ্যাঁ, এবং আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন।)

যাদুকর বললেন, "কি আশ্চর্য! জলজ্যান্ত মানুষের গায়ে গুলি চালিয়েও এক ফোঁটা রক্ত বার করতে পারলে না? এই দেখো আমি গুলি মেরে ঐ দেয়ালের গা থেকে রক্ত বার করছি।"

বলে লোকটির হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে তাতে নতুন করে আর একটি টোটা ভরলেন তিনি। (বলা বাহুল্য রক্ত-পোরা দু নম্বর নকল টোটাটি এবার ভরে দেওয়া হলো পিস্তলে।) দেয়ালের সামনে গিয়ে পিস্তল ছুড়লেন উদ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের গায়ে রক্তের ছোপ পড়লো। আরবরা ভিড় করলো দেয়ালের কাছে। দেয়ালে হাত দিয়ে দেখলো সত্যিকারের রক্ত!

এতক্ষণ যা ছিলো বিস্ময়, সীমা ছাড়িয়ে তাই গভীর ভীতিতে পরিণত হল। এবার আরবদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে যাদুবিদ্যায় এই ফরাসী যাদুকরের কাছে তাদের যাদুকরেরা নিতান্তই শিশু।

যাদুকর উদ্যাঁর মন ভরে উঠলো আনন্দে। আলজিরিয়ার মোল্লা-যাদুকরের দুরন্ত সর্বনাশা প্রভাবের ভিৎ নড়িয়ে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না, আর একটু এগোনো দরকার। তিনি আরবদের বুঝিয়ে দিলেন, "এতোদিন ধরে তোমাদের আপন যাদুকরদের ভোজবাজির

ফাঁকিকে ফাঁকি বলে ধরতে না পেরে অলৌকিক ব্যাপার বলে তোমরা ভুল করে এসেছো। আমার খেলাগুলোও তেমনি একটিও অলৌকিক নয়। সব-গুলোই লৌকিক কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

যাত্নকর উদ্যাঁ তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে এবং নিপুণ নিখুঁত যাত্ন প্রদর্শনে আলজিরিয়ার আরবদের ওপর কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার কিছুটা আভাস দেবার জন্য তাঁদের দেওয়া বিদায়-অভিনন্দনপত্রের আংশিক ভাবানুবাদ নীচে দিচ্ছি:

"জয় হোক আল্লার!

"যিনি অজানাকে জানান, যাঁর মেহেরবানিতে আমরা মনের ভেতরকার সুন্দর ফুলগুলোকে বাইরে ফোটাতে পারি হরফের পর হরফ সাজিয়ে।

"বজ্র বিত্নুতের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ, ভূমি-উর্বর-করা বৃষ্টিধারার মতো, উদার বিধাতা আমাদের ভেতর পাঠিয়েছেন এ যুগের পরম বিস্ময়, বিস্ময়-উৎপাদনের শিল্পে ও বিজ্ঞানে অসামান্য সুপণ্ডিত মহামতি রবেয়ার উদ্যাঁ-কে।

"আমাদের এই শতাব্দীতে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। অতীতের সমস্ত বিস্ময় তাঁর সৃষ্ট বিস্ময়ের তুলনায় ম্লান। আমাদের যুগ তাঁকে আপন বলতে পেরে ধন্য হয়েছে।

"তিনি জয় করেছেন আমাদের হৃদয়। তাঁর বিস্ময়কর বিজ্ঞানের রহস্যময় খেলা দেখিয়ে তিনি অভিভূত করেছেন আমাদের মন। চোখের সামনে এতো রকমের অসম্ভব সম্ভব হতে আমরা আর কখনো দেখি নি। তাঁর বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি আমাদের যেসব অপূর্ব বিস্ময় দেখিয়ে গেলেন, সেজন্য আমরা চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।......

"তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করবার ভাষা নেই। বৃষ্টি যতোদিন ভূমিকে উর্বর করবে, রাত্রি যতোদিন চাঁদের আলোয় আলোকিত হবে, যতোদিন সূর্যের আলোর ত্নঃসহ তীব্রতা হ্রাস করবে মেঘমালা, ততোদিন তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্ত বিস্ময়ে অবনত থাকবে।"

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় বছর, ইংলণ্ডের আনুগত্য থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বছর, যা থেকে শুরু হয়েছে স্বাধীন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস। এই বছরে ইংলণ্ডের রাজধানীতে আবির্ভূত হলেন এক অসাধারণ রহস্যময় দম্পতি—অসুন্দর স্থূলকায় কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো (Count Cagliostro) এবং তাঁর সুন্দরী তন্বী তরুণী পত্নী সেরাফিনা।

লণ্ডনের সেরা অভিজাত পান্থশালায় মহা জমকালো বিরাট জুড়ি গাড়িতে চড়ে এলেন পত্নীসহ কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো। গাড়োয়ানের সাজ-পোশাকের জাঁক জমকেও চোখে চমক লাগে; গাড়ির আগে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে হুকুম-ববদার ভৃত্যদের জাঁকও কিছু কম নয়।

অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পবাক, নেপথ্য-বিলাসী এই নবাগত অতিথি ক্যালিওস্ট্রো। তাঁকে ঘিরে যেন এক অলৌকিক রহস্যের আবহাওয়া, তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন, এসেছেন অন্য কোন জগৎ থেকে। তেমনি রহস্যময়ী তাঁর সঙ্গিনী সেরাফিনা, মুখে তাঁর মোনালিসার হাসির চাইতেও রহস্যময় মৃদু হাসি, দুচোখে তাঁর বহু দূরের স্বপ্নময় ইঙ্গিত, পরীর মতো হাল্‌কা যেন তাঁর পদক্ষেপ।

এই দুজনের আগমনে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটলো সে অ[illegible] মানসিক আবহাওয়ায়; বাসিন্দারা তাঁদের স্নায়ুতে অনুভব করলেন এক বি[illegible]ত্র, অবর্ণনীয় এবং কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর শিহরণ। কারা এই দুজন? এসেছেন কোথা থেকে, এবং কেন? এঁদের চলাফেরা হাবভাব সব কিছুতেই রহস্য জড়ানো। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখার আভিজাত্য এঁদের; কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তো দূরের কথা, পরিচিত হবারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ এঁদের দেখা যাচ্ছে না। পান্থশালার অন্যান্য অতিথিরাও বড় একটা এঁদের দর্শন পাবার সুযোগ লাভ করেন না। এঁদের আহার্যও সম্পূর্ণ আলাদাভাবে, কাউণ্টের বিচিত্র নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরি করে এঁদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের খানা পাকানোর পদ্ধতিতেই যে শুধু বিশেষত্ব তা নয়, কাউণ্টেরই নির্দেশমতো কিছু কিছু অদ্ভুত দ্রব্যও তাতে মেশানো হয়। পান্থশালার মুগ্ধ মালিক সদাই তটস্থ

পাছে এই অসাধারণ দম্পতির এতটুকুও অসুবিধা ঘটে ; এমন দরাজ হস্ত, দিল-দরিয়া, অভিজাত, রহস্যময় অতিথি তিনি জীবনে আর কখনো পাননি। অর্থ দিয়ে এই কাউন্ট যেভাবে ছিনিমিনি খেলেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে তিনি অসাধারণ ঐশ্বর্যবান।

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো এবং তাঁর পত্নী সেরাফিনা সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল শুরু হলো চারধারে, শুরু হলো তাঁদের নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা। এই রহস্যময় দম্পতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন দেখা গেলো খুব সুলভ নয়, তখন অদম্য কৌতূহল মেটাবার জন্য অনেকে শরণ নিলেন কাউন্টের ভৃত্যদের। ভৃত্যদের মুখে যা শোনা গেলো তাতে রহস্য বরং আরো বেড়ে গেলো, ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা অথবা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতি। প্রভু এবং প্রভুপত্নী সম্পর্কে ভৃত্যেরা সবাই একমত : এঁরা অসাধারণ ঐশ্বর্যবান, অসাধারণ দিলদরিয়া, অসাধারণ রহস্যময়, এবং এঁরা দুজনেই, বিশেষ করে কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো, অলৌকিক শক্তির অধিকারী অতুলনীয় যাদুকর।

সেরাফিনা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী, তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র কুড়ি বছর হয়েছে, কিন্তু রটে গেল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম কৌশলে রটানো হলো) তাঁর বয়স ষাট বছর ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য! কি করে এই স্থির যৌবন সম্ভব হলো? ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেলো (অর্থাৎ কায়দা করে ক্যালিওস্ট্রোই প্রকাশ করালেন) এই স্থির যৌবনের উৎস হচ্ছে যাদুকর ক্যালিওস্ট্রোর আপন হাতে প্রস্তুত করা সঞ্জীবনী রসায়ন—"মিশরী মদ"। এ রসায়ন প্রস্তুতের প্রকরণ কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো বহু সাধনায় বহু অন্বেষণ আর গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন মিশরের প্রাচীন গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার থেকে, এ কথাও প্রচারিত হয়ে গেলো। এই রহস্যময় সঞ্জীবনী রসায়নের অসীম ক্ষমতা যৌবন প্রলম্বিত এবং বার্ধক্য বিলম্বিত করে আয়ু বৃদ্ধি করবার, মৃত্যুকে পিছিয়ে দেবার, হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনবার।

আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ রটলো ক্যালিওস্ট্রো সম্বন্ধে—তাঁর কাছে এমন দ্রব্য আছে, যার সাহায্যে কয়েকটি গোপন প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি যে-কোনো সস্তা ধাতুকে সোনায় পরিণত করে দিতে পারেন। এই বিদ্যা বা প্রক্রিয়ার নামই 'অ্যালকেমি' (Alchemy)।

যেমন রটে গিয়েছিলো, শ্রীমতী সেরাফিনাকে প্রায় নবযৌবনার মতো দেখালেও তিনি ষাট বছরের বুড়ি, অথবা তিনি বয়সে ষাট হলেও দেখতে যুবতী,

তেমনি এও রটে গিয়েছিলো যে, এই রহস্যময় কাউন্টকে দেখে তাঁর খুব বেশি বয়স মনে হলেও তিনি বহুকালের বুড়ো, তাঁর বয়েসের গাছপাথর নেই। নানা-রকম উদ্ভট সৃষ্টি-ছাড়া অনুমান বা গবেষণা চলছিলো তাঁর বয়স সম্বন্ধে। প্রত্যক্ষ-ভাবে নয় (বলাই বাহুল্য), পরোক্ষভাবে নিজের সম্পর্কে এই নানারকম উদ্ভট কল্পনাকে উস্কে তুলতে সদা যত্নবান ছিলেন কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হতে হতে নানারকম গাঁজাখুরি কিম্বদন্তী প্রচারিত হয়েছিলো তাঁর সম্বন্ধে। যেমন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এবং জুলিয়াস সীজারকে নিজের চোখে দেখেছেন ক্যালিওস্ট্রো ; দেখেছেন রোম শহর আগুনে পুড়ে ছাই হবার দৃশ্য দেখতে দেখতে পরম পুলকে বেহালা বাজাচ্ছেন রোম-সম্রাট নিরো ; এমন কি, যীশু খ্রীষ্টকে যখন ক্রুশ-বিদ্ধ করা হচ্ছিলো, তখন ক্যালিওস্ট্রোও ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন !

মানুষ চায় নিজের যৌবন প্রলম্বিত করতে, ফিরে পেতে চায় হারানো যৌবন, চায় অনেক দিন বেঁচে থাকতে। সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণও প্রচণ্ড। আর মানুষ যা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে তাই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা হয়, আর এই ইচ্ছাই প্রবল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম দক্ষতার সঙ্গে মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ধাপ্পা-কৌশলী কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো। অনেকের মতে ধাপ্পা-জগতের ইতিহাসে তিনি এখন পর্যন্ত অপরাজিত শিল্পী। পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসেও ক্যালিওস্ট্রোর নাম চিরস্মরণীয়।

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো কিন্তু আসলে কাউন্টও ছিলেন না, ক্যালিওস্ট্রোও নয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিলো জোসেফ (বা 'গিউসেপ্পি') বল্‌সামো, ডাক নাম ছিলো 'বেপ্পো'। তিনি জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় ১৭৪৩ সালে, সিসিলি দ্বীপের প্যালার্মো শহরে এক নিতান্ত গরীব পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দোকানদার। দুষ্টু ছেলে বেপ্পোর নানারকম উৎপাতে পাড়ার লোক অস্থির, শহরের লোক অস্থির। বেপ্পোর যেমন ষণ্ডা চেহারা, তেমনি সে বেপরোয়া ডানপিটে, বিবেকের কোনো বালাই তার নেই।

বারো বছর বয়সে বেপ্পোকে এক স্কুলে পাঠানো হলো বিদ্যাচর্চার জন্য। সেখানে গুরুমশাইদের সঙ্গে বেপ্পোর ব্যক্তিগত সম্পর্কটা তেমন প্রীতিপূর্ণ হলো না, তাঁদের হাতের প্রচুর কানমলা খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি পালালেন সেই স্কুল

থেকে। তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। মায়ের উদ্যোগে তিনি ভর্তি হলেন এক মঠে। মার বিশ্বাস মঠের সাধু-সন্ন্যাসীদের শিক্ষাধীনে কিছুদিন থাকলে ছেলের স্বভাবচরিত্র শোধরাবে। কিছুদিন বাদে বেপ্পো হলেন মঠের চিকিৎসকের সহকারী ; তাঁর কাজ হলো ওষুধের শিশি বোতল ধুয়ে সাফ করা, ওষুধের গাছ-গাছড়া লতাপাতা সংগ্রহ করা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেপ্পো এই চিকিৎসকের কাছে কিছু কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছু জ্ঞানও আয়ত্ত করে নিতে লাগলেন। শিষ্যের শিখবার অসামান্য আগ্রহ আর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে এই চিকিৎসক গুরুটি খুশী হলেন তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে বেপ্পোর ওপর আরেকটি কাজ চাপতো—তিনি আহারের সময়ে সাধু-মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনকাহিনী মোটা মোটা গ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন মঠের সাধুদের। এই 'মহাপুরুষ'দের অলৌকিক ক্ষমতার নানা কাহিনী পড়ে শোনাতে শোনাতে বেপ্পো বলসামোর কল্পনাপ্রবণ মন ভরে উঠলো নানা রকমের মতলবে আর রঙীন স্বপ্নে : ঐ রকম 'অলৌকিক' শক্তির নমুনা দেখিয়ে তিনিও কি লাভ করতে পারবেন না প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ, সম্মান ?

মঠের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে একদিন বেপ্পো যে দুষ্টুমি কাণ্ড করলেন, তাতে তিনি মঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। জালিয়াতিতে তাঁর হাতটি ছিলো পাকা। মঠ থেকে বেরিয়েই তিনি নানা মক্কেলের হয়ে দলিল এবং দস্তখত ইত্যাদি জাল করে দিয়ে, এবং আরো নানা ধরনের চতুর অসদুপায়ে অনায়াসেই অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন।

একবার মারানো (Marano) নামে এক স্বর্ণকারের গভীর আস্থা অর্জন করে তিনি তাঁকে বোঝালেন সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এক পাহাড়ের গুহার ভেতর মাটির তলায় রয়েছে বহুমূল্য গুপ্তধন। এই গুপ্তধনের সন্ধান দেবার বিনিময়ে মারানোর কাছ থেকে বেপ্পো কিছু পরিমাণ সোনা আগাম দক্ষিণা নিয়ে নিলেন। বেপ্পোর নির্দেশমতো মারানো কোদাল আর গাঁইতি নিয়ে সেই গোপন গুহায় মধ্যরাত্রে গেলেন বেপ্পোর সঙ্গে, উদ্দেশ্য—ঐ গুপ্তধন খুঁড়ে বার করা। বেপ্পো রহস্যময় ভঙ্গীতে বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে মাটির ওপর ফস্‌ফোরাসের সাহায্যে যাদুচক্র আঁকলেন : ফস্‌ফোরাসে আঁকা বৃত্তটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো মধ্যরাত্রির ঝাপসা অন্ধকারে। বেপ্পো তারপর অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষায় নানারকম মন্ত্র পড়ে মারানোকে বললেন ঐ যাদু-বৃত্তের ভেতর খনন কার্য শুরু করতে। কাজ শুরু

করলেন মারানো। আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরপুর, আজ বহুমূল্য গুপ্তধনের অধিকারী হবেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একি? বিকট চীৎকারে আতঙ্ক জাগিয়ে যেন শয়তানেরই চেলা-চামুণ্ডারা একসঙ্গে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কীল-ঘুঁষি চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে তুললো স্বর্ণকার মারানোকে। সেদিন গুপ্তধন পাওয়া তো দূরে থাক, মার খেয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে আর ছেঁড়া জামা নিয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মারানো। তাঁর সঙ্গে টাকা-কড়ি যা কিছু ছিলো তা কেড়ে রেখে দিয়েছিলো ঐ শয়তানের অনুচরগুলোই। মারানো টের পেলেন ওরা যে শয়তানের চেলা, সে শয়তান স্বয়ং বেপ্পো; বেপ্পোরই ধাপ্পায় ভুলে তিনি বিশ্রী রকম বোকা বনেছেন। ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—এই প্রতারণা, অপমান আর প্রহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। আইনের সাহায্য নিতে গেলে নিজের বোকামিই প্রকাশ হয়ে পড়বে, বেপ্পোকেও তেমন কিছু জব্দ করা যাবে না, তাই ধনী স্বর্ণকার মারানো স্থির করলেন যে, ভাড়াটে ঘাতক দিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে গুম করে ফেলবেন। মারানোর প্রতিশোধ এড়াবার জন্য বেপ্পো প্যালার্মো শহর ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন।

প্যালার্মো থেকে পালাবার পর থেকেই শুরু হলো তাঁর নানা দেশে ভ্রমণ: গ্রীস, মিশর, আরব, পারস্য, রোডস দ্বীপ, মালটা, নেপলস্, ভেনিস, রোম। নিজেকে ঘিরে একটা অদ্ভুত রহস্যগম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখা আর কাহিনী বানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সর্বত্রই তিনি ধাপ্পার জোরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। লোক ঠকিয়ে প্রচুর পয়সা কামাতে তাঁকে কখনোই খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি, এমনি আশ্চর্য ছিলো তাঁর ধাপ্পা-প্রতিভা এবং অভিনয়-ক্ষমতা। রোম নগরীতে এসে তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। তিনি বিবাহ করলেন লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি নাম্নী এক সুন্দরী দর্জি-কন্যাকে। শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন হলো যেন। সামান্য এক দর্জির মেয়ে হলেও লোরেন্‌জার রক্তে ছিলো অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, চিত্তে ছিলো রোমান্টিক কল্পনা আর উচ্চাশা। তিনি বুঝলেন এই লোকটিই হবেন তাঁর যোগ্য জীবন-সঙ্গী; এঁর ভেতর যে মাল-মশলা আছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে জীবনের অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এঁর সহযোগিতায় পূর্ণ করে নেওয়া যাবে।

দক্ষ পরিচালিকার হাতে পড়ে এক আলাদা রূপ পেলেন বেপ্পো বল্‌সামো। নিজের ভ্রাম্যমাণ জীবনের যে সব আষাঢ়ে গল্প অম্লান বদনে বলে যেতেন নির্লজ্জ

মুখর বেপ্পো, তারই মধ্যে লোরেন্‌জা পেলেন অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয়। বেপ্পোর আত্মম্ভরিতায় তিনি দেখলেন অসামান্য আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভর। তাঁর অসুন্দর বিপুল দেহভারে দেখলেন ওজনদার ব্যক্তিত্ব। সৃজনী কল্পনার চোখে লোরেন্‌জা দেখলেন তাঁর বিধাতা-প্রেরিত এই জীবন-সঙ্গীটির ভবিষ্যৎ রূপ। দেখে পুলকিত হলেন। খুব সম্ভব বেপ্পো বল্‌সামোর অসামান্য ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা এক লহমায় দেখে নেবার মতো দূরদৃষ্টি লোরেন্‌জার ছিলো বলেই তিনি সানন্দে বরমাল্য পরিয়েছিলেন বেপ্পোর স্থূল কণ্ঠে। নইলে লোরেন্‌জার মতো সুন্দরীর বেপ্পো বল্‌সামোর মতো অসুন্দরের প্রেমে পড়বার অন্য কোনো কারণ ছিলো না।

তালিম দিয়ে দিয়ে স্বামী বেপ্পোর বদ্‌গুণগুলোকে সদ্‌গুণে পরিণত করতে লাগলেন লোরেন্‌জা। স্থূল হাবভাব আর স্বভাবগুলোকে মার্জিত করে তুললেন যথাসম্ভব, অগোছালো আবোল তাবোল মিথ্যাভাষণগুলোকে বেশ করে গুছিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ কাহিনীতে পরিণত করে দিযে, সেই কাহিনীটিতেই অভ্যস্ত করে তুললেন বেপ্পোকে। সমাজের উঁচুমহলে মেলামেশা করবার উপযুক্ত আদব-কাযদা-দুরস্ত হযে উঠতে লাগলেন বেপ্পো বল্‌সামো—তাঁকে তালিম দিতে লাগলেন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী জীবনসঙ্গিনী লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি।

তালিম ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে পর বেপ্পো বল্‌সামো হলেন 'কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো'। লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি হলেন 'সেরাফিনা'। তারপর শুরু হলো তাঁদের যুগ্ম ধাপ্পা-অভিযান, নিপুণ অভিনয়ে, অসাধারণ পরিকল্পনায়, বেপরোয়া দুঃসাহসিকতায় এবং দীর্ঘ সাফল্যে পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। জমকালো চারঘোড়ায় টানা গাড়িতে—সঙ্গে এক ঝাঁক জাঁকালো উর্দিপরা ভৃত্য নিয়ে ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে লাগলেন পত্নী 'সেরাফিনা' সহ 'কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো'। যেখানে যেতে লাগলেন সেখানেই অর্থ ছড়াতে লাগলেন দরাজ হাতে, বহুজনের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। চারিদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে গেলো—রহস্যময়, রাশভারি, অমিত ঐশ্বর্যবান, দিল-দরিয়া কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রোর। অকাতরে দান, দরিদ্রনারায়ণের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা এবং ধনী হোমরা-চোমরাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা অসংখ্য হৃদয়ে তাঁকে অসামান্য শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিলো।

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রোর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অসংখ্য আষাঢ়ে ধাপ্পা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক গোগ্রাসে গিলেছিলো ভেবে বিস্ময়ে আত্মহারা হবার কারণ নেই, কেন না, এই বিংশ শতাব্দীতেও বহু ধাপ্পা বহু শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, এবং সে সব ধাপ্পাকে বেদ-বাক্য বলে মেনে নেবার মতো লোকেরও অভাব হচ্ছে না। দুনিয়ায় উজবুকের অভাব কোনোদিন হয় না বলেই বুজরুক ধাপ্পাবাজেরও কোনোদিন অভাব হয় না।

'অলৌকিক' প্রতারক ক্যালিওস্ট্রো যে যুগে তাঁর বুজরুকি দিয়ে বিরাট পসার জমিয়েছিলেন, সেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ছিলো যুক্তির যুগ, বুদ্ধির যুগ, মগজের যুগ, যাকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে 'এজ অভ রীজন্' (Age of Reason)। হৃদয়বৃত্তির চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশি ছিলো বলেই সে যুগের সাহিত্যে কাব্যের চাইতে গদ্যেরই বিকাশ বেশি হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পেলো, তখন এই বিরাট বিশ্বে আপন তুচ্ছতা উপলব্ধি করে মানুষের হতাশা, ভীতি এবং অসহায়তাবোধও বাড়লো, যা থেকে আমাদের মন চাইলো মুক্তি। আমাদের মন স্বাভাবিকভাবেই সান্ত্বনা খুঁজলো অলৌকিক-রহস্যে, যা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত,সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্মম সত্য বা বাস্তব থেকে মানুষ চাইলো রহস্যের রাজ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে, মুক্তি পেতে চাইলো অমোঘ নিয়মের নিগড় থেকে। মানুষের স্বভাবই এই। তাই তো যে যুগের ফরাসী দেশে দেখি ভোলতেয়ারের মতো নির্মম বাস্তববাদী লেখক, সে যুগের ফরাসী দেশেই বহু রূপকথারও সৃষ্টি হয়েছিলো। ডারউইনের (Darwin) বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ যে যুগে প্রকাশিত হয়েছিলো সে যুগেই রচিত হয়েছিলো লিউইস ক্যারল-এর আষাঢ়ে রূপকথা 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' : রূঢ় বাস্তব আর নানা নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তির কামনা বা 'পলায়নী মনোবৃত্তি' গড়ে উঠেছিলো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপেই।

রূঢ় অপ্রিয় বাস্তবের আওতা থেকে পলায়নের বিভিন্ন রকমের পথ আছে। আছে নানা রকমের দ্রব্যগুণ ; আছে তথাকথিত ধর্ম বা অধ্যাত্মবিলাস, মনো-জগতের সূক্ষ্ম আফিম : আছে এক দিকে সঙ্গীত শিল্প, সাহিত্য আর অন্যদিকে নৈতিক জাহান্নামের পথ। আর আছে যাদু, যা জব্দ করে বিধাতাকে, বাতিল করে দেয় প্রকৃতির নিয়মাবলী ; যার মন্ত্রবলে দৈবকে পরাভূত করতে চায় মানুষ।

এই যাদুর ক্ষেত্রকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিলেন অসাধারণ দম্পতি ক্যালিওস্ট্রো-সেরাফিনা।

সেরাফিনাই তালিম দিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামীটিকে শিখিয়েছিলেন তাঁর প্যালার্মো শহরের জীবন একেবারে ভুলে যেতে। ঠিক হলো তিনি এখন থেকে বিশ্বাস করবেন তিনি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ট্রেবিজণ্ডরাজ্যের শেষ নৃপতির হতভাগ্য পুত্র, সেই রাজ্যের পতনের পর পালাবার পথে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ে তিনি মক্কা শহরের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। সহৃদয় প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন, এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে সামান্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার রহস্যময় বিদ্যা আয়ত্ত করেন। দামাস্কাস শহরে বহু প্রাচীন গুপ্তবিদ্যার ভাণ্ডারী মহাগুরু আলমোটাসের কাছ থেকেও নানা গুপ্তবিদ্যার গভীর জ্ঞান তিনি লাভ করেন। সেরাফিনার নির্দেশে এই কাহিনী মনে মনে বার বার আওড়াতে আওড়াতে ক্যালিওস্ট্রো এই বানানো কাহিনীকেই সত্য বলে কল্পনা করতে লাগলেন, অভিনেতা যেমন করে তাঁর অভিনীত ভূমিকা চরিত্রের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

সেরাফিনাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার আগে বেপ্পো-র কাজ ছিলো শাঁসালো শিকারদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে বেশ কিছু দাঁও মেরেই তাদেব নাগালের বাইরে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেরাফিনার হাতে পড়ে যখন তিনি হলেন মহা রহস্যময় অলৌকিক গুপ্তবিদ্যার ভাণ্ডারী কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, তখন তাঁর কর্মধারা গেলো একেবারে বদলে। তখন আর পলায়ন নয়, তখন লক্ষ্য হলো অলৌকিক মহাজ্ঞানের ভাঁওতা দিয়ে মুগ্ধ অন্ধ ভক্ত শিষ্যের দল তৈরি করা এবং কায়েমিভাবে তাদের দলভুক্ত করে রাখা। তারা যেন এমন এক গুপ্ত মহা-সম্প্রদায়ের দীক্ষিত সদস্য, যার প্রধান পুরোহিত মিশরী গুপ্তমহাবিদ্যার মহাবিদ্বান ক্যালিওস্ট্রো, এবং মহানেত্রী সেরাফিনা।

ক্যালিওস্ট্রোর আবাসে যে আধ-অন্ধকার ঘরে অলৌকিক চক্র-বৈঠক বসতো, তার দরজায় লেখা থাকতো :

সাহস রাখো!

নীরব থাকো! ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো!

চক্র বৈঠকে যাকে তাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো না, কারণ এ সব অলৌকিক ব্যাপারে অধিকারী ভেদ আছে, অবিশ্বাসীর স্থান নেই। যাঁরা

অধিকার পেতেন তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন—এ অধিকার পাবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্যালিওস্ট্রোর ভৃত্যদের খোসামোদ করে তাদের গুপ্ত সাহায্য নিতে হতো, এবং সেজন্য তাদের কিছু ঘুষও দিতে হতো।—

যে ঘরে চক্র-বৈঠক বসতো তার ছাদ, মেঝে এবং চার দেয়াল থাকতো কালো কাপড়ে ঢাকা, সেই কাপড়ের বুকে সাদা সুতোয় নানাবকম সাপের নক্সা আঁকা। প্রদীপ জ্বলতো মৃদু, রহস্যময়। একটা বেদীর ওপর কয়েকটি নরকঙ্কাল। দু পাশে গুপ্তবিদ্যাবিষয়ক পুঁথির স্তূপ। অনুভূতিপ্রবণ, সহজবিশ্বাসী মানুষের মনে এই ধরনের গা ছমছম করানো পরিবেশ এবং আবহাওয়ার প্রভাবের কথা ভালোই জানা ছিলো মানব চরিত্রে অভিজ্ঞ মহাধূর্ত এবং মহা অভিনেতা কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রোর। অদ্ভুত, জমকালো, বীভৎস নানারকম অনুষ্ঠান দিয়ে তিনি এই আবহাওয়াকে আরো রহস্যময় করে তুলতেন। লৌকিক যাদুবিদ্যার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এই পরিবেশে তিনি নানারকম অলৌকিক লীলা দেখাতেন, এবং একবার স্বয়ং শয়তানের আবির্ভাবও ঘটিয়েছিলেন।

কাঁচের তৈরি একটি গোলক ছিলো তাঁর। সেই গোলকটিকে জলে পূর্ণ করে রেখে দিতেন চক্রের মাঝখানে। সেই রহস্যময় গোলকের সামনে নতজানু হয়ে বসতেন এক সুন্দরী তরুণী, গোলকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ক্যালিওস্ট্রো তখন মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে কয়েকটি অলৌকিক শক্তিকে আদেশ করতেন ঐ কাঁচের গোলকের ভেতরে প্রবেশ করতে। বৈঠকে যাঁরা উপবিষ্ট, তাঁরা সবিস্ময়ে দেখতেন গোলকের ভেতরের জল যেন কোন রহস্যময় শক্তির আলোড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, উত্তাপে ফুটতে শুরু করেছে যেন টগবগ করে। গোলকের মুখোমুখী ধ্যানমগ্না সুন্দরী তরুণীটি চঞ্চল হয়ে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে, মনে হতো তাঁর সারা দেহে শিহরণ জেগেছে। নানা বিভিন্ন দেশে তখন কি ঘটছে, তরুণী যেন ঐ গোলকের ভেতরের জলে দেখতে পেতেন তারই চলচ্ছবি, আর তাই বর্ণনা করে যেতেন মুখে মুখে। শুধু বর্তমানই নয়, ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিবিম্বও ঐ জলের বুকে দেখে বর্ণনা করে যেতেন তিনি। চক্র-বৈঠকে উপস্থিত সবাই রোমাঞ্চিত শিহরণে অধীর হযে উঠতেন এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে।

ইউরোপের বড় বড় শহরে ভ্রমণ করতে লাগলেন ক্যালিওস্ট্রো। মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তে পরিণত করলেন অর্থবৈভবে পদগৌরবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সে যুগের বহু হোমরা চোমরা ব্যক্তিকে।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালিওস্ট্রো গেলেন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী শহরে। এখানে তাঁর সব রকম স্থবিধা করে দিলেন ফরাসী রাজবংশীয যুবক কার্ডিনাল ছ্য রোহাঁ (Cardinal de Rohan)। ছ্য রোহাঁ ক্যালিওস্ট্রোর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হয়ে তাঁর অলৌকিক শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

সারা প্যারী শহর ক্যালিওস্ট্রোকে নিয়ে মেতে উঠলো। তাঁর ভবনে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় বসতে লাগলো চক্র-বৈঠক, ক্যালিওস্ট্রোর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি মুখে মুখে ছড়াতে লাগলো দাবানলের মতো। মন্ত্রমুগ্ধ ধনী মূর্খদের ভাণ্ডার থেকে প্রচুর অর্থ ছু হাতে লুটতে লাগলেন ক্যালিওস্ট্রো অনায়াসে। সারা প্যারী শহর শুধু নয়, সারা দেশটাই তখন ক্যালিওস্ট্রোর মতো জমকালো বুজরুকের জন্য যেন তৈরি হয়েই ছিলো। জীবনের সত্যিকারের মূল্যবান সব কিছুর প্রতি তখন সবার উদাসীনতা এবং তাচ্ছিল্য; উদ্ভট অলৌকিক ব্যাপার এবং অসার জমকালো বুজরুকির হুজুগে মেতে উঠতে সবারই অসীম আগ্রহ। হুজুগপ্রিয় সমাজ বুজরুক-সম্রাট ক্যালিওস্ট্রোকে পেযে যেন বর্তে গেলো। তাঁকে ঘিরে যে রহস্যের আবহাওয়া, তাই তাঁকে আরো মোহনীয় করে তুললো।

লোভ এবং দুঃসাহস বেড়ে উঠলো ক্যালিওস্ট্রোর। শেষ পর্যন্ত ফরাসী দেশের রানী মারী আঁতোয়ানেৎ-এর (Marie Antoinette) হীরার নেক-লেসের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তিনি প্যারী শহরের বিখ্যাত 'বাস্তিল' (Bastille) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিছুদিন পরেই তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু প্যারী শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। (এই 'বাস্তিল' একদিন ধ্বংস হবে বলে ক্যালিওস্ট্রো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; সেটি সত্য হয়েছে।)

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে—ফরাসী বিপ্লবের বছর—ক্যালিওস্ট্রো ছিলেন রোম নগরীতে। সেখানে বেপরোয়া দুঃসাহসী ক্যালিওস্ট্রো মিশরী মহাবিদ্যার গুপ্তমঠ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। খৃষ্টান জগতের প্রধান পুরোহিত পোপের নিজস্ব এলাকায় এতো বড়ো দুঃসাহস করার ফলে ধরা পড়লেন তিনি, এবং ধর্মীয় বিচারালয়ের (Holy Inquisition) বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পরে পোপ মৃত্যুদণ্ড মকুব করে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পরের বছর কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুটি অলৌকিক কাহিনী

ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগে কলকাতার মাইল পনেরো দূরে একটি মফস্বল শহর। রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসেছে তার বুক জুড়ে। বিভিন্ন রকমারি জিনিসের সারি সারি দোকান, নানা বিচিত্র প্রদর্শনীর তাঁবুও পড়েছে এখানে ওখানে মাঠের ওপর ছড়িয়ে। এ শহরে সারা বছরের সেরা মরশুম। এই মেলা চলবে কয়েকদিন ধরে। কেনা-বেচা আর আমোদ-প্রমোদ হবে খুব, তাতে যোগ দিতে এসেছে, আসছে অনেক বাইরের মানুষ। নানা বয়সের, নানা জাতের, নানা রুচির, নানা চরিত্রের। এই বিশেষ মরশুমি আনন্দের আবহাওয়া ছড়িয়ে আছে সারা শহর জুড়ে।

কিন্তু কান্নায় ভরে উঠেছে পুলিশ থানা। কাঁদছে কে? একটি বিধবা স্ত্রীলোক। কেন? তার একমাত্র সন্তান চার বছরের ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্ত্রীলোকটির স্বামী পয়সাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেনি। রেখে গিয়েছিলো শুধু মাথা গোঁজবার মতো একটি কুঁড়েঘর আর এই একমাত্র সন্তানটিকে আড়াই বছরের রেখে। বৈধব্যের শুরু থেকেই এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করে কষ্টেসৃষ্টে মোটামুটি একরকম করে চালিয়ে নিয়েছে বিধবা স্ত্রীলোকটি। ছেলের মুখ চেয়ে কোনো কষ্টই গায়ে মাখে নি। কিন্তু তার সবে ধন নীলমণি বুকের মাণিককে হারিয়ে দিয়ে বিধাতা যে অমানুষিক শয়তানি করেছে, এ কষ্ট সে আর সইতে পারছে না; দারোগাবাবু তার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে না দিলে সে আর এ ছার প্রাণ রাখবে না, এই থানাতেই মাথা কুটে মরবে।

বিধবার এই ভীতি-প্রদর্শনে দারোগাবাবু ভীত না হলেও অস্বস্তি বোধ করলেন। স্ত্রীলোকটি দেহে প্রাণ রাখবে কি না রাখবে তা নিয়ে তাঁর মাথা মোটেই ব্যথিত নয়, কিন্তু সে এই থানার ভেতরেই প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, যাকে বলে 'নুইস্যান্স'। আর এই মেয়ে মানুষটিকে যেরকম বেপরোয়া নাছোড়বান্দা দেখা যাচ্ছে, তাতে ওর পক্ষে অমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঘটানো কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। ওদিকে থানার

ভেতরে বামাকণ্ঠের এই ব্যাকুল কান্নায় থানার বাইরে ছোটোখাটো রকমের একটা কৌতূহলী ভিড় জমে গেছে। ব্যাপার কি? থানার ভেতর মেয়েমানুষ অমন করে কাঁদে কেন?

কৌতূহলী জনতাকে কৌতূহলে না রাখাই ভালো বিবেচনা করে বাইরের খোলা বারান্দায় এসে বসলেন দারোগা বাবু। সেইখানে এসে বিধবা স্ত্রীলোকটি তার ছেলে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনাতে লাগলো দারোগাবাবুকে। অদূরবর্তী জনতার কানে পৌঁছতে লাগলো সেই কাহিনী।

শুনে বোঝা গেলো কাল রাতে বিধবা স্ত্রীলোকটি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের দরজায় যথারীতি খিল এঁটে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার অনেক পরে নিজে ঘুমিয়েছিলো। আজ অন্যান্য দিনের মতোই ভোরে উঠে দেখে ছেলের বিছানা ছেলেহীন, দরজার খিল খোলা। কোথায় গেলো ছেলে? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়েছে কি? কিন্তু রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রকৃতি তো তাকে বড়ো একটা ডাকে না। আর প্রকৃতির ডাকে বাইরে যাবার দরকার হলেও সে সাহস করে একা বেরোবার ছেলেই নয়, নিশ্চয়ই সে মাকে ঠেলে জাগাতো।

দারোগাবাবু শুধালেন, "বিছানায় ছেলেকে না দেখে তুমি কি করলে?"

"কেঁদে উঠলুম, দারোগাবাবু।"

"তারপর?"

"তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে ডাকতে লাগলুম। এধারে ওধারে খুঁজলুম। কোথাও সাড়া পেলুম না।"

"কোনো বাড়িতে গিয়ে ছেলে বসে নেই তো?"

"কাছে পিঠে তেমন কোনো বাড়ি নেই দারোগাবাবু।" বললে স্ত্রীলোকটি। "তবু যে সব বাড়িতে কাজ করি খোঁজ নিয়েছি। কোথাও সে যায় নি।"

দারোগা আরো জেরা করলেন, জেরার জবাবও পেলেন, কিন্তু তাতে রহস্যের কোনো কিনারা পেলেন না। অথচ নালিশকারিনী এমন কোনো দামী ব্যক্তি নয়, যার ছেলে হারিয়েছে বলে শহরের পুলিশবাহিনীকে ব্যস্ত করে তুলতে হবে।

"তোমার ছেলেকে কেউ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে বলে সন্দেহ হয়?" প্রশ্ন করলেন দারোগাবাবু।

স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে বললে, না।

"তবে? তবে আর আমরা কি করবো? তোমার ছেলের জন্যে সারা রাজ্য তোলপাড় করে বেড়াবো?"

তখন অদূরে উপস্থিত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভেতর গবেষণা শুরু হলো: অনেক 'হয়তো' এবং অনেক 'বোধ হয়' শুনতে পাওয়া গেলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো ব্যাপারটা একটু রহস্যময়—যে ডাকে বিধবার ছেলেটি সাড়া দিয়েছিলো, সে প্রকৃতির ডাক নয়, নিশির ডাক। লৌকিক নয়; অলৌকিক।

'অলৌকিক' শুনে দারোগাবাবু বোধ করি একটু খুশী হলেন, কারণ তাহলে এ ব্যাপারে লৌকিক পুলিশের মাথা না ঘামালেও চলবে।

প্রবীণ গোছের এক ভদ্রলোক বললেন, "আমার তো মনে হয়, বুঝলে গো মেয়ে, তোমার ছেলের ওপর কিছুর ভর হয়েছে। রোজা ডেকে ঝাড়াও।"

শুনে আরেকজন বললেন, "বলেছো ভালো। ছেলেকে পেলে তবে তো ওঝা ডেকে ঝাড়াবে।"

সুতরাং মীমাংসা হলো ছেলেটিকে ঝাড়াবার আগে তাকে খুঁজে বার করা দরকার।

তখন একজন লোক দারোগাবাবুকে বলল, "হুজুর অভয় দেন তো একটা কথা বলি।"

"দিলাম। বলো।" বললেন দারোগাবাবু।

লোকটি বললে, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন যাদুকর 'তকমাওয়ালা সাঁই'-এর কথা। ঐ যে দেখা যাচ্ছে মেলার মাঠ, তাতে পড়েছে তকমাওয়ালা সাঁইয়েরও তাঁবু। এই মাত্র কলকাতা থেকে বিকেলের গাড়িতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। সারা কলকাতায় তাঁর যাদুর খ্যাতি। বিস্ময়কর তাঁর নানা রকম যাদুর খেলা; বিস্ময়কর তাঁর সম্মোহন, যাকে বলে 'মিসমেরাজিম'। জিন আর পরীদের সঙ্গে কথা কইতে পারেন এই অসামান্য মায়াবী। যাদুবিদ্যার বহু লুপ্ত রত্ন তিনি উদ্ধার করেছেন। তিনি কি রহস্যময়ভাবে হারিয়ে যাওয়া বালকটিকে তাঁর অলৌকিক শক্তিতে উদ্ধার করে দিতে পারবেন না? তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লে হয়তো ছেলেটিকে ফিরে পাওয়ার কিছু সুবিধা হলেও হতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেটির মা তখন কেঁদে দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললে, দারোগাবাবুই তার একমাত্র ভরসা, ঐ সাধু সন্ন্যেসি-ফকির বুজরুকে তার বিশ্বাস নেই।

কিছুতেই পা ছাড়ে না যে ; আচ্ছা আপদ তো !

"সব ঠিক করে দিচ্ছি", ভরসা দিয়ে দারোগাবাবু নিমন্ত্রণ পাঠালেন যাত্নকর তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়ের তাঁবুতে। সেই নিমন্ত্রণবাহী দূতের সঙ্গে কয়েকজন চেলা নিয়ে এসে হাজির হলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, ত্নই চোখে নির্ভীক বেপরোয়া দৃষ্টি, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। মাথায় কালো রুমাল বাঁধা। পরনে রেশমের জামা, পা-জামা। পায়ে শৌখিন নাগরা। গায়ে রেশমি জামার বুকের ওপরে ত্নলছে অনেক মেডেলের মালা। 'তকমাওয়ালা' বিশেষণের মূলে এই মেডেল। গলায় বিভিন্ন রঙের পাথরের মালাও ত্নলছে একটি।

দারোগাসাহেবকে সসম্ভ্রমে সালাম ঠুকে দাঁড়ালেন তকমাওয়ালা। মানী মানুষ মানী মানুষকে সম্মান দেখাচ্ছে, এই ভাব। হাসিমুখে দিলেন নিজের পরিচয় :

"যাত্নকর নারাসা, তক্‌মাওযালা সাঁই। আপনার বান্দা। কি হুকুম হয় ?"

অলৌকিক ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, একটা রহস্যময় ব্যক্তিত্ব আছে বটে লোকটার। সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন দারোগাবাবু। একেবারে চেয়াবের মর্যাদা দিতে তবু বাধলো হযতো, একটা টুল এনে বসতে দিলেন। দারোগাবাবুর হুকুমে সেই স্ত্রীলোকটি বহুকষ্টে কান্না চাপতে চাপতে তার ত্নঃখের কাহিনী শোনালো যাত্নকরকে।

পরিস্থিতিটা নাটকীয়ও বটে, রোমান্টিকও বটে। চুরি, রাহাজানি, খুন, ডাকাতির বাইরে আজকের এই ব্যাপারটি, এতে ক্রাইম নেই, রোমাঞ্চ আছে ; একটু নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া গেলো। তাই আজ আর ততোটা 'অফিশিয়াল' নন দারোগাবাবু ; অনেক কমিযে দিয়েছেন তাঁর রাশভারিয়ানা।

হঠাৎ উপস্থিত কৌতূহলীদের পেছনের লাইনে একজন একটু হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন বৈত্নত্যিক 'শক' খেয়ে টুল থেকে লাফিয়ে উঠে সেই হাসির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন যাত্নকর নারাসা, ওরফে 'তক্‌মাওয়ালা সাঁই'। ঐ হাসি তাঁকেই বিদ্রূপ করে, এই সন্দেহে জ্বলে উঠলো তাঁর ত্নটি চোখ। অদ্ভুত তাঁর এই দ্রুত পরিবর্তন। হঠাৎ শূন্য থেকে ডান হাতের থাবায় অদৃশ্য কি যেন ধরে নিয়ে ফুঁ দিয়ে মন্ত্রপূত করে তাকে ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করলেন সেই লোকটিকে লক্ষ্য

করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গিযে লোকটি অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ সংকুচিত করে গোঙাতে লাগলো। যাঁরা 'বাণ মারা'-র গল্প শুনেছিলেন, তাঁরা বাণ মারাব এই চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত হলেন, ভীতও হলেন। দারোগাবাবুরও সেই অবস্থা। লৌকিক ক্ষমতাওয়ালা মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা দেখে অস্বস্তি বোধ করে বললেন:

"এ কেয়া হুয়া?"

তক্‌মাওয়ালা সাঁই বললেন, "এ হলো বেতমিজ বেওকুফের মগজে একটু আক্কেল ঢোকাবার ব্যবস্থা। লোকটাব এতো বড়ো স্পর্দ্ধা, সে অলৌকিক শক্তিকে হেসে উপহাস করে?"

বাণাহত লোকটির অবর্ণনীয় দুর্দশায বেশ একটা আতঙ্কেব সৃষ্টি হলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো এই 'বাণ'-এর নিদারুণ বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে অল্পক্ষণেব ভেতবই লোকটি দম আটকে মাবা যাবে। যাদুকবেব সঙ্গী শিষ্যটিও অত্যন্ত ভয পেযে গেলো, শেযে ওস্তাদকে নরহত্যাব দাযে পডতে না হয। সে ব্যাকুল হযে বলতে লাগলো—"বাণ ছুড়া লী জীযে ওস্তাদ।"

দাবোগাবাবুও চিন্তিত। কিন্তু মোটেই যেন চিন্তিত হননি, এই ভাব দেখিযে তিনিও তকমাওযালা যাদুকরকে অনুরূপ অনুবোধ কবলেন।

দারোগা সাহেবেব হুকুম অমান্য কবতে পারলেন না তক্‌মাওযালা সাঁই। অসহ্য যন্ত্রণায কাতব লোকটির দিকে বাবরার তিনবাব মন্ত্রপূত মুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে তিনি আগেকার বাণের বন্ধন কেটে দিলেন। লোকটির কাতরানি বন্ধ হলো, তারপব সে ধীবে ধীরে উঠে বসে অবসন্ন কণ্ঠে বলল, "জল।"

জল দেবার উপক্রম হচ্ছিল। যাদুকবেব শিষ্য বলে উঠল, 'খবরদার। এখনই পানি দিলে কলিজা ফেটে মরে যাবে। বাণের চোটটা আগে সামলে নিক। তার বাদে পানি।"

হঠাৎ রাগের মাথায যাদুবাণ মেবে ফেলে তক্‌মাওযালা সাঁই বোধ কবি একটু অনুতপ্তই হযেছিলেন; চোট যে এতোটা লাগবে তিনি তা বুঝতে পাবেন নি। লোকটিকে দাঁড় করিযে তাব শিরদাঁড়ায কযেকবার হাত বুলিযে দিযে তাকে সুস্থ করে তুললেন, জল খাওযালেন। তারপর মৃদু হুঁশিয়ারির সুবে বললেন, "অ্যায়সা ঔব কভী মৎ কবনা।" অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিকে উপহাসের দুঃসাহস আর কোরো না। লোকটি নাকে খত দেবার ভঙ্গিতে বিদায় নিযে কেটে পড়ল।

বিধবা স্ত্রীলোকটির এইবারে বিশ্বাস হলো এই রহস্যময় আগন্তুকটির অলৌকিক ক্ষমতায়। "আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে ফকির সায়েব।" বলে সে লুটিয়ে পড়লো তক্‌মাওয়ালা যাত্নকর নারাসার পায়ে।

এই ধরনের হুজুগি-খবর ছড়াতে বেশি দেরি লাগে না। থানার অনতি-দূরবর্তী কৌতূহলী ভিড় বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো।

কিন্তু তামাসা সেদিন আর কিছু হলো না। ট্রেন থেকে এই একটু আগে মাত্র নেমেছেন, এখনো একটুও বিশ্রাম হয়নি, এই অজুহাতে মাফ চাইলেন তকমাওয়ালা। ছেলে ভোরে বেরিয়ে কোথাও গেছে, নিশ্চয় রাতের আগেই ফিরে আসবে। যদি না আসে? "তো কাল দেখা যাবে। বান্দা তো হাজিরই থাকবে হুজুর। কালই হুকুম করবেন আপনি", বলে হুজুরের অনুমতি নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন সশিষ্য যাত্নকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। তাঁকে আজ আর ঘাঁটাতে চাইলেন না দারোগাবাবু।

পরদিন ভোরবেলা। থানার অদূরের ফাঁকা জায়গায় মস্ত ভিড়। বিধবার ছেলে ফিরে আসেনি। কাল সাইকেলে চড়ে পুলিশ কনস্টেবলরা অনেক জায়গায় তালাস করেছে, হারানো ছেলের কোনো পাত্তা মেলে নি। তাই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতকর্মা তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়েব অলৌকিক শক্তির শরণ নেওয়া হয়েছে।

ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করা হযেছে একটা। তাতে একদিকে বসলো হারানো ছেলেটির মা, তার উল্টো দিকে বসলেন শিষ্যসহ তক্‌মাওয়ালা সাঁই। উপস্থিত জনগণের সামনে সাঁইয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হলো হারিযে যাওযা ছেলেটির ব্যবহৃত একটি ফতুয়া দিয়ে।

স্বর্গীয় ওস্তাদের নামে মন্ত্র পড়ে ফতুয়াটিকে মন্ত্রপূত করে নিলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা ঢুলতে লাগলো। ফতুয়া ছুটে যেতে চাইছে ছেলেটির কাছে. তাই টান পড়ছে তক্‌মাওয়ালার মাথায়! ফতুয়া যেদিকে যেতে চাইছে সেই দিকে গাড়োয়ানকে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন তক্‌মাওয়ালা। গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে লাগলো সেই ভাবে ধীরে ধীরে। গাড়ির দুধারে আর পিছনে কৌতূহলী জনতার সারি। কি এক রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি অমোঘ টানে টেনে নিয়ে চলেছে ফতুয়াটিকে, সেই টানে এগিয়ে চলেছেন ফতুয়া-সংলগ্ন তক্‌মাওয়ালা সাঁই, আর তক্‌মাওয়ালা-সংলগ্ন ঘোড়ার গাড়ি!

ফতুয়ার টানে দুএকবার সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই। দেখে সবাই শিহরিত, বিস্মিত।

কিছু দূর গিয়ে ফতুয়ার টানের ইঙ্গিত পেয়ে তক্‌মাওয়ালা বললেন ডাইনে গাড়ি ঘোরাতে। গাড়োয়ান ডাইনে গাড়ি ঘোরালো। কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে, তারপর ফের ডাইনে। কৌতূহলী, বিস্ময়মুগ্ধ দর্শকদল চললো সঙ্গে সঙ্গে। বিধবা স্ত্রীলোকটির মনের ভেতর কি ভীষণ তুফান চলছে কে জানে? তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে বার করে তার বুকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন কি এই রহস্যময় পুরুষ? ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলেছে কৌতূহলীর দল। তারা লক্ষ্য করছে সন্তান হারানো বিধবা মায়ের মুখমণ্ডলে আশা নিরাশার নিদারুণ দ্বন্দ্ব।

ঘোড়া দুটি গাড়ি টানছে ধীরে, অতি ধীরে। এতে তাদের মেহনত বেশি, কিন্তু উপায় নেই; জলদি এগোতে গেলেই মুখের লাগামে প্রচণ্ড টান পড়ছে।

হারানো ছেলেটির একটি ফতুয়া জড়িয়ে তক্‌মাওয়ালার চোখ বাঁধা। সেই অবস্থাতেই তিনি চুপচাপ তাঁর আসনে বসে আছেন, আর গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন শুনছেন কান পেতে।

মফস্বল শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর জনবিরল পথ বেয়ে গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। সহসা চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রহস্যময় যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। কোথা থেকে যেন কোন রহস্যময় ইঙ্গিত তাঁর কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তক্‌মাওয়ালা।

পদব্রজে যাঁরা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন কৌতূহলের তাড়া খেতে খেতে, তাঁদের কৌতূহলী উত্তেজনা এইবার চরমে উঠলো। কিসের ইঙ্গিত শুনেছেন তক্‌মাওয়ালা। কোন দিক থেকে এসেছে সে ইঙ্গিত?

দেখা গেলো তকমাওয়ালার শিষ্য বা সাগরেদটিও গুরু অর্থাৎ ওস্তাদের এই অদ্ভুত ভাব পরিবর্তন দেখে চমকে উঠেছে, একটু ভীতও হয়েছে যেন, হঠাৎ হলো কি ওস্তাদের?

সবিনয়ে শুধালে ওস্তাদকে। ওস্তাদ বললে- "গাড়ি থামাও।" উলটো দিকের আসনে একা বসেছিলো হারানো ছেলেটির মা, তার ব্যাকুল হৃদয় বুঝি হঠাৎ আশার আলোর ঝলকানিতে একটু ঝলমল্ করে উঠলো। তবে কি সফল

হবেন এই দৈবপ্রেরিত অলৌকিক শক্তিমান মহাপুরুষ ? তার হারিয়ে যাওয়া বুকেব মাণিক আবার কি তার বুকে ফিরে আসবে ?

দাঁড়িয়ে পড়েছে কৌতূহলী জনতা। দেখা যাক এইবার কি হয। শিষ্যের হাত ধরে গাড়ি থেকে নামলেন যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। যাদুকরের নির্দেশে গাড়ি থেকে নামানো হলো সেই সদ্য নিরুদ্দিষ্ট-সন্তান বিধবা স্ত্রীলোকটিকে।

গাড়ি থেমেছিল এক গৃহস্থের বাড়ির সামনে। বাড়ি মানে মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনির খান দুই ঘর। এক পাশে একটি গোয়াল ঘর।

মন্ত্রপূত ফতুয়ার টানে শিষ্যের হাত ধরে ঐ গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তক্‌মাওয়ালা। তাঁর পিছু পিছু গেলো সেই বিধবা। পিছু পিছু মহাকৌতূহলী জনতা।

ব্যাপাব দেখে এগিয়ে এলেন গৃহস্থ আব গৃহস্থপত্নী। দুজনেই বিস্মিত, ভীত।

তক্‌মাওযালা এগিযে গেলেন গোযাল ঘবের দিকে। গোয়াল ঘরের সামনে দাঁড়িযে চোখের নিমেষে খুলে ফেললেন চোখেব বাঁধন—ফতুয়াটা যেন তাব হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো বিরাট খড়েব গাদায। তক্‌মাওয়ালা বললেন, "মন্ত্রপূত এই ফতুয়াই—ফতুয়ার মালিকের সন্ধান দিয়েছে। তোমার ছেলে আছে এই খড়ের গাদারই ভেতর।"

সত্যিই তাই। ঐ খড়ের গাদা থেকেই উদ্ধার করা গেলো বিধবার হারানো ছেলেকে। সে ছেলে পবম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে আছে। জানে না তাকে নিয়ে এতো হৈ হৈ কাণ্ড।

হারানিধিকে ফিরে পেয়ে অসহ্য আনন্দে বিধবা স্ত্রীলোকটি কান্নায় আকুল হয়ে উঠলো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হট্টগোলে জেগে উঠলো ছোট্টো ছেলেটি। বিস্ময়ে অবাক। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "একি ? কোথায় আমি ? এখানে কেন ? বাবা কোথায ?"

বাবা ! সে তো অনেক আগেই ওপারে রওনা হয়ে গেছে ; তার কথা বলে কেন ছেলে ? আর এখানে সে এলোই বা কি করে ?

চার বছর বয়সের ছেলেটির মুখের এলোমেলো কথা গুছিয়ে নিয়ে যা বোঝা গেলো তা শুনে ছেলের বিধবা মার দুচোখ কপালে উঠলো। সর্বনেশে ছেলে বলে কি ? শেষরাতে তার বাবা এসে ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে

গিয়েছিলো ; তারপর বাবার সঙ্গে সে কোথায় কোথায় কতক্ষণ ঘুরেছে, আর তারপর কখন কেমন করে এই খড়ের গাদার ভেতর এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, তা সে নিজেই জানে না।

শুনে ভিড়ের ভেতর অনেকে শিউরে উঠলেন। কারণ ছেলেটির বাবা মারা গেছে বছর দেড়েক আগে। পরলোকগত বাপ এসে তার ইহলোকের ছেলেকে ঘর ছাড়িয়ে এতোদূর নিয়ে এসে এই নিরালা গৃহস্থবাড়ির গোয়াল ঘরে খড়ের গাদায় রেখে গেছে, এ যে ভয়ানক অলৌকিক ভূতুড়ে ব্যাপার। এমন লোমহর্ষক অদ্ভুত ঘটনা এ অঞ্চলে গত সিকি শতাব্দীর ভেতরও ঘটে নি। বিধবা স্ত্রীলোকটি তার ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ভয়ে আর আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

"রোও মত। কুছ ডর নেহি।" বললেন যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। অর্থাৎ 'কেঁদো না। কোনো ভয় নেই।'

ভীতা স্ত্রীলোকটি তবু হাউ হাউ করে কেঁদেই সারা। ছেলের বাপের যখন নজর পড়েছে তখন ছেলেকে নিযে আবার উধাও হবে। তখন?

"কুছ ডর নেহি।" আবার ধ্বনিত হয়ে উঠলো তক্‌মাওয়ালা যাদুগুণীর অভয়বাণী।

এদিকে গৃহস্থ বেচারাও ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনায় নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করেন, ভূত বাপ তার ছেলেকে এনে তাঁরই গোয়ালের খড়ের গাদায় রেখে দিয়ে গেলো কেন? তবে কি তাঁর গৃহস্থালীর ওপর সেই ভূতটির নজর পড়েছে? এরপর কি তাঁকে যখন তখন ভূতের উপদ্রব সইতে হবে?

গৃহস্থ ব্যাকুল হয়ে হাতে পায়ে ধরে অনুনয় করতে লাগলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁইকে, ভৌতিক উৎপাত থেকে তাঁর গৃহস্থালীকে মুক্ত করে দিয়ে যেতে। মন্ত্র পড়ে গৃহস্থের গৃহস্থালীকে এমন করে দিয়ে যেতে হলো গুণী যাদুকরকে, যেন এই ছেলের মৃত বাপ বা অন্য কোনো ভূত এ বাড়ির বা গোয়াল ঘরের কাছাকাছিও আসতে না পারে।

অদ্ভুত, রহস্যময় সেই মন্ত্র। জলদগম্ভীর কণ্ঠ, বিচিত্র উচ্চারণ ভঙ্গি। চমকিত হলো, অভিভূত হলো, উপস্থিত জনগণ তক্‌মাওয়ালার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্ময়কর!

আগুনের মতো খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, হারানো ছেলেকে কেবল

মাত্র ছেলেটির ফতুয়ার সাহায্যে অদ্ভুত ভাবে উদ্ধার করে দিয়েছেন সদ্য আগত অলৌকিক শক্তিশালী যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। শহরময় বিখ্যাত হয়ে গেলেন যাদুকর তক্‌মাওয়ালা। যাঁরা তাঁকে দেখেননি তাঁরা আকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার জন্যে; যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা উদ্‌গ্রীব হলেন তাঁর অলৌকিক শক্তির আরো নমুনা দেখে চমৎকৃত হবার জন্য। সুতরাং যখন জানা গেলো অলৌকিক যাদুর খেলা দেখাবার জন্যেই তাঁর এই আগমন, এবং খেলার মাঠে এই জন্যেই তাঁর তাঁবু পড়েছে, সেই তাঁবুর ভেতর সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে তাঁর অসামান্য যাদুর খেলা মেলায় কয়েকদিন ধরে দেখতে পাওয়া যাবে, তখন সেই সামান্য দর্শনী অনেকেই দিতে লাগলেন নিঃসন্দিগ্ধ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং মুগ্ধও হতে লাগলেন তক্‌মাওয়ালার বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে। কারণ হস্ত-কৌশল এবং যান্ত্রিক কৌশলের নানারকম যাদুর খেলায় (যাকে সোজা কথায়, এবং বিদেশী ভাষায় আমরা বলি 'ম্যাজিক') তিনি ছিলেন সুদক্ষ, আশ্চর্য সিদ্ধি লাভ করেছিলেন প্রচুর সাধনা করে; তাই নিতান্ত লৌকিক কৌশলের ছলনাগুলোও তাঁর পরিবেশনের যাদুতে অলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত।

শুধু যাদু প্রদর্শনীর দর্শনী থেকেই যে তক্‌মাওয়ালার আয় হলো তা নয়। বিভিন্ন আকার, আয়তন, রঙ এবং গুণের পাথর এবং মন্ত্রঃপূত তাবিজ-মাদুলী ইত্যাদিও বিভিন্ন দামে বিলি করতেন এই 'অলৌকিক গুণী'। অনর্গল বক্তৃতায় তিনি ফর্দ দিয়ে যেতেন দুনিয়ার কোন কোন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং কোথা থেকে দুর্লভ পাথর সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে সাধারণ মানুষের আর অবিশ্বাসের সুযোগ থাকতো না। তক্‌মা-ওয়ালার মুখের এক একটি কথা যেন এক একটি বেদবাক্য। সুতরাং পাথর আর মাদুলী প্রচুর বিক্রী হলো তক্‌মাওয়ালার ভাণ্ডার থেকে।

মেলার মেয়াদের শেষে যাকে যা দেবার দিয়ে থুয়েও বেশ কিছু অর্থ ঝুলিতে ভরে নিয়ে গেলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই।

এবারে দুম্বর কাহিনী। একটি রেলওয়ে স্টেশন। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, ঘণ্টা পড়ে গেছে, গার্ডের হুইস্‌ল্‌ বেজেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলিয়ে দিয়েছেন, কান কাঁপানো সিটি বেজেছে ইঞ্জিনের বাঁশিতে, কিন্তু গাড়ি ছাড়ছে না। ব্যাপার কি? গাড়ি ছাড়ছে না কেন? গাড়ি ছাড়ছে না, কিন্তু সময়

এগিয়ে চলেছে হু হু করে। কামরায় কামরায় শুরু হলো যাত্রীদের গুঞ্জরণ। অনেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। প্ল্যাটফর্মে নেমেও পড়লেন কৌতূহলী কেউ কেউ।

দেখা গেলো ইঞ্জিনের সামনে প্ল্যাটফর্মের এক ধারে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন একজন দীর্ঘকায় দরবেশ; চাপা রাগে তাঁর মুখ লাল, দু চোখে আগুন। তাঁর অনতিদূরে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে—জড়ো হয়েছে ছোটোখাটো একটি অর্ধ ভীত, বিস্মিত, কৌতূহলী জনতা। তার ভেতর রয়েছেন একজন টি-টি-সি, অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকার। দেরি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে দুঃসহ হয়ে উঠলো, তখন উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন স্টেশন-মাস্টার। গার্ডসাহেব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, নিজেকে রাজার জাত বলে মনে করেন, নেটিভ ড্রাইভারের স্পর্ধা দেখে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর হুইস্‌ল্, আর সবুজ নিশান দোলানো অগ্রাহ্য করে এখনো ট্রেন থামিয়ে রেখেছে, এতো বড়ো দুঃসাহস লোকটার! অত্যন্ত রেগে তিনি আবার হুইস্‌ল্ বাজালেন, আবার সবুজ নিশান ঝাঁকালেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। গাড়ি যেমন ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। গার্ডসাহেব তখন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন ইঞ্জিনের দিকে, ড্রাইভারকে নিশান-পেটা করবেন যেন। গিয়ে দেখেন স্টেশন-মাস্টারও গিয়ে পৌঁছেছেন সেখানে। ড্রাইভার ইঞ্জিনের কল-কব্‌জা নাড়াচাড়া করে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছে না ইঞ্জিন, চলা শুরু করছে না গাড়ি। ড্রাইভারের চেষ্টার ত্রুটি নেই দেখে গার্ডসাহেবের কিছুটা রাগ গলে জল হলে তাঁর একটু যেন অনুকম্পাও হলো ড্রাইভার বেচারার ওপর। এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ক্যা, এঞ্জিনকা কোই যন্তর বিগড় গিয়া?" ড্রাইভার বললে, "নহি সাহাব, ইস্‌পর শায়দ কোই মন্তর লাগ গিয়া, যাদু-মন্তর। মন্তর নহি ছুটনেমে গাড়ি নহি ছুটেগী। তামাম কোশিশ বেকার হ্যায়।" অর্থাৎ ইঞ্জিনের ওপর সম্ভবত লেগেছে কোনো যাদুমন্ত্রের প্রভাব, সেই প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইঞ্জিন চালু হবে না, চলা শুরু করবে না গাড়ি, বিফল হবে সমস্ত চেষ্টা।

"ড্যাম ইওর মন্তর। সিলি সুপারস্টীশান। লেট মি সী। ট্রাই এগেন, ম্যান।" বলে ইঞ্জিনের ভেতর উঠে গেলেন গার্ডসাহেব। শুনে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো এক প্রবীণ ভদ্রলোক, সাহেবের কানে না পৌঁছয় এই রকম মৃদু-কণ্ঠে, বিড়বিড় করে বললেন, "ড্যাম নয় হে বাছাধন, সুপারিস্টীশানও নয়।

তোমাদেরই এক হোমরা-চোমরা জাত-ভাই একবার ড্যাম ইওর মথা বলে, তারপর ঐ মথার নামেই নাকে খত দিয়েছিলো! হেঁ হেঁ।" আরেক ভদ্রলোক তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আরে মশাই, ওদের শেক্‌স্‌পীয়ারই তো বলেছে দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ ছান আর ড্রেম্‌ট্‌ অভ্‌ ইন ইওর ফেলজফি।"

গার্ডসাহেব শুধু গার্ডগিরি জানেন, রেলগাড়ির ইঞ্জিন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রায় আমারই মতো। তবু তাঁর গায়ে রাজার জাতের চামড়া, এই বিশ্বাসের গরমে পরম বিজ্ঞতার ভঙ্গিতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "নাউ ট্রাই এগেন। ফির কোশিশ করো ম্যান।" তাঁর হয়তো ধারণা নেটিভ ড্রাইভারের সঙ্গে ইঞ্জিন যদি বা দুষ্টুমি করে থাকে রাজার জাতের এ হেন একজন জাঁদরেল প্রতিনিধির সামনে সে আর সাহস পাবে না কোনোরকম নষ্টামি করতে। কিন্তু না, রাজার জাতের উপস্থিতিতেও পরিস্থিতির কিছুমাত্র উন্নতি দেখা গেলো না। ড্রাইভারের সমস্ত চেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো, সচল হলো না ইঞ্জিন। শুধু দেখা গেলো সেই দীর্ঘকায় বিচিত্রবেশ বলিষ্ঠ দরবেশের মুখে ক্রোধের রক্তিমা দূর হয়ে দেখা দিয়েছে রহস্যময় কৌতুকের হাসি। ড্রাইভারের আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা, গার্ডসাহেবের ধাঁধাগ্রস্ত ভাব, স্টেশন মাস্টারের বিব্রত অবস্থা, এতগুলো লোকের বিস্ময়-বিমুগ্ধ কৌতূহল, সব কিছু যেন রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছেন তিনি।

গোটা স্টেশন্ জুড়ে অভূতপূর্ব শিহরণ, ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্‌সেশ্যন। সেই শিহরণ ছড়িয়ে পড়লো স্টেশনের বাইরেও। ঘন জঙ্গলে দাউ দাউ দাবানলের মতো জানাজানি হয়ে গেলো, এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ যাদুমন্ত্রের জোরে স্টেশনের প্লাটফর্মে রেলগাড়ি আটকে রেখেছেন, ছাড়তে দিচ্ছেন না। অলৌকিক ব্যাপার দেখবার জন্যে ক্রমেই আরো লোক জড়ো হতে লাগলো। স্টেশন-মাস্টার প্রমাদ গনলেন, প্রমাদ গনলেন গার্ডসাহেব। দেরির পর দেরি হয়েই চলেছে। কিছুতেই গাড়ি চালু করা যাচ্ছে না। এখন উপায়?

ভেবেচিন্তে একজন বিধান দিলেন, "রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তার-পথে খবর পাঠানো যাক মিস্ত্রি পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করে, মিস্ত্রিরা এসে যন্ত্রপাতি ঠিক করে ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে যাক।" আরেকজন বললেন, "ও বাবা! সে তো কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। ততক্ষণে পরের ট্রেণ এসে যাবে।" ড্রাইভার মাথা নেড়ে বললে, "নহী নহী, কোঈ মিস্‌তিরি উস্‌তিরিসে কাম নহি বনেগা। এন্‌জিন্‌কা

তামাম মন্তর তো বিলকুল ঠিক হ্যায়।" ড্রাইভারের চোখেমুখে বিরাট উদ্বেগের ভাব, ইঞ্জিনের যন্ত্র সব ঠিক আছে, তবু গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না কেন?

একজন বললেন, "তাহলে এরপর যে গাড়িটা আসবে সে গাড়িই এ গাড়িকে ঠেলে নিয়ে যাবে।" শুনে আরেকজন বললেন "ক্ষেপেছেন মশাই? এ গাড়ির সব চাকা যে জাম হয়ে আছে। ঠেলে নেবে কি করে? একটি চাকাও যে ঘুরবে না।"

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির কল্পনাও তাঁরা কোনোদিন করেননি; কিংকর্তব্য-বিমূঢ় চিত্তে অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন গার্ডসাহেব আর স্টেশন-মাস্টার। তখন এঞ্জিন থেকে নেমে এলো শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন-প্রায় ড্রাইভার; ভিড় ঠেলে দাঁড়ালো এসে পরম বিনীত ভঙ্গিতে দরবেশের সামনে। বললে, "গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে ওস্তাদ। বান ছোড়া লীজিয়ে, লৌটা লীজিয়ে আপকা মন্তর, তাকি হম স্টার্ট দে সকেঁ।" অর্থাৎ ক্ষমা করুন অপরাধ, বান ছাড়িয়ে নিয়ে যান, ফিরিয়ে নিন আপনার মন্তর, যেন আমি গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারি।

দরবেশ বললেন, "তুমহারা কোঈ কসুর নহী হ্যায় বেটা। কসুর জিসকা হ্যায় উও খুদ মাফী নহী মাঙনেসে বান হম ছুড়া নহী লেঙ্গে। চাহে যো কুছ হোয়।" অর্থাৎ দোষ তোমার কিছু নয় বৎস। যার দোষ সে নিজে এসে ক্ষমা না চাইলে আমি বান ছাড়িয়ে নেবো না। এতে যা হয় হোক।

ড্রাইভার তখন সমস্ত যাত্রীদের প্রতিনিধি হয়ে কাঁদোকাঁদো গদগদ ভঙ্গিতে নিবেদন করলে, "ইন লোগোঁকো তক্‌লীফ আপ সমঝ লীজিয়ে বাবা। ইন সভীকী তরফসে হম আর্‌জি পেশ কর রহে হ্যাঁয়। আপ মেহেরবানী কীজিয়ে, গাড়ী চলনে দীজিয়ে।" অর্থাৎ এতোগুলো লোকের অসুবিধার কথা একবার বিবেচনা করুন বাবা। এঁদের সবার পক্ষ হয়ে আমি আপনার শ্রীচরণে আরজি পেশ করছি, আপনি তা মঞ্জুর করুন, দয়া করে গাড়ি চলতে দিন।

দরবেশ ভ্রূকুটি করে বললেন, "যো হমারা কহনা থা উও তো ম্যায়নে কহ দিয়া। ফির বাত না করো।" অর্থাৎ আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। এরপর আর অনর্থক কথা বাড়িও না।

দরদী ড্রাইভার এতোগুলো লোকের তকলিফের কথাটা বেশ ভালোই ভেবে-ছিলো। ওর কথাটা উপস্থিত অনেকেরই মনঃপূত হলো। সত্যিই তো এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটকে থাকা ভয়ানক রকম বিরক্তিকর।

অচিরে জানা গেলো এ ব্যাপারে অপরাধী হচ্ছেন ঐ ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকারটি। দরবেশের কাছে টিকেট চেয়ে টিকিট পাননি, তাই বিনা টিকিটের যাত্রী বলে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। নেহাত দরবেশ বলেই তাঁকে শুধু নামিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, নইলে তাঁকে রেলওয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিতেন।

দরবেশ দাবি করলেন, "সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশের টিকেট লাগা অনুচিত!" নাছোড়বান্দা চেকার বললেন, "রেল কোম্পানীর কেতাবে তেমন কোনো আইন লেখা নেই।" দরবেশ বললেন, "রেল-কানুনসে ভি বড়া এক কানুন হ্যায়।" অর্থাৎ রেলওয়ে আইনের চাইতেও যে আইন বড়ো, সেই বড়ো আইন অনুসারে সাধু-সন্তদের বিনা টিকেটে ভ্রমণ করতে কোনো মানা নেই।

কিন্তু রেল কানুনের চাইতে বৃহত্তর সেই কানুন মানতে রাজী নন টিকেট-চেকার। তিনি গোঁ ধরে রইলেন, তিনি রেল কোম্পানীর নিমক খান, অতএব রেলেব আইনই তাঁর কাছে বেদবাক্য। দরবেশই হোক আব দরবেশের বাবাই হোক, বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ করতে তিনি কাউকে দেবেন না। চেকাবের সাধুতা আর কর্তব্য-পরায়ণতার এই অতি বাড়াবাড়িতে একদল যাত্রী ক্ষিপ্ত হযে উঠলেন। একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক রেগে বললেন, "রেখে দিন মশাই আপনার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির-গিরি। এমন এক আধজনা সাধু মহাপুরুষ বিনা টিকেটে রেলে চাপলে রেল কোম্পানী কিছু লাটে উঠবে না। আপনার একার পাগলামি জেদের দরুণ আমরা এই এতোগুলো লোক এখানে আটকে কষ্ট পাচ্ছি, সে কথাটা আপনি একবার বিবেচনা করছেন না? আপনার ঐ চুলচেরা যুধিষ্ঠিরপনাই আপনার কাছে বড়ো হলো? ভারি যাচ্ছেতাই বে-আক্কেল লোক তো আপনি মশাই।"

তারপর যুধিষ্ঠিরপুত্র চেকারের ওপর ভরসা না রেখে গার্ডসাহেবের কাছে তিনি আরজি পেশ করলেন, "সাহেব, তুমি একবার এই দরবেশজীকে বুঝিযে ঠাণ্ডা করে গাড়িতে তুলে নাও, নইলে গাড়ি কিছুতেই চলবে না। ইনি নিশ্চয় কোন যোগীপুরুষ, মস্ত বড় গুণিন।"

"গুণিন? ইউ মীন উইজার্ড? ম্যাজিশিয়ান?" বললেন গার্ডসাহেব।

"হ্যাঁ সাহেব।" বললেন ভদ্রলোক। "এঁরা যাদুমন্তর দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারেন। ইনি নিশ্চয় মন্তর দিয়ে চাকা-বন্ধন করে দিয়েছেন,

সে বন্ধন উল্‌টো মন্তর দিয়ে খুলে না দিলে চাকা ঘুরবে না, গাড়ি চলবে না।"

গাড়ি যে সত্যিই চলছে না তা নিজের চোখে দেখে গার্ডসাহেবের এই রহস্যময় দরবেশের অলৌকিক শক্তিতে একটু বিশ্বাস হয়েছিলো। কামরূপ কামাখ্যার অদ্ভুত তন্ত্রমন্ত্রের কিছু কিছু কাহিনী তিনি শুনেছিলেন, ভেবে নিয়েছিলেন সে সব 'কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরিজ', সব গাঁজাখুরি গল্প। এবার তাঁর মনে হলো হয়তো সেগুলো স্রেফ গাঁজাখুরি নয়। অন্তত এই অদ্ভুত লোকটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাই যাক না গাড়ি চালু হয় কিনা। সাহেব দরবেশের সামনে গিয়ে বেশ ভদ্রভাবে হেসে রেলের কামরার ভেতরের দিকে দুহাতে ইসারা করে বললেন, "আইয়ে।" দরবেশ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন "আই স্পীক ইংলিশ। আই ট্রাভেল্‌ড ইণ্ডিয়া, কাশ্মীর, বোম্বাই, হায়দারাবাদ, দিল্লী, লখ্‌নৌ, পাঞ্জাব, কামরূপ, কামাখ্যা।"

গার্ডসাহেব ইংরাজি ভাষায় দরবেশের অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "কাম ইন প্লীজ। লেট আস স্টার্ট। নো মোর ডিলে।" অর্থাৎ আসুন, আর দেরি নয়, এবার রওয়ানা হওয়া যাক।

কিন্তু গার্ডসাহেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না দরবেশ। যে তাঁকে নামতে বলেছিলো সেই ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ফের উঠবার আমন্ত্রণ জানালে তবেই তিনি উঠবেন ; তা নইলে তিনি ট্রেনে উঠবেন না, চাকা-বন্ধনও খুলবেন না, ট্রেন আটকে থাকবে এই স্টেশনেই।

যাত্রীরা তখন মারমুখো হয়ে চেপে ধরলেন চেকারকে, ক্ষমা চাইতেই হবে দরবেশের কাছে ; এমনি ক্ষমা নয়, একেবারে নাকে খত দিয়ে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "নাকে খতের দরকার নেই। যা নাক দেখছি, ওতে খত দিলে আর থাকবে কি? এমনিতেই মাফ চেয়ে ঠাণ্ডা করে ওঁকে গাড়িতে তুলে আমাদের রক্ষে করুন চেকার মশাই।"

এরপরও যুধিষ্ঠিরগিরি ফলাতে গেলেই যে তাঁর ওপর চাঁদা করে মার শুরু হবে, দেহের একটি হাড়ও আস্তো থাকবে না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে এবং গার্ডসাহেবের আর স্টেশন-মাস্টারের সম্মিলিত ধমক খেয়ে চেকার ভদ্রলোক দরবেশের কাছে করযোড়ে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা পেলেনও। চাকা-বন্ধন ছাড়িয়ে নিয়ে দরবেশ ট্রেনে উঠতে রাজী হলেন, কিন্তু সেজন্যে চেকারকে

কড়ার করতে হলো তিনি কোনো পীরের দরগায় সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি দেবেন।

গাড়িতে উঠবার আগে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এক খামচা ধুলো ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগার মাঝখানে তুলে নিলেন দরবেশ। তারপর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে অদ্ভুত ঢঙে উচ্চারণ করলেন অদ্ভুততর রহস্যময় মন্ত্র :

"তেলিয়া মশান।
মর্‌ঘট্‌কা খোপ্‌রি, মর্‌ঘট্‌কা জ্ঞান।
আস্‌রে মাটি, ফাস্‌রে পৌন।
খুলে নারাসা, বাঁধে কৌন্ ?"

মন্ত্র পড়ে তুলে নেওয়া ধুলোর ওপর মন্ত্রপূত ফুঁ দিয়ে সেই ধুলো ছুঁড়ে মারলেন ইঞ্জিনের চাকা লক্ষ্য করে। ড্রাইভারের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বন্ধন খুল দিযা বেটা। অব ছুটেগি গাড়ি।"

শুনে শিহরিত হলো অনেকের অঙ্গ।

বন্ধনমোচন মন্ত্রের শেষ লাইনে নারাসা নাম শুনেই চমকে উঠলেন কয়েক-জন। ভক্তিময় আবেগে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "ক্যা আপ্‌হী নারাসা হ্যায়, তক্‌মাওয়ালা সাঁই ?" অর্থাৎ আপনিই সেই নারাসা, যিনি তক্‌মাওয়ালা সাঁই নামে বিখ্যাত ?

দরবেশ হেসে বললেন, "হাঁ বেটা, ম্যায় হুঁ নারাসা। ম্যায় হুঁ তকমাওয়ালা সাঁই।"

তখন বিস্মিত জনমণ্ডলীকে আরো বিস্মিত করে সেই মুগ্ধ কয়েকজন যা বলতে লাগলেন তার মানে হচ্ছে, "অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার যাদু-খ্যাতি অনেক শুনেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি আপনিই সেই অসাধারণ গুণিন, যাদু জগতের শাহেনশাহ নারাসা, তক্‌মাওয়ালা সাঁই।" অপরাধ ক্ষমা করলেন নারাসা তক্‌মাওয়ালা সাঁই। গার্ডের সঙ্গে চলে গেলেন গার্ডের কামরায়। হুইস্‌ল্ বাজিয়ে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিলেন গার্ডসাহেব। দিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে রইলেন। বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না তাঁকে। একটু পরেই শোনা গেলো ইঞ্জিনের কর্ণবিদারী সিটি, আর সেই সিটি থামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো আওয়াজ : ঝিক্—ঝিক্—ঝিক্। ট্রেন চলতে শুরু করেছে!

কামরায় কামরায় জাগলো বিস্মিত আনন্দধ্বনি। গার্ডসাহেব তাঁর কামরায় উপবিষ্ট অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ওয়েল, আই অ্যাম ড্যাম্‌ড!" এটা তাঁর চরম বিস্ময়ের ভাষাগত প্রকাশ। প্রকাশও ঠিক নয়, প্রকাশের ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র। কোনো মানুষ মন্ত্রবলে রেলগাড়ির ইঞ্জিনকে হিপনোটাইজ করে ইঞ্জিনের চাকা আটকে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছেমতো তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতে পারে, এ তিনি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না।

শুধু গার্ডসাহেব নয়, আরো অনেকেই সেদিন যাদুকর নারাসা বা 'তক্‌মা-ওয়ালা সাঁই'য়ের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু মোটেই মুগ্ধ বা বিস্মিত হয়নি সেই ইঞ্জিন-ড্রাইভার সেই ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকার এবং আরো দু-চারজন। এ নাটকে নিখুঁত অভিনয়ের জন্য এঁদের তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়ের ভাণ্ডার থেকে গোপনে কিছু প্রাপ্তিযোগ ছিলো।

পাঠক-পাঠিকারা আশা করি অনুমান করে নিতে পারবেন, প্রথম কাহিনীর ছেলে-হারানো বিধবা এবং গৃহস্থ ভদ্রলোক (সম্ভবত আরো কেউ কেউ) ঐ অলৌকিক ঘটনার আগে ও পরে যাদুকর তক্‌মাওয়ালার কাছ থেকে গোপনে কিছু নগদ বখশিশ পেয়েছিলো।

খেয়ালী যাদুকর

"The more I see of men, the more I love my dog", অর্থাৎ "মানুষের পরিচয় যতো বেশি পাই, আমার কুকুরটিকে আমি ততোই বেশি ভালোবাসি।" এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন পাশ্চাত্য যাদুজগতের একজন অবিস্মরণীয় দিক্‌পাল—"লাফায়েৎ" (The Great Lafayette)। শেক্‌স্‌পীয়রের "টাইমন অভ এথেন্‌স্" নাটকের নায়ক টাইমনের মতো যাদুকর লাফায়েৎও কি মানব চরিত্রের কদর্যতার পরিচয় পেতে পেতে ঘোর মানব-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন ? না এ উক্তিটি তাঁর একটি 'পাবলিসিটি স্টাণ্ট' বা প্রচার-কৌশল, অদ্ভুত কথার খোঁচায় চমক লাগিয়ে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ কবে নাম করবাব চেষ্টা ? সে যাই হোক, লাফায়েৎ-এর বাড়ির দরজায় তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'-র ছবির তলায় উক্ত খোঁচা-মারা উক্তিটি খোদাই করা ছিলো এবং কলিংবেল টিপতে গেলেই চোখে পড়তো।

কুকুর-ভক্তিতে বোধ হয় যাদুকর লাফাযেৎকে চিরকালের চ্যাম্পিযন বলা যেতে পারে। তাঁর চেক, চিঠি লিখবার কাগজ, যাদুপ্রদর্শনের চুক্তিপত্র ইত্যাদির ওপর তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'-র ছবি ছাপা থাকতো। লাফায়েৎ-ভবনে বিউটির জন্যে আলাদাভাবে একটি চমৎকার শৌখিন স্নানাগার তৈরি হয়েছিলো। শৌখিন অভিজাত হোটেলে যেমন খানা দেওয়া হয়, তেমনি খানা দেওয়া হতো বিউটিকে। রীতিমতো মানুষি কায়দায় চেয়ার-টেবিলে খানা খেতো 'বিউটি'; খাবার সময় 'বাট্‌লার' (ভৃত্য) এসে বিউটির গলার সামনে রুমাল ঝুলিয়ে দিয়ে যেতো। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হলো, কিন্তু এ থেকেই লাফায়েৎ-এর সৃষ্টিছাড়া কুকুর-ভক্তি বা কুকুর পাগলামির রকম বোঝা যাবে। তিনি বলতেন, "বিউটি না থাকলে আমার জীবন শূন্য, অর্থহীন, বিফল। বিউটি বিহনে আমার বাঁচা অসম্ভব।" আশ্চর্যের বিষয়, বিউটি বিহনে বেশিদিন বাঁচেন নি লাফায়েৎ। বিউটির মৃত্যুর এক হপ্তার ভেতর তাঁর মৃত্যু হয় এবং সে মৃত্যু সাধারণ ভাবে হয়নি।

মৃত্যুর কথা পরে বলবো। আগে বলি তাঁর জীবনের কথা। "লাফাযেৎ" নামটি যাদুজগতের জন্যে বেছে নেওয়া তাঁর পেশাদারি ছদ্মনাম। ভদ্রলোকের

আসল, অর্থাৎ পিতৃদত্ত নাম সিগমণ্ড নয়বার্গার (Sigmund Neuberger)। তিনি জাতিতে জার্মান, জন্ম ১৮৭২ সালে জার্মানির মিউনিক (Munchen) শহরে। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিষণ্নস্বভাব, স্বল্পভাষী, অদ্ভুত রকম খেয়ালী। অল্প বয়সেই তিনি জার্মানি ছেড়ে চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ছবি আঁকার হাত ছিলো চমৎকার ; জীবিকা অর্জনে সে হাত তিনি কাজে লাগালেন, হলেন দৃশ্যপট-শিল্পী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শৌখিন এবং সূক্ষ্ম চারুশিল্প টাকা আনবে না, শিল্পের সাহায্যে টাকা রোজগার করতে হলে শৌখিন সূক্ষ্মতা ছেড়ে শিল্পকে ব্যবসায়ে পরিণত করতে হবে। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে দৃশ্যপট-শিল্পীর কাজে বেশ সাফল্য লাভ করে এবং বিভিন্ন যাদুকরের যাদুপ্রদর্শনী দেখে পেশা হিসেবে যাদুবিদ্যার অর্থকরী সম্ভাবনার কথাটা তাঁর মনে জাগলো। দৃশ্যপট আঁকার পেশা ছেড়ে পেশাদার যাদুকর হবেন, এই সিদ্ধান্ত করলেন তিনি। শোনা যায় তাঁর প্রথম খেলাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বিখ্যাত যাদুকর হোরেস গোল্ডিন।

যাদুর পেশা নিয়ে প্রথম কিছুদিন তিনি মার্কিন মুলুকেই কাটালেন ছোটো ছোটো শহরে যাদুপ্রদর্শন করে। হস্ত কৌশলের খেলার বদলে তিনি বড়ো বড়ো যাদুর খেলাই (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ইলিউশন') দেখিয়ে গেছেন ; কারণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিলো দর্শকদের সামনে চোখজুড়ানো, চোখধাঁধানো, চমকলাগানো জমকালো প্রদর্শনী উপস্থাপিত করা ; যাদুর খেলাটি উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রমোদপ্রিয় জনসাধারণ যারা রঙ্গালয়ে ভিড় করে তাদের মুগ্ধ, আকৃষ্ট করবার সেরা উপায় হচ্ছে জমকালো দৃশ্য এবং সঙ্গীত দিয়ে তাদের চোখ আর কানকে খুশী করা। তিনি নিজে ছিলেন বিশিষ্ট দৃশ্যপটশিল্পী, বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে থেকে মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিলো প্রচুর। এ অভিজ্ঞতা—বলাই বাহুল্য—তাঁর নিজের যাদুপ্রদর্শনীকে জমকালো করে তুলতে খুবই কাজে লেগেছিলো। বিচিত্র, নয়নাভিরাম মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপটের সঙ্গে লাফায়েৎ যুক্ত করলেন তাঁর নিজস্ব অর্কেস্ট্রা, তাতে বহু বিচিত্র রকমের সঙ্গীতযন্ত্র এবং শব্দযন্ত্রের সমাবেশ।

দৃশ্যপটশিল্পী সিগমণ্ড নয়বার্গার হয়ে গেলেন যাদুকর "লাফায়েৎ"। আমেরিকা ও ফ্রান্স দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন বিখ্যাত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লাফায়েৎ (১৭৫৭—১৮৩৪) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকানদের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই

নামটিই সিগমণ্ড নয়বার্গার বেছে নিয়েছিলেন তাঁর যাদুকর জীবনের পেশাদারি নাম হিসেবে।

মার্কিন মুলুকে প্রাথমিক যাদুপ্রদর্শনী সফরে লাফায়েৎ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে পসার জমাতে পারেন-নি। তা হলেও এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় খুব কাজ হয়েছিলো; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ঠিক রাস্তা ধরেছেন এবং ঠিক ভাবেই অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি তাঁর যাদুপ্রদর্শনীর দৃশ্যপট এবং মঞ্চসজ্জা আরো বিচিত্র, আরো জমকালো করলেন, তাঁর অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতকেও আরো জোরালো করলেন। এমন বিরাট জাঁকজমক সারা ইউরোপে অন্য কোনো যাদুকরের যাদুপ্রদর্শনীতে দেখা যায়-নি, এমনি প্রদর্শনী নিয়ে লাফায়েৎ এলেন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে। এখানে এসেই তাঁর বরাত খুলে গেলো। লণ্ডন হিপোড্রোম সার্কাসে যে খেলাটি দেখিয়ে তিনি বাজিমাত করলেন সেটি কিন্তু একটি অতি সাধারণ খেলা—একটি শূন্য সিলিণ্ডার বা চোঙা থেকে দুটি মানব শিশু বার করা। এই একটি খেলাই তাঁকে দ্রুত এগিয়ে দিলো জয়যাত্রার পথে।

খেলাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করি। আলখাল্লা পরে রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হলেন যাদুকর লাফায়েৎ. একটা বেশ বড়ো রকমের সিলিণ্ডার অর্থাৎ চোঙা নিয়ে, যার দুমুখ খোলা। সেইটি খালি দেখিয়ে তিনি মাটির ওপর খাড়া করে রাখলেন। চোঙাটির ভেতর কিছু নেই—কিন্তু কি আশ্চর্য! চোঙাটি খাড়া ওপর দিকে তুলে নিতেই দেখা গেলো একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকগণ বিস্মিত। ছেলেটিকে ওপর দিক থেকে চোঙার ভেতর নামতে দেখা যায়নি। তলার মাটি থেকেও ছেলেটি ওঠেনি। তবে এলো কোথা থেকে, আর কোন পথে কেমন করে গেলো চোঙার ভেতরে? ছেলেটির একটু দূরে মাটির ওপর চোঙাটি খাড়া করে রেখে ছিলেন লাফায়েৎ। চোঙাটি আবার ওপর দিকে তুলে নিতেই দেখা গেলো দাঁড়িয়ে হাসছে একটি ছোট্টো মেয়ে। কি আশ্চর্য! এই মেয়েটি এলো কোথা থেকে?

যদি কেউ আন্দাজ করে থাকেন এ দুটি রহস্যময় আগন্তুক লুকিয়ে ছিলো যাদুকরের ঢিলেঢালা বিরাট আলখাল্লার তলায়, তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী অসামান্য সদয় হলেন লাফায়েৎ-এর প্রতি। প্রমোদপ্রিয় হুজুগভক্ত জনসাধারণ এমন জমকালো যাদুপ্রদর্শনী আর কখনো দেখেনি। যাদুকর লাফায়েৎ-এর খ্যাতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। স্রোতের মতো

টাকা আসতে লাগলো তাঁর পকেটে। এই আশাতীত সাফল্যের ফলেই বোধ করি তাঁর স্বভাবগত খামখেয়ালি দ্রুতবেগে পাগলামির দিকে ছুটে চললো। তাঁর দাবিও বেড়ে গেলো। লণ্ডনের হবর্ণ এম্পায়ার রঙ্গালয়ে যাত্ব-প্রদর্শনের আমন্ত্রণ এলে তিনি সাপ্তাহিক সাড়ে সাতশো পাউণ্ড দক্ষিণা এবং কমপক্ষে তু সপ্তাহের চুক্তি দাবি করলেন। রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি দিতে রাজী হলেন না, কিন্তু তুসপ্তাহের জন্য রঙ্গালয়টি লাফায়েৎ-এর হাতে এই সর্তে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন যে তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কর্তৃপক্ষকে দেবেন, তারপর যতো টাকা তিনি লাভ করতে পারেন করবেন। লাফায়েৎ-এর ছিলো অসীম আত্মবিশ্বাস; দর্শকেরা কি চায় তা তিনি জানতেন, আর তাদের ঠিক তাদের পছন্দমতো জিনিসটি তিনি দিতে জানতেন। তিনি প্রচণ্ড আর্থিক ঝুঁকি সত্ত্বেও এই সর্তে রাজী হয়ে গেলেন। শুরু হলো হবর্ণ এম্পায়ারে লাফায়েৎ-এর নিজস্ব পরিচালনায় তাঁর যাত্ব প্রদর্শনী। চুক্তির মেয়াদের শেষে দেখা গেলো লাফায়েৎ-এর মুনাফা হয়েছে ষোলো শো চল্লিশ পাউণ্ড, মোট দক্ষিণা তিনি যা চেয়েছিলেন তার চাইতে প্রায় দেড়শো পাউণ্ড বেশি। এর ফলে রঙ্গালয় জগতে তার কদর বেড়ে গেলো অসাধারণ ভাবে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খামখেয়ালী দেমাকের দাপটও বেড়ে গেলো। তাঁর সহকারীরা সবাই সামরিক কায়দায় পোশাক পরতে লাগলো; সামরিক আদবকায়দায় রপ্ত হলো; লাফায়েৎ যেন তাদের সেনাপতি, এইভাবে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সামরিক কায়দায় কুর্ণিশ করতে লাগলো। বলা বাহুল্য এর পেছনে ছিলো খেয়ালী যাত্বকর লাফাযেৎ-এর নির্দেশ. এটা হয়তো অনেকের কাছেই বেশি রকম বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে, কিন্তু এক হিসেবে এই বাড়াবাড়িই ছিলো তার অসামান্য সাফল্যের মূল। তাছাড়া তিনি 'ডিসিপ্লিন' অর্থাৎ সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন, এ তারই অভিব্যক্তি। অভূতপূর্ব জাঁকজমকের আবহাওয়ায় নিজেকে ঘিরে রেখে শিল্পী হিসেবে যাত্বকরের মর্যাদা সাধারণের চোখে অনেক বাড়িয়ে দিলেন, শুধু তাই না, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদেরও লাফায়েৎই প্রথম সচেতন করে দিয়েছিলেন যে একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্বকর মোটা দক্ষিণা দাবি করবার অধিকারী। সেরা যাত্বকরদের মোটা দক্ষিণা প্রাপ্তির রাস্তা লাফায়েৎই সর্বপ্রথম খুলে দিয়েছিলেন, সেজন্য যাত্বকর মহল তাঁর কাছে ঋণী। এমন কি পরে অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি যে অসামান্য উঁচু হারে দক্ষিণা দাবি করেছেন এবং পেয়েছেন তা বোধ হয় সম্ভব হতো না, যদি তার আগে

লাফায়েৎ এর পত্তন করে না যেতেন। তবু কিন্তু যাদুকর মহলে লাফায়েৎ ছিলেন অত্যন্ত অপ্রিয় পাত্র। এর কারণ তিনি অন্যান্য যাদুকরের প্রতি গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাঁদের সংস্পর্শ পরম যত্নে এড়িয়ে চলতেন।

শুধু তিনজন অসামান্য যাদুকরের সঙ্গেই ছিলো লাফায়েৎ-এর বিশেষ অন্তরঙ্গতা। তাঁরা হচ্ছেন আমেরিকার হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini) ও হোরেস গোল্‌ডিন (Horace Goldin) এবং ইংল্যাণ্ডের জন নেভিল ম্যাস্কেলিন (John Nevil Maskclyne)।

লাফায়েৎ-এর আরেকটি বিশেষত্ব—বৃহৎ যাদু-প্রদর্শনীতে মানবেতর প্রাণী অর্থাৎ জানোয়ারের ব্যবহার তিনিই প্রথম করেন। তাঁর একটি জমকালো খেলায় একটি সাদা ঘোড়া মঞ্চে আবির্ভূত হতো। (কোনো কোনো মহলে একটি কিম্বদন্তী চালু আছে এই ঘোড়াটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো। সে কাহিনী পরে বলছি।) এছাড়া কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি অন্যান্য জানোয়ারও ব্যবহৃত হতো, যার ফলে লাফায়েৎ-এর যাদু প্রদর্শনীটিকে প্রায় একটি ছোটোখাটো যাদু-সার্কাস বলা যেতে পারতো।

লাফায়েৎ-এর প্রিয় কুকুরটির কথা আগেই বলেছি। এটি খুব বাচ্চা বয়সে তাঁর কাছে এসেছিলো উপহার হিসেবে, যাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছ থেকে। কুকুরটির 'বিউটি' অর্থাৎ সৌন্দর্য যে খুব ছিলো তা নয়; কিন্তু কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতোই লাফায়েৎ কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন 'বিউটি'। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অসামান্য 'বিউটি'-ভক্ত হয়ে উঠলেন সে কথাও বলেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো 'বিউটি' জগতের অদ্বিতীয় কুকুর, অমনটি আর কখনো হয়নি, হবে না, হতে পারে না। একবার একটি যুবক—লাফায়েৎ-এর মেজাজ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল ছিলো না—লাফায়েৎ-এর সামনেই 'বিউটি'র চেহারার বিরূপ সমালোচনা করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা লাফায়েৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বেয়াদব ছোকরাকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি লাফায়েৎ ছিলেন নেপথ্যবিলাসী, অমিশুক, অসামাজিক মানুষ। কিন্তু তাই বলে সুন্দরী নারীর সাহচর্য যে তিনি খুব অপছন্দ করতেন তা নয়। তাছাড়া অসামান্য যাদুকর লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী দেখে যতো, তার চাইতেও বেশি যাদুমঞ্চে তাঁর চেহারার এবং ব্যক্তিত্বের যাদুতে মুগ্ধ হবার মতো সুন্দরীর অভাব হয়নি। বহু রোমান্স-পিয়াসিনী সুন্দরীর চোখে তিনি ছিলেন

অসামান্য সুপুরুষ ; এমন অদ্বিতীয় পুরুষের সাহচর্যের জন্য অনেক সুন্দরীই লালায়িত ছিলো।

একদিনের কাহিনী বলি। শিকাগো শহরের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ। সে শহরে তখন কয়েকদিন ধরে লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী চলেছে ; লাফায়েৎ-এর জয়জয়কার। রেস্তোরাঁয় এক টেবিলে মুখোমুখি বসে খানাপিনা এবং অন্তরঙ্গ রসালাপ করছেন যাদুকর লাফায়েৎ এবং শিকাগো শহরেব একজন সুন্দরী সুবেশা তরুণী মহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে লাফায়েৎ-এর খাতির হয়েছে খুবই সম্প্রতি।

কি ছিলো বিধাতার মনে, ঠিক এই সময়ে এই বেস্তোরাঁয এসে হাজির হলেন ভদ্রমহিলার স্বামী। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী অন্যত্র গেছেন একটি ফ্যাশান প্রদর্শনীতে ; ভদ্রমহিলা স্বামীকে ভাঁওতা দিয়ে সেখানে যাবার নাম করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। ভদ্রলোক যা দেখলেন তাতে প্রথমে চক্ষুস্থির, তারপরই মন অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি মনে মনে বললেন এইবার হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। একটা বিহিত আজ করতেই হবে। ধীরে ধীরে এগিযে গিয়ে তিনি টোকা দিলেন লাফায়েৎ-এর পিঠে। কঠোর কণ্ঠে বললেন, "মশায়ের কি জানা আছে এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী ?"

"তাই নাকি ?" বলে ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে পরম তাচ্ছিল্যভরে চোখ ফিরিযে নিলেন লাফাযেৎ। যা করছিলেন তাই করতে লাগলেন, ভদ্র-লোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

ভযানক চটে গেলেন ভদ্রলোক। তাছাড়া আত্মসম্মানেও ঘা লাগলো তাঁর। তিনি বললেন, "আমার অনুমতি না নিযেই আপনি আমার স্ত্রীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে আসেন কোন সাহসে ?"

লাফায়েৎ মুখে কোনো জবাব দিলেন না। জবাব দিলো তাঁর হাতের একটি প্রচণ্ড ঘুষি। জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুমিশয্যায শয়ান হয়ে পড়ে রইলেন ভদ্রলোক। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিযে যখন উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তখন রেস্তোরাঁর একজন কর্মচারী এসে রুদ্রমূর্তিতে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "মসামান্য লাফায়েৎ আমাদের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক, আপনি আমাদেরই রেস্তোরাঁয় এসে তাঁর গায়ে হাত তুললেন কোন সাহসে ?" ঘা-খাওয়া স্বামী বেচারারই তখন আসামী অবস্থা। হায় বেচারা স্বামী।

লাফায়েৎ-এর জীবনের কথা এই পর্যন্তই থাক। এবারে তাঁর মৃত্যুর কাহিনী বলি। শহর এডিনবরা (স্কটল্যাণ্ড)। তারিখ ৯ই মে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। এম্পায়ার থিয়েটারে চলছে লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী। স্টেজের সামনে ঝুলানো পর্দায় কি করে হঠাৎ আগুন লেগে গেলো সে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়লো আগুন। সেই আগুনে পুড়ে মারা গেলেন লাফায়েৎ।

খবরের কাগজে আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত তাঁর মহা-মৃত্যুর কাহিনী পড়ে পাঠক-পাঠিকারা অনেকে অশ্রু-সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁরা জানলেন সেই দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ড থেকে বহু কষ্টে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন লাফায়েৎ। কিন্তু বেরিয়েই তাঁর মনে পড়ে গেলো তাঁর পরম স্নেহাস্পদ সাদা ঘোড়াটি, তাঁর যাদুজীবনের দীর্ঘকালের সাথী, ঐ অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে আটকা পড়ে আছে। নিজের প্রাণের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করে তিনি ছুটে ফিবে গেলেন সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের ভেতর, মৃত্যুর মুখ থেকে তার প্রিয় ঘোড়াটিকে ছিনিযে নিয়ে আসতে। কিন্তু সেই যে গেলেন, আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না সেই আগুনের গোলোকধাঁধা থেকে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আগুনে পুড়ে মরলেন।

লাফায়েৎ-এর মৃত্যুর প্রকৃত কাহিনীটি কিন্তু অতো রোমান্টিক নয়। অথবা হয়তো আরো বেশি রোমান্টিক। স্টেজের ভেতর দিকে একটি খিড়কি দরজা ছিলো ওদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। যাদু-প্রদর্শন চলতে থাকার সময় পাছে কেউ চুরি করে চুপি চুপি ঐ পথে ঢুকে পড়ে কোনো খেলার গুপ্ত কৌশল জেনে ফেলে, এই ভয়ে খুঁতখুঁতে খেয়ালী লাফায়েৎ ঐ দরজাটিকে তালাবন্ধ করে রাখতেন। সেদিনও দরজাটি তাঁর নির্দেশ মতো তালাবন্ধ ছিল। অগ্নিকুণ্ড থেকে ঐ পথে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন ওপথ তালাবন্ধ; খুলবার উপায় নেই। ছুটে এলেন স্টেজের ভেতর। জ্বলন্ত পর্দার দরুণ এদিকেও পলাবার পথ বন্ধ। ধোঁয়ায় আগুনে দিশাহারা হয়ে পড়ে গেলেন অসহায়ভাবে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি নিজেই জেদ করে পিছনের দরজাটি তালাবন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। নিজের এই খুঁতখুঁতে খামখেয়ালির ফলেই অগ্নিকাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হলো।

আগেই বলেছি, সাতদিনের ভেতর মৃত্যু হয়েছিলো বিউটির আর লাফায়েৎ-

এর, প্রভুভক্ত কুকুরের আর কুকুরভক্ত প্রভুর। এডিনবরায় দুজনের কবর পাশাপাশি। মৃত্যুর অনেক আগেই লাফায়েৎ আগাম ইচ্ছা প্রকাশ করে রেখেছিলেন তাঁর সমাধির ওপর যেন তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'র প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে। তাঁর সে ইচ্ছা রক্ষিত হয়েছে। 'মহান' লাফায়েৎ-এর (Great Lafayette) সমাধিতে এসে এখনো অনেক যাদুকর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।...

অন্য কোনো যাদুকরের কোনো উক্তিই এমন কায়েমি খ্যাতি লাভ করে নি, যেমন করেছে লাফায়েৎ-এর উক্তি :

"The more I see of men,
the more I love my dog."

আরেকটি চমৎকার উক্তি মনে পড়ছে :

"অপ্‌না দিল্ সাফ রখ্‌না, ঔর দুসরেকী পাকিট সাফ করনা।"

অর্থাৎ—, "হরদম সাফ রেখে আপনার চিত্ত
পরের পকেট সাফ করে যাও নিত্য।"

উক্তিটি কলকাতার ইউসুফ ওস্তাদের। শুনেছি সাকরেদদের উদ্দেশে এই ছিলো তার বাণী, তার নিজের জীবনের এই ছিলো আদর্শ। বহু পকেট-সাফের মূলে ছিলো তার প্রতিভা, কিন্তু আপন চিত্তটিকে সে বরাবর মুক্ত রেখেছিলো মালিন্যের স্পর্শ থেকে। (ব্র্যাকেটে বলে রাখি এ কাহিনী যাঁর কাছে শুনেছি, ইউসুফের আসল নাম তিনি আমাকে বলেন নি।)

হাত-সাফাইতে ইউসুফ ছিলো অসাধারণ সিদ্ধহস্ত। টাকাপয়সা, বিড়ি, দিয়াশলাই, গুলি, বোতাম, আংটী প্রভৃতি ছোটোখাটো খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে শুধুমাত্র হাতের কায়দা আর ধোঁকাবাজির সাহায্যে সে এমন সব অদ্ভুত ভেলকি দেখাতো যে দর্শকেরা তাই দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতো।

শোনা যেতো হাতসাফাইয়ের যাদুকর ইউসুফের সঙ্গে কলকাতার তখনকার নামকরা গুণ্ডাসর্দারদের খুব খাতির এবং কলকাতার একাধিক মহাবিদ্যার আখড়ায় ইউসুফ ওস্তাদ পকেটমারা এবং আনুষঙ্গিক হাতসাফাইয়ের তালিম দিয়ে থাকে। এই সন্দেহ-ভিত্তিক দুর্নামের জন্যই গুণী যাদুশিল্পী হিসেবে সুধীসমাজে প্রাপ্য সুনাম সে অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য তার কোনো

ক্ষোভ ছিলো না, কারণ এই সুনামের লোভও তার ছিলো না, প্রয়োজনও ছিলো না। হস্তকৌশল-প্রধান যাছুর খেলায় (sleight-of-hand conjuring) তার অসামান্য দক্ষতা থাকলেও যাছুবিদ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জনের উপায়-স্বরূপে সে গ্রহণ করেনি, যাছুবিদ্যা ছিলো নিতান্তই তার খেয়ালখুশি, হবি বা শখের ব্যাপার। এ হিসেবে তাকে বলা যেতো 'অ্যাম্যাটিউর ম্যাজিশিয়ান'।

ইউসুফের চরিত্র ছিলো খামখেয়াল-প্রধান। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।" ইউসুফের মনে এ ধরনের ছোটোখাটো সংকীর্ণতা ছিলো না। তার প্রশান্ত চিত্তে এই বিশ্বাস ছিলো যে পরের দ্রব্য নেবার সেরা উপায় হচ্ছে না-বলে নেওয়া; কারণ বলে নিতে গেলেই বিভিন্ন রকমের বাধা, বিরোধ বা মনোমালিন্য আসতে পারে। না বলে এবং না জানিয়ে পরের দ্রব্য পরম বেমালুমভাবে আপন করে নেবার জন্যে চাই পাকা হাতসাফাই; আর সেইজন্যেই প্রযোজন পাকা তালিমের।

ইউসুফ ওস্তাদের গোপন দান কিছু ছিলো কিনা জানি না; প্রকাশ্যে সে যে দান করতো সে দান যাছুক্রীড়ার ছদ্মবেশে। একবার এক বৃদ্ধা জরাজীর্ণা ছিন্নবসনপরিহিতা পথের ভিখারিনীকে কিছু অর্থ দেবার ইচ্ছা হলো যাছুশৌখিন ইউসুফের। ইউসুফ বললে, "বুড়ি মা, তোমার আঁচলে ও কি বাঁধা রয়েছে?"

"কই, কিছুইতো নয় বাছা।" বললে ভিখারিনী। সত্যি কথাই, কিছু বাঁধা ছিলো না বুড়ির আঁচলে।

ছুহাত উল্‌টে পাল্‌টে খালি দেখিয়ে ওস্তাদ ইউসুফ বুড়ির আঁচল ধরে ধীরে ধীরে ঝাড়তেই মুদ্রাবৃষ্টি—পয়সা, আনি, ছুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা। বুড়ির চক্ষু চড়কগাছ। একি ভুতুড়ে কাণ্ড? না না, ভুতুড়ে কাণ্ড নয়, এ খোদ খোদার মেহেরবানি, বুড়িকে বোঝালে ইউসুফ। ঈশ্বরের আশীর্বাদী মুদ্রাগুলো বুড়ির ঝুলিতে ভরে দিলে আপন হাতে।

বুড়ি চলে গেলো ইউসুফকে আশীর্বাদ করতে করতে, খোদার অলৌকিক মেহেরবানিতে মুগ্ধ হয়ে; বুঝলে না সে যা আঁচল ভরে নিয়ে গেলো, তার মূলে হয়তো খোদারই মেহেরবানি, কিন্তু তা এসেছে ইউসুফেরই পকেট থেকে।

এতিমখানার জন্যে চাঁদা দিতে হবে? ওসব খয়রাতি ফয়রাতির ভেতর নেই ইউসুফ ওস্তাদ। ইউসুফের পকেটে পয়সার কিছু বাহুল্য ঘটে নি, আর

পয়সা অতো শস্তা নয় যে দাও বললেই অমনি উপুড়হস্ত হওয়া যাবে। সুতরাং ইউসুফ করলে কি? না, তুলে নিলে একফালি শাদা কাগজ, তাকে কাটলে দশ টাকার নোটের সাইজ করে। সেই সাইজ করে কাটা কাগজ ভাঁজ করে দুহাতে ঘষতে ঘষতে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়লে ইউসুফ, তার ফল হলো অদ্ভুত। কাগজখানার ভাঁজ খুলতেই দেখা গেলো শাদা কাগজের ফালিটি পরিণত হয়েছে একখানা আস্তো দশটাকার নোটে!

নোটখানা এতিমখানার চাঁদা-সংগ্রাহকের হাতে দিলে ইউসুফ ওস্তাদ। বিস্মিত মৌলভী সাহেব উল্‌টে পাল্‌টে দেখে আরো বিস্মিত হলেন। এ যে সত্যি দশ টাকার নোট। "হ্যাঁ বাবা ইউসুফ, এ নোট ঠিক নোট তো? ঠিক চলবে তো বাবা?"

"বিল্‌কুল ঠিক। বিল্‌কুল চলবে মৌলভী সাহেব।" হেসে বললে ইউসুফ। সে হাসি অভয় হাসি।

ইউসুফের জবানের ওপর অসীম আস্থা মৌলভী সাহেবের, যেমন আস্থা অন্য সবারই—যে কেউ এসেছে ইউসুফের সংস্পর্শে। এতিমখানার ফাণ্ডে খাঁটি দশ টাকা জমা বাড়লো, এতে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না। আর নিঃসন্দেহ হবার সঙ্গে সহসা একটা রঙীন, আশা-মধুর কল্পনায় ভরে উঠলো এতিমখানার বাপ-মা-হারা অনাথদের অন্যতম অভিভাবক মৌলভী সাহেবের মন। ইউসুফের হাতের অনেক অদ্ভুত খেলা দেখে অনেকবার তাক লেগেছে তাঁর, কিন্তু ইউসুফের হাতের যাদুতে যে শাদা কাগজের টুক্‌রো অমন অনায়াসে দশ টাকার নোটে পরিণত হয়, এ তিনি এই প্রথম জানলেন। তাহলে আর এতিমখানার ফাণ্ডের জন্যে ভাবনা কি? সাইজ মতো কাগজ কেটে কেটে ইউসুফের হাতের যাদুতে নোটের পর নোট যতো খুশি বানিয়ে নিলেই তো হবে। আবেগে ইউসুফের হাত চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, "আরো আরো আরো নোট, এমনি করে বানিয়ে দাও বাবা ইউসুফ। এতিমখানার কচি কাঁচাগুলোর একটু হাল ফেরাই. আর—"

ইউসুফ হাত জোড় করে বললে, "এ নোট তো সহজে তৈরি হয় না মৌলভী সাহেব, এক একটি নোট বানাতে আমার আধ সের রক্ত জল হয়ে যায়।"

অর্থাৎ আরো নোট বানাতে গেলে তার গায়ের আরো রক্ত জল হবে। তাতে ইউসুফের আপত্তি বোধ করা অসম্ভব বা অন্যায় নয়। সুতরাং তখনকার

মতো ঐ একখানা দশটাকার নোট নিয়েই বিদায় হলেন এতিমখানার সেবাব্রতী মৌলভী সাহেব।

উনিশ শতকের শেষদিকের সিখ্যাত ইংরেজ যাতুকর চার্লস্ বারট্রামের (ব্যক্তিগত জীবনে জেম্স্ ব্যাসেট) শখ বা খেয়াল ছিলো নানারকমের ঠক এবং জুয়াড়িদের কার্যকলাপ এবং হস্তকৌশল পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে যাতু-শিল্পের উপযোগী করে নেওয়া। লণ্ডন শহরের পার্কে এবং পথের ধারে তিনি পেশাদার জুয়াড়ি বা জুয়াচোরদের যে "তিন তাসের খেলা" দেখেছিলেন তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এ খেলাটি 'থ্রি কার্ড ট্রিক' (Threc card trick), 'থ্রি কার্ড মন্টি' (Three card monte) বা 'ফাইণ্ড দি লেডি' (Find the lady) নামে খ্যাত।

খেলাটি নির্দোষ শৌখিন বা পেশাদার যাতুকরের হাতে যেমন দর্শকদের বিস্ময় এবং আমোদ যোগাতে পারে, তেমনি হাতসাফাই-বিশারদ পেশাদার জুয়াড়িরা এই খেলাটির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে। বিশ্বের ঠকবাজদের ভেতব হয়তো ভাবের আদান প্রদান আছে, অথবা ওদের চিন্তা-ধারায় আশ্চয রকমের মিল আছে। যাতুকর চার্লস্ বাবট্রাম এবং চার্লস কার্টার("কার্টার দি গ্রেট", যিনি এ শতাব্দীর দ্বিতীয় সিকি ভাগে এদেশে খেলা দেখিয়ে গেছেন) বর্ণিত এবং ব্যাখ্যায়িত এই তিন তাসের খেলা আমি কলকাতা শহরের ফুটপাথেও একাধিকবার দেখেছি।

এ-খেলায় ব্যবহৃত হয় তিনটি তাস—একটি বিবি এবং তুটি অন্য (ছবিহীন) তাস। মনে করে নেওয়া যাক জুয়াড়ি ফুটপাথে বসেছে খেলা দেখাতে। আপনাদের দেখিয়ে একটি একটি করে তিনটি তাস সে উপুড় করে পাশে পাশে এক সারিতে ফেলবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে তিনটির ভেতর কোনটি বিবি সেটা ঠিক রাখা। মনে করা যাক আপনারা পরিষ্কার দেখলেন বিবি তাসটিকে রাখা হয়েছে অন্য তুটি তাসের মাঝখানে। আচ্ছা বেশ, এইবার খুব হুঁশিয়ার হযে লক্ষ্য রাখুন। জুয়াড়ি ধীরে ধীরে তিনটি তাসের জায়গা অদল বদল করবে। (বলা বাহুল্য, তিনটি তাসেরই পেছন দিকটি থাকবে ওপর দিকে।) কিছুক্ষণ পর বাজি ধরা হবে। জুয়াড়ি বলবে, "বলুন এবার, কোন তাসটা বিবি ?"

"এইটে বিবি।" বলে কোনো দর্শক একটি তাসের ওপর কিছু টাকা রাখলে

পর তাসটি উল্‌টে যদি দেখা যায় সেটি অন্য তাস, তাহলে দর্শকের রাখা ঐ টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়ে চলে যাবে জুয়াড়ির পকেটে। দর্শক বাজি হারলেন। আর যদি দেখা যায় তাসটি সত্যিই বিবি, তাহলে দর্শক বাজি জিতলেন। যতো টাকা বাজি রেখেছেন ঠিক ততো টাকা জুয়াড়ির পকেট থেকে আসবে দর্শকের পকেটে। কিন্তু সাধারণত প্রথমটাই হয়ে থাকে, কারণ তাস খেলার মধ্যে জুয়াড়ির যে সূক্ষ্ম হাতসাফাইয়ের কৌশল থাকে তাতে দর্শক ভ্রান্তিতে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অন্য তাসকে বিবি বলে ভুল করেন।

এ খেলার মূল কৌশল বা চালাকিটুকু এইভাবে বুঝুন। প্রথমে বিবি তাসটিকে দেখিয়ে উপুড় করে ফেলুন। তার উপর ফেলুন অন্য একটি তাস, মনে করুন নওলা। এবারে একদিকে বুড়ো আঙ্গুল এবং অন্যদিকে তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিযে দুটি তাস একসঙ্গে তুলে ফেলুন। এবার এই দুটি তাস একটির পর একটি আলাদা জায়গায় ফেললে সাধারণত নীচের তাস অর্থাৎ বিবি প্রথমে পড়বে, এবং দ্বিতীয়বারে পড়বে বাকি তাসটা। অর্থাৎ নওলা। স্বভাবতই মনে হবে আগে নীচের তাস না ফেলে ওপরের তাসটা ফেলবার উপায় নেই। প্রথমবার ঠিক তাই করে দেখিযে দিন প্রথমবাব যে তাসটি পড়েছে সেটিই বিবি। তারপর নওলাটিকে আবার বিবিব ওপব রেখে আবার একসঙ্গে তুলে নিন।

এই দ্বিতীয় বাবেই হচ্ছে আসল চালাকি। নীচেব তাসটিকে (অর্থাৎ বিবি) ধরুন বুড়ো আঙ্গুল আর মধ্যমাঙ্গুলির ডগা দিযে, এবং ওপরের তাসটিকে (নওলা) ধরুন বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর ডগা দিযে, তাহলে দুটি তাস আলাদাভাবে নিযন্ত্রিত হচ্ছে—মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে নীচেকার বিবি তাসটি, এবং তর্জনী দিয়ে ওপরকার নওলা তাসটি। এ অবস্থায় আপনি ইচ্ছামতো যে কোনো তাস প্রথমে ফেলতে পারেন। ডান হাতটা ওপর থেকে নীচের দিকে দুলিয়ে মধ্যমাঙ্গুলিটি তুলে নিলেই নীচের বিবি তাসটি পড়বে। আর মধ্যমাঙ্গুলের চাপ ঠিক রেখে তর্জনীটি তুলে নিলেই ডান হাতের দোলায ওপরের তাসটি (নওলা) আলগা হযে পড়ে যাবে। দর্শকদের মনে হবে নীচেকার তাসটি অর্থাৎ বিবিই প্রথমে পড়লো কিন্তু আসলে বিবিটি রয়ে গেলো আপনার হাতে। এটি আপনি দ্বিতীয় বারে ফেললেন। আপনার আসল কাজ সমাধা হয়ে গেলো। দর্শক নওলা তাসটিকে বিবি বলে জানলেন। (অবশ্য এটি নিখুঁতভাবে করাটা প্রচুর অভ্যাস-সাপেক্ষ। এরপর ধীরে ধীরে তাসগুলো আলাদাভাবে তুলে নিয়ে

কয়েকবার জায়গা অদল বদল করুন, দর্শকদের বলুন তাঁদের দৃষ্টি বিবির ওপর রাখতে। তাঁরা নজর রাখবেন আসলে নওলাটির ওপর, কারণ ওটিকেই তাঁরা বিবি বলে ভুল করে বসে আছেন।

এই কৌশলটিই প্রধান ভিত্তি হলেও তিন তাসের বাজিতে আরো নানারকম কায়দা আছে, এবং পাকা অভিজ্ঞ জুয়াড়িরা কখন কোন কায়দা কাজে লাগাবে বা লাগাচ্ছে তা বোঝা সহজ নয়।

একটি ঘটনার কথা বলি। কলকাতা শহরের অভিজাত রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশের ফুটপাথ। কাছাকাছি লাল পাগড়ি বা অনুরূপ কোনো আপদ উপস্থিত নেই, সুতরাং প্রায় নিরাপদেই বে-আইনী লোক-ঠকানোর ব্যবসা কিছুক্ষণ চালানো চলে। সেই পথে গল্প করতে করতে চলেছিলাম একজন বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, "ঐ দেখো।" দেখলাম। এবং বুঝলাম একটি তিন তাসের জুয়াড়ি তার তিন তাস নিয়ে বসেছে ফুটপাথের ওপর। সামনে ছোটো একটি ভিড়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিলাম এই 'প্রাথমিক' ভিড়টি নিছক কৌতূহলী পথচারী দিয়েই গড়া নয়, এর ভেতর জুয়াড়ির নিজের লোকও রয়েছে। এই 'প্রাথমিক' ভিড় দেখে কৌতূহলী পথচারী দুজন একজন করে এসে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়াতে লাগলো। আমার বন্ধুটি এবং আমিও গিয়ে ভিড় বাড়ালাম। জুয়াড়ি তার বাজীর শর্তটা বুঝিয়ে দিলে। লোভনীয় শর্ত।

পরিষ্কার বোঝা গেলো বিবি তাসটি রয়েছে মাঝখানে। ওটির ওপর বাজি ধরলেই জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রথম ঝুঁকিটা কেউ নিতে চায় না। তখন এক ভদ্রলোক (?) পকেট থেকে মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট মাঝখানের তাসটির ওপর রেখেই তাসটি সঙ্গে সঙ্গে উল্টে দেখিয়ে দিলেন সেটিই বিবি। জুয়াড়ি তখন মুখটি কাঁচুমাচু করে (চমৎকার অভিনয়!) ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা কড়কড়ে দশটাকার নোট বার করে বাজি-বিজেতা ভদ্রলোকের (?) হাতে দিলে। (ভদ্রলোকটি জুয়াড়ির দলের লোক।) সরল আনাড়িরা জুয়াড়ির এই জব্দ হওয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক জুয়াড়িকে আবার তাস ফেলতে বাধ্য করলেন, এবং জুয়াড়ির অনুনয়ে নিজে আর বাজি ধরলেন না, উপস্থিত একজন ভদ্রলোককে (জুয়াড়ির দলের লোক নন) বললেন, "কত আছে আপনার মনিব্যাগে বার করুন শীগগীর।" যেন একটু দেরি হলেই মস্ত বড়ো একটা দাঁও হাতছাড়া হয়ে যাবে। দু নম্বর ভদ্রলোক এক নম্বরের ধমকে থতমত

খেয়ে চার টাকা বার করে দিলেন। এক নম্বর 'ভদ্রলোক' ঐ চার টাকা ছোঁ মেরে একটি তাসের ওপর রেখেই তাসটি উল্‌টে দিলেন। দেখা গেল সেটি বিবি। "বার করো টাকা।" বলে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' জুয়াড়ির কাছ থেকে চার টাকা আদায় করে তু নম্বর ভদ্রলোককে দিলেন। চার টাকা জিতে তু নম্বর ভদ্রলোক ভারি খুশী হয়ে তাকালেন এক নম্বরের মুখের দিকে, ভাবটা যেন 'আপনিই তো এটাকা জিতিয়ে দিলেন। আমি তো সাহসই পাচ্ছিলাম না।'

বাজির খেলা চালু করিযে দিয়ে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' চলে গেলেন। তখন আবার তাস ফেলে ধীরে ধীরে তাদের জায়গা বদলালে জুযাড়ি। পরিষ্কার (?) বোঝা গেলো ডান ধারের তাসটা বিবি। আমার সঙ্গী বন্ধুটি আমার হাঁ হাঁ করে বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ করে একখানা দশ টাকার নোট ডান ধারের তাসের ওপর চাপিয়ে দিযে বললে, "এই বিবি।" জুয়াড়ি সঙ্গে সঙ্গে তাসটা উলটে দেখিয়ে দিলে সেটি অন্য তাস, আর সঙ্গে সঙ্গে দশটাকার নোটখানি পকেটস্থ করলে। কি ভেবে জানি না, জুয়াড়ি ঐ নোটখানা ফেরত দিয়ে দিয়েছিল একটু পরেই। হয়তো ভেবেছিলো আমি ওর খেলার রহস্য সমস্তই জানি, অতএব এক হিসেবে ওর সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আমার বন্ধুর পকেটমারাটা অধর্ম হবে।

তারপর আর একটু বলি। তিনটি তাস এক লাইনে উপুড় করে রেখে জুযাড়ি থুথু ফেলবার অজুহাতে পিছন দিকে কিছুক্ষণের জন্য মুখ ফিরিযে রইলো। (এটি তার একটি মস্ত ভাঁওতা।) সেই ফাঁকে (?) একটি অতি-চালাক লোক (বলা বাহুল্য, এটিও জুয়াড়ির দলের লোক) অন্যান্য সকলের দিকে চোখ ঠেরে করলে কি? না, বিবি তাসটি তুলে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তার একটি কোণা ওপর দিকে উল্‌টে দিয়ে তাসটি আবার যথাস্থানে রেখে দিলে। দিয়ে আরেকবার আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসলো (ভাবটা যেন, 'এইবার এই তিন তাসকে জুয়াড়ি যত খুশি এধার ওধার করুক না কেন, ঐ উল্‌টানো কোণা দেখেই বিবি তাসটিকে নির্ভুলভাবে চেনা যাবে।') থুথু ফেলা শেষ করে জুয়াড়ি আবার নিরীহভাবে তিন তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, যেন এর ভেতর ওকে জব্দ করার জন্যে কি কৌশল করা হলো সে কিছুই বোঝে নি। কয়েকবার তাসগুলোর জায়গা বদল করে তারপর জুয়াড়ি বললে, "এইবার।" সবাই দেখলে কোণা ওলটানো তাসটি পড়ে আছে বাঁ ধারে। তিনজন লোভী ব্যক্তি লোভ সামলাতে না পেরে তাদের সঙ্গের যথাসর্বস্ব মনি-

ব্যাগ থেকে বার করে রাখলে ঐ তাসের ওপর—মোট দাঁড়ালো ত্রিশ টাকার কাছাকাছি। জুয়াড়ি বেচারা প্রায় কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বললে, "এক সঙ্গে তিন তিনজনের বাজি চলবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আলবাৎ চলবে। এক সঙ্গে একজনার বেশি চলবে না এমনতো কথা ছিল না।" সমবেত কণ্ঠে জোর গলায় বলা হলো। এবারে আচ্ছা আটকানো আটকেছে লোকটা। আর রেহাই নেই।

"তাহলে এ বাজি সই, বলছেন আপনারা?"

"আলবাৎ সই।"

"আপনারা হারলে আপনাদের এসব টাকা আমি নিয়ে নিব।"

"নেবে।" বললেন তিনজন আশা-উৎফুল্ল বাজিধর। তাসটি উলটে দেখেই তিনজন আশাবাদীর চোখ কপালে উঠে গেলো। বিবি নয়, নওলা! ব্যাপার কি? (ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাসগুলো হাতাবার সময় জুয়াড়ি সকলের অলক্ষ্যে বিবি তাসখানার উলটানো কোণাটি চেপে সোজা করে দিয়ে নওলার একটি কোণ ঠিক ঐ রকম ছোটো করে উলটে দিয়েছিলো।) এক বাজিতে টাকা ত্রিশেক তিনজনের পকেট থেকে চলে গেলো জুয়াড়ির পকেটে।

এই তিন তাসের বাজির প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে তিন তাসের জুয়াড়ির আরেকটি সূক্ষ্ম চালাকির কথা বলি। মনে করা যাক, এক ভদ্রলোক ডান ধারের তাসটিকে বিবি মনে করে তার ওপর পাঁচ টাকা বাজি ধরলেন। জুয়াড়ি ঐ উপুড় করা তাসটিকে নিজের দিকে তুলে (অপর কেউ যেন দেখতে না পারে সেটি প্রকৃতপক্ষে কি তাস) দেখে বলবে "বিবি"—যদিও আসলে সেটি বিবি নয়, অন্য তাস। দেখেই আবার যেমন ছিলো তেমনি উপুড় করে রেখে দেবে তাসটিকে, এবং বাজি হেরে (অর্থাৎ হারার ভান করে') বাজির টাকাটা দিয়ে দেবে। এতে দর্শকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হবে ঐ তাসটিই নিশ্চয় বিবি, তা নইলে লোকটা বাজির টাকা পকেট থেকে বার করে দিয়ে দিলো কেন? এর পর জুয়াড়ি ঐ তাস তিনটির জায়গা বদল করবে এতো ধীরে ধীরে যেন সবাই নির্ভুলভাবে খেয়াল রাখতে পারেন শেষ পর্যন্ত বিবি তাসটি (?) কোথায় থাকছে। এইবার একজন (অথবা একাধিক জন) বেশি টাকার বাজি ধরবেন, কারণ ভাববেন বাজি জেতা সুনিশ্চিত। কিন্তু এবার জুয়াড়ির জিত। উলটে দেখা যাবে বিবি নয়, অন্য তাস। বাজি জিতে টাকাটা পকেটস্থ করবে জুয়াড়ি।

অতএব এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বলি : পেশাদার জুয়াড়িদের সঙ্গে জুয়ায় ভাগ্য পরীক্ষা বা বাজি ধরে চালাকির লড়াই করতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

উনিশ শতকের শেষ দিকের বিখ্যাত মার্কিন যাত্নকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান (Alexander Herrmann) যেমন ছিলেন অসাধারণ যাত্নশিল্পী, তেমনি ছিলেন চূড়ান্ত খামখেয়ালি। (ইনি 'হারম্যান দি গ্রেট' নামে অসামান্য খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ৫৩ বছর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।) শুধু মঞ্চে খেলা দেখাবার সময় নয়, যখন তখন যেখানে-সেখানে তিনি ভোজবাজি শুরু করতেন। একদিন বাজারে গিয়ে এক বুড়ির কাছ থেকে কয়েকটি ডিম কিনে প্রত্যেকটির ভেতর থেকে একটি করে সোনার মোহর বার করে বুড়িকে বললেন, "ভারি আশ্চর্য ডিম তো। বাকি ডিমগুলোও আমি কিনে নেবো।" বুড়ি তখন ঐ ক'টি ডিম বিক্রি করে ফেলেই পস্তাচ্ছিল, আর একটিও ডিম বেচতে রাজী হলো না। তখন মহা বিমর্ষতার ভান করে চলে গেলেন যাত্নকর হারম্যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন বুড়ি তার ঝুড়ির অনেকগুলো ডিম ভেঙে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। বেচারা ভেবেছিলো ডিমগুলো ভেঙে একগাদা মোহর পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে, কিন্তু ডিম-ভাঙা লোকসানই সার হলো। হারম্যান তখন বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি বুড়ির সঙ্গে একটু তামাশা করে যাত্নর খেলা দেখিয়েছিলেন মাত্র। আর ডিম ভাঙতে মানা করে তাকে সবগুলো ডিমের দাম দিয়ে গেলেন তিনি। বুড়ি খুশী হয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো খামখেয়ালি যাত্নকর 'হারম্যান দি গ্রেট'-এর এই তামাসা আর সহৃদয়তার কথা। ফলে অতি কম খরচে অতি মূল্যবান বিজ্ঞাপন হয়ে গেলো তাঁর। সেই শহরেই এক থিয়েটার হলে তিনি যাত্ন দেখাচ্ছিলেন। লোকে লোকারণ্য হতে লাগলো এই খেয়ালী যাত্নকরের যাত্ন দেখতে।

অসাধারণ যাত্নকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান এক হিসেবে অসাধারণ সৌভাগ্যবানও ছিলেন। তিনি তাঁর সহকারীরূপে পেয়েছিলেন অসামান্য যাত্ন প্রতিভাধর উইলিয়ম রবিনসনকে। (এই রবিনসনই পরে হয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্নকর "চুং লিং সু"।) হারম্যান নিজে ছিলেন যেমন অসাধারণ প্রতিভাধর অভিনেতা, তেমনি তালিম দিয়ে রূপসজ্জা এবং অভিনয়ে অসামান্য সুদক্ষ করে

তুলেছিলেন সহকারী রবিনসনকে। অবশ্য রবিনসনের নিজের অসাধারণ প্রতিভা ছিলো বলেই তা সম্ভব হয়েছিলো। হারম্যানের চলাফেরা, হাবভাব, কথাবার্তা এবং যাত্নুপ্রদর্শনের ভঙ্গীগুলো রবিনসন এমনভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন যে তিনি যখন হারম্যান সেজে মঞ্চে খেলা দেখাতেন, তখন দর্শকরা টের পেতেন না তিনি আসল হারম্যান নন।

মঞ্চে হারম্যান যে সব অদ্ভুত খেলা দেখাতেন তা দেখে অনেকেরই মনে বিশ্বাস ছিলো হারম্যানের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এমনও গুজব রটেছিলো যে একই সময় তিনি দু জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারেন। এটি হয়েছিলো কি ভাবে তাই বলি। হারম্যান ছিলেন ঘোড়দৌড়-ভক্ত। ভালো ঘোড়দৌড় থাকলে তিনি দেখতে যাবার স্থযোগ পারতপক্ষে ছাড়তেন না।

এমনও হতে পারে যে স্বামীরা যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে জলজ্যান্ত হারম্যানকে দেখে তাঁর সঙ্গে রীতিমতো আলাপ আলোচনা করে বাড়ি ফিরলেন তখন স্ত্রীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ম্যাটিনী শো-তে জলজ্যান্ত হারম্যানের ম্যাজিক দেখে ফিরেছেন। স্বামী-স্ত্রীরা হিসেব করে দেখলেন হারম্যান যে সময় ঘোড়-দৌড়ের মাঠে হাজির ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি থিয়েটার হলের মঞ্চে যাত্নু-ক্রীড়াও দেখাচ্ছিলেন! স্বামীরা জোরগলায় বলেন, "নিজের চোখে দেখে এসেছি, নিজের কানে শুনে এসেছি।" স্ত্রীরাও জোর গলায় ঠিক তাই বলেন। স্থতরাং একই সময় রহস্যময় হারম্যান দু জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। খোদ হারম্যানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু একটু রহস্যময় হাসি হাসতেন, যেন এর ভেতর সত্যিই কিছু অলৌকিক ব্যাপার রয়েছে। বলতেন না, গিন্নীরা ম্যাটিনী শো-তে যে "হারম্যান"কে ম্যাজিক দেখাতে দেখে এসেছেন, সে হারম্যান আসল হারম্যান নয়, হারম্যানের নিখুঁত ছদ্মবেশে তাঁর সহকারী উইলিযাম রবিনসন।

বেকায়দায় যাদুকর

যাদুকর রাজা বোসের মুখে শোনা একটি গল্প বলি। বিখ্যাত যাদুকর নিকোলা একবার একা তাঁর মোটরগাড়ি চালিয়ে চলেছিলেন শহর থেকে দূরে এক পল্লী অঞ্চলের কাঁচা রাস্তা দিয়ে। ঋতুটা ছিলো বর্ষা, আর এক পশলা বর্ষণও হয়ে গিয়েছিলো একটু আগেই। তারই ফলে স্বভাবনরম রাস্তা হয়ে উঠেছিলো আরো নরম।

পাকা যাদুকর নিকোলা এমনিতে খুবই হুঁশিয়ার লোক—তাঁর চোখ, কান, মন সব কিছু অত্যন্ত সজাগ। অমন না হলে পাকা যাদুকর হওয়াও যায় না; তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তীক্ষ্ণশ্রবণ আর প্রত্যুৎপন্নমতি (সোজা ভাষায় উপস্থিত বুদ্ধি) না হলে এক সঙ্গে হলসুদ্ধ লোককে বোকা বানিয়ে যাদুর খেলা দেখাবেন কি করে? কিন্তু সেদিনকার নিকোলা—পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা দেখে বিমুগ্ধ নিকোলা, খেয়ালী-আপনভোলা নিকোলা, ছুটির মেজাজে মন এলিয়ে দেওয়া নিকোলা। নিরালা কাঁচা নরম রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলেছে নিকোলার হাওয়া-গাড়ি, যার চালন-চক্রে বিশ্রাম করছে নিকোলার যাদুদক্ষ হাত।

কিন্তু একি? এগিয়ে যেতে যেতে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলো কেন? স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে নেমে এলেন যাদুকর নিকোলা। দেখলেন গাড়ির সামনের একটি চাকা কাদায় ডুবে আটকে গেছে, ঐ কাদা থেকে চাকা তুলতে না পারলে গাড়ি আর এগোবে না। গাড়ির নিজস্ব শক্তি এখানে ব্যর্থ, বাইরের শক্তি অত্যাবশ্যক। কিন্তু নিকোলা এতো বড়ো পালোয়ান নন যে ঐ কাদা থেকে গাড়ির চাকা ঠেলে তুলতে পারবেন।

বিজন পথ। কাছাকাছি কেউ নেই যার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে। আচ্ছা বিপত্তিতেই পড়া গেলো, এখন কি করা যায়? গাড়িটাও এ অবস্থাতেই ফেলে রেখে পদব্রজে শহরে ফিরে গিয়ে সাহায্যকারী সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন? সেটা কি গাড়ির পক্ষে নিরাপদ হবে? তাছাড়া শহরও এখান থেকে অনেকটা

পথ, আর পদব্রজটা নিকোলার তেমন রপ্ত নেই। সুতরাং তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়।

কিছুক্ষণ বাদে সেই পথে এলো কয়েকজন পথিক। তারা শহরে যায় বটে, কিন্তু শহরে নয়, পল্লী অঞ্চলের মজবুত বাসিন্দা। এদের যে কোনো একজন তিনজন নিকোলার চাইতে বেশি শক্তিশালী। নিকোলা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে এদের বললেন, "ভাই, আমি বড়ো বিপদে পড়েছি, তোমরা আমায় বাঁচাও।"

"কি বিপদ?"

"আমার গাড়ির এই চাকাটা কাদায় আটকে গেছে। তোমরা একটু ঠেলে তুলে দেবে?"

"এ আর বেশি কথা কি? নিশ্চয় দেবো।" বলে সেই তাগড়া পালোয়ানেরা আস্তিন গুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাকায় হাত লাগায় আর কি!

কিন্তু না, হাত লাগালো না তারা। তাদের একজন যাদুকরের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁকে চিনে ফেলে শুধালো, "আপনি যাদুকর নিকোলা নন?"

নিকোলা একটু গর্ববোধ করলেন মনে মনে; রঙ্গালয়ের বাইরেও লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই যাদুকর নিকোলা।"

শুনে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে ওরা সবাই গুটানো আস্তিন নামিয়ে ফেললো। রঙ্গালয়ে মহাযাদুকর নিকোলার বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে এরা অনেকবার মুগ্ধ হয়েছে। যাদুমন্ত্রে তাঁকে মঞ্চের ওপর থেকে চোখের পলকে জলজ্যান্ত মোটরগাড়িকে উড়িয়ে দিতে অনেক দেখেছে তারা। একটা ফুসমন্তর, আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া-গাড়ি বেমালুম হাওয়া। সেই হাওয়া-গাড়ির মাত্র একটা চাকা কাদা থেকে তুলবার জন্যে কিনা তাদের সাহায্য ভিক্ষা করছেন এই অলৌকিক শক্তিমান যাদুকর! নিশ্চয় তিনি তাদের সঙ্গে তামাসা করছেন, কারণ তিনি ইচ্ছে করলেই এক যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে এক মুহূর্তে গাড়ির চাকা কাদা থেকে তুলে নিতে পারেন। সুতরাং এখন তাঁকে সাহায্য করতে গেলেই হয়তো বোকা বনতে হবে, যাদুর খেলার সময় যাদুকর যেমন অনেক চালাক দর্শককে বোকা বানান।

ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে লজ্জিত মুখে ওরা ফিরে যাচ্ছিলো। তখন বিপন্ন যাদুকর বাধ্য হয়ে ওদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি সত্যিই বিপন্ন, ওরা সাহায্য করে কাদা থেকে চাকা তুলে না দিলে তাঁকে এখানেই আটকে থাকতে হবে, মঞ্চের যাদু এখানে তাঁকে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না।

ওরা তখন চাকা তুলে দিলো কাদা থেকে, যাদুমন্ত্রে নয়, গায়ের জোরে। ওদের ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন কৃতজ্ঞ যাদুকর। ওরা বিস্মিত হয়ে ভাবতে ভাবতে গেলো, যাদুর জোরে যিনি গোটা গাড়ি উড়িয়ে দিতে পারেন, তিনি গাড়ির একটা চাকা কাদা থেকে যাদুর জোরে ওঠাতে পারলেন না কেন!

* * * *

একজন যাদুকর ঘড়ির খেলা দেখাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছিলেন। কোনো এ' মফঃস্বল শহরের একটি ছোটো হলে খেলা দেখাচ্ছিলেন যাদুকর ভদ্রলোক। হলের সামনের দিকে একটি দরজার ধারে যাদুকর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন তাঁর দলের একজন পাকা লোককে, লোকটির হাতে একটি ছোটো ঘড়ি। যাদু দর্শনার্থীরা ঐ দরজা দিয়ে যখন হলের ভেতর প্রবেশ করছিলেন, ঐ লোকটি পাকা হাতে তাঁদের একজনের পকেটে ঐ ঘড়িটি এমনভাবে ফেলে দিলেন যেন ভদ্রলোক টের না পান। তারপর লক্ষ্য করলেন তিনি কোথায় বসেন। খেলা যখন শুরু হলো তখন তিনি ইশারায় যাদুকরকে জানিয়ে দিলেন কোন ভদ্রলোকের পকেটে ঘড়িটি গোপনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাদুকরও চিনে রাখলেন ভদ্রলোককে।

ঘড়ির খেলা শুরু করলেন যাদুকর। যে ঘড়িটি ঐ ভদ্রলোকের পকেটে গোপনে ফেলে দেওয়া হযেছিলো, ঠিক সেই রকম একটি ঘড়ি হাতে নিযে তাই দিয়ে দু-তিনটি চমৎকার হাত-সাফাইযের খেলা দেখিয়ে তারপর যাদুকর সেটিকে তাঁর ম্যাজিক পিস্তলে পুরলেন। তারপর 'হোকাস পোকাস' জাতায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ঘোড়া টিপলেন। আওয়াজ হলো। ধোঁয়া উঠলো। যাদুকর বললেন 'ঐ যে ঘড়িটি হাওযার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো, গিয়ে ঢুকলো ঐ ভদ্রলোকের পকেটে' বলে পিস্তলটি মঞ্চে টেবিলের ওপর রেখে তিনি নেমে দর্শকদের ভেতর এগিয়ে গিযে সেই

ভদ্রলোককে বললেন, "দেখুন তো ঘড়িটি ঠিক মতো এসে আপনার পকেটে পৌঁছেছে কিনা।"

ভদ্রলোক মহা আপত্তিতে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, "না না না, সে কি কথা মশাই? ঘড়ি আমার পকেটে আসবে কি করে? ঘড়ি-টড়ি নেই আমার পকেটে।" তাঁর ঘোর আপত্তি এবং জোর মাথা নাড়ার বহর দেখে অনেকেই হেসে উঠলেন। যাত্নুকরও হেসে উঠলেন। যাত্নুকরও হেসে বললেন "পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখুনই না।"

পকেটে হাত দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটলো। পকেটে ঢুকানো হাত পকেটেই ঢুকে রইলো, ভদ্রলোক নিশ্চল নিস্পন্দ নীরব পাথরের মূর্তির মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘড়িটি পকেট থেকে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে বার করে এনে ভীষণ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো! এ যে আস্তো জলজ্যান্ত ঘড়ি। আমার পকেটে পাঠালেন কি করে মশাই?"

যাত্নুকর রহস্যমাখানো হাসি হেসে বললেন, "ঐটেই তো আমার যাত্নুর রহস্য।"

সেই 'বিস্মিত' ভদ্রলোক তখন তাঁর ডান হাতের মুঠোয় লুকানো ঘড়ি তুহাতের তালু দিয়ে ঢেকে রগড়াতে রগড়াতে বললেন, "তাহলে আমিও একটু যাত্নুর খেলা দেখাই। এক-দো-তিন, চলা যাও, চলা যাও, চলা যাও। ফুঃ! ঐ চলে যাচ্ছে—যাচ্ছে—যাচ্ছে, চলে গেল ঐ ভদ্রলোকের পকেটে।" বলে অদূরের এক ভদ্রলোকের দিকে তুহাত ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন যে ঘড়িটা এইমাত্র পকেট থেকে বার করেছিলেন সেটি সত্যিই তাঁর হাত থেকে বেমালুম উড়ে গেছে!

এই প্রথম ভদ্রলোক ঐ দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন তো ঘড়িটা আপনার পকেটে ঠিক মতো পাঠাতে পেরেছি কিনা?"

তু নম্বর ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে ঘড়ি বার করে নিজে যেমন বিস্মিত হলেন, তেমনি, অনেককে বিস্মিত করলেন।

যাত্নুকর বিস্মিত হয়ে পয়লা নম্বর ভদ্রলোককে বললেন, "আশ্চর্য! কি করে করলেন?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ঐ তো আমার যাত্নু।"

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিলো এই রকম। যাদুকরের গোপন সহকারীটি ঐ প্রথম ভদ্রলোকের পকেটে গোপনে ঘড়িটি ফেলে দেবার অল্প পরেই দৈবাৎ পকেটে হাত দিয়ে ভদ্রলোক চমকে উঠে ভেবেছিলেন, 'একি? আমার পকেটে ঘড়ি এলো কোথা থেকে? নিশ্চয় কেউ হাত সাফাইযের জোরে চালিযে দিয়েছে, আমায বেকায়দায় ফেলবার বা বোকা বানাবার জন্য। তাড়াতাড়ি এক ফাঁকে এটিকে পকেটান্তরিত করে ফেলতে হচ্চে।'

এবং তিনিও প্রথম সুযোগে হাতসাফাই করে তাঁব পকেট থেকে ঘড়িটিকে দু নম্বব ভদ্রলোকের পকেটে চালান কবে দিয়েছিলেন। ··

একবার কৌতুক আর করুণরসে মেশানো বেকাযদায পড়েছিলেন যাদুকর মৃণাল বায। তাঁর সেই বেকাযদার কাহিনী বলি।

একদিন তিনি কোনো একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঘরোযা আসরে কযেকটি যাদুর খেলা দেখান। তাদের ভেতর একটি খেলা ছিলো পুবানো খবরের কাগজ ছিঁড়ে সিল্কের কাপড়ে পরিণত করা। খেলাগুলো—বিশেষ করে এই সিল্কের কাপড তৈরির সহজ উপায়টি—সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করলো সে বাড়ির বৃদ্ধা দিদিমাকে। খেলাটি দেখাবাব সময যাদুকর গল্পচ্ছলে বলেছিলেন পুবানো কাগজ ছিঁড়ে তাই থেকে খাঁটি সিল্কের কাপড় তৈরি করা খুবই সহজ। এই নির্জলা মিথ্যেটিকে বৃদ্ধা বিশ্বাস করেছিলেন নির্ভেজাল সত্য বলে। খেলার শেষে আড়ালে ডেকে নিয়ে বৃদ্ধা তাঁকে বললেন, "বাছা, দেখছো তো আমাদেব অবস্থা? দুবেলা দুমুঠো খোরাকও ঠিক মতো জোটে না। কাগজ থেকে রেশমি কাপড় বানাবার কাযদাটা যদি দয়া করে শিখিয়ে দাও, তাহলে এ পরিবারের পোড়া কপালটাকে একটু ফেরাতে পারি।"

সেদিনকার মতো ছাড়া পাবার জন্যে যাদুকর বললেন, "আজ আসি দিদিমা। কিছু খবরের কাগজ জোগাড় করে রাখবেন, পরে আসবো 'খন একদিন।"

দিন পনেরো বাদে দিদিমা লোক পাঠিয়ে নিযে গেলেন যাদুকরকে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে যাদুকরের চক্ষুস্থির। অত্যন্ত গরীব, অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন পরিবার। বহু দুঃখে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে দিদিমা প্রায় আধ মণ পুরানো খবরের কাগজ চড়া দাম দিয়েই কিনে লুকিয়ে রেখেছেন। স্বপ্ন দেখছেন এই আধ মণ কাগজ যাদুকরের কৌশলে পরিণত হবে আধ মণ সিল্কের কাপড়ে; সে কাপড়

বাজার দরের আধা দামে বিক্রি করে দিলেও পরিবারের হাল ফিরে যাবে, ছেলেমেয়েগুলো দুধ, মাছ, মাংস খেতে পারবে, তাদের গায়ে উঠবে ভালো কাপড় জামা।

"এই কাগজগুলোকে রেশমী কাপড় বানিয়ে দাও বাবা।" বললেন দিদিমা। তাঁর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠলো যাদুকরের যাদুতে অসীম বিশ্বাস; দুই চোখে ফুটে উঠলো আসন্ন মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

যাদুকরের মনে হলো এমন বেকায়দায় তিনি আর কখনো পড়েন নি। হয় এতোগুলো কাগজকে রেশমী কাপড় বানিয়ে দিতে হবে, অথবা ভেঙে দিতে হবে বৃদ্ধার স্বপ্ন। প্রথমটি সম্ভব নয়, সুতরাং বৃদ্ধার স্বপ্নই ভেঙে দিতে হলো: তাঁকে বলতেই হলো কাগজকে কাপড় বানানো যায় না, তিনি যা দেখেছিলেন তা তাঁর চোখের ভুল আর যাদুকরের হাতসাফাই।

বৃদ্ধার অনেক কষ্টের টাকায় কেনা কাগজগুলো কম দামে লোকসানে বেচে দিয়ে বৃদ্ধাকে পুরো দামই দিয়ে দিলেন যাদুকর। মনে মনে বললেন, 'বৃদ্ধার টাকার লোকসানটা বাঁচালাম। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা এঁকে ভোলাবো কোন যাদুতে?

* * * *

বাংলার উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীত-রসিক সমাজে জ্ঞানী ও গুণী সেতারী রূপে শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (কচিবাবু) সুপরিচিত এবং বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশে যাদু চর্চার ইতিহাসেও যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ সংবাদ হয়তো অনেকে রাখেন না। সংগীতচর্চা এবং সংগীতের পৃষ্ঠ-পোষকতার জন্য বিখ্যাত গৌরীপুরের (মৈমনসিং) রায়চৌধুরী পরিবারে সংগীতের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন তিনি, ভারতবিখ্যাত বহু ওস্তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার করেছেন, সেতারে তালিম পেয়েছেন তখনকার সেরা সেতারী ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে। তাঁর প্রথম-প্রেম সংগীত, দ্বিতীয়-প্রেম যাদুবিদ্যা। শৈশবে বারাণসীধামে যাদুকর "ডিভারো"-র (Devarro) যাদুর খেলা দেখে তাঁর যাদুকর হবার ঝোঁক চেপেছিলো। ধনী পরিবারের ছেলে তিনি, শখ মেটাবার জন্য অর্থের অভাব হয়নি। যাদু চর্চায় তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

দুই নায়ে পা দিয়ে থাকা অসুবিধাজনক বিবেচনা করে বিমলাকান্ত সংগীতে একান্ত হবার জন্য শেষ পর্যন্ত যাদু থেকে বিদায় নিলেন। সেই বিদায় নেবার

বহুদিন বাদেও তাঁর হাতে কয়েকটি যাদুর খেলা এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি, যাতে মনে হয় তিনি যাদুজগতে থাকলে এখন নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রথম সারিতে দেখতে পেতাম। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যাদুকর জীবনে তিনি কখনো বেকায়দায় পড়েছিলেন কিনা। জবাব পেয়েছিলাম তিনি নিখুঁত ভাবে তৈরি না হয়ে কখনো খেলা দেখাতেন না বলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বেকায়দায় তাঁকে কখনোই পড়তে হয়নি। হ্যাঁ, একবার যে অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন তাকে ইচ্ছে করলে বেকায়দা বলা চলে, কিন্তু সেজন্যে তিনি দায়ী ছিলেন না। ঘটনাটা এইরকম :

কোনো একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি বিখ্যাত হলে 'ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম' অর্থাৎ বিচিত্র অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে বিমলাকান্তও যাদুর খেলা দেখাবেন। তিনি কয়েকটা বাছাই খেলা ঠিক করে রেখেছেন, প্রথম খেলাটিতেই আসর মাত করে ফেলবেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে একটি ফোঁটাও সন্দেহ নেই। প্রথম খেলাটি তাঁর নিজের তৈরি। খেলাটির নাম "Look!" অর্থাৎ "চেয়ে দেখুন!" দ্রুতবেগে পোশাক পরিবর্তনের খেলা। খেলাটির আসল মজাই হচ্ছে দ্রুত, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, যাকে ইংরেজিতে বলে 'সারপ্রাইজ' (surprise)।

প্রোগ্রামে বিমলাকান্তের ঠিক আগেই ছিলো একজন প্রবীণ যাদুকরের খেলা। বিমলাকান্তকে তিনি অনুজ স্থানীয় মনে করে স্নেহ করতেন। তাঁর পালা শেষ হলো, এইবার শুরু হবে তরুণ যাদুকর বিমলাকান্তের খেলা দেখানো। প্রবীণ ভদ্রলোক স্নেহ ভরে ভাবলেন তাঁর যাদুজগতের ক[নি]ষ্ঠ ভ্রাতাটিকে [একটু] পরিচিত করে দেওয়াই তাঁর পক্ষে অগ্রজের উপযুক্ত কাজ হবে। সুতরাং তিনি পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, "এইবার আপনারা আমার পরম স্নেহাস্পদ যাদুকর শ্রীমান বিমলাকান্তর অত্যাশ্চর্য যাদুর খেলা দেখবেন। সর্বপ্রথম এঁর যে খেলাটি আপনারা দেখবেন, সেটি দেখে আপনাদের তাক লেগে যাবে। প্রথম যখন বিমল এখানে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন দেখবেন সে ধুতি পাঞ্জাবি-পরা পুরোপুরি বাঙালী। তারপর স্টেজের পেছনে এই যে এধার থেকে ওধারে নিচু পর্দা ঝুলছে, এর পেছন দিয়ে বিমল একবার মাত্র হেঁটে যাবে আপনাদের চোখের সুমুখ দিয়ে। তা[র] পা, আর কাঁধের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত আপনারা সব সময় দেখতে পাবেন। তারপর পর্দার এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই আপনারা দেখে অবাক হবেন—কোথায় গেলো ধুতি

পাঞ্জাবি ? তার জায়গায় কোট প্যাণ্ট পরে বিমল পুরো দস্তুর সাহেব। এমন আশ্চর্য খেলা আপনারা আর দেখেন নি।"

এভাবে দর্শকদের খেলা দেখবার জন্য প্রস্তুত করে তিনি মঞ্চের নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন, "বিমল, চলে এসো।"

বেচারা বিমলাকান্তর মহা বেকায়দা অবস্থা। আচম্‌কা বিস্ময় যে খেলার মজা, পরম স্নেহে আগে সমস্তই বলে দিয়ে সেই বিস্ময়ের গোড়া মেরে রেখেছেন অগ্রজোপম যাদুকর। আগে থেকে বলে যে খেলা এভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই খেলা দেখাবার জন্যই মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। হায় দুর্ভাগ্য! কিন্তু উপায় কি ? যেতেই হলো। খেলাটি একেবারে ব্যর্থ হলো না। কিন্তু যতোটা হাততালি অর্জন করতে পারতো ততোটা করলো না, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেক সময়ে ভালো করতে গিয়ে উল্‌টে বেকায়দায় ফেলেন, এ কাহিনীটি তারই একটি ভালো উদাহরণ।

যাদুকর রয় দি মিস্টিক-এর মুখে শোনা কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী বলি।

প্রথমে বলি ১৯১৫ কি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। রয় দি মিস্টিক তখন সাদা-সিধে যতীন রায়, যাদুবিদ্যার উৎসাহী সাধক, মুঙ্গেরের একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছেন সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত গৃহে গৃহশিক্ষক হয়ে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি এবং নিরিবিলিতে হাতেকলমে সাধনা করে যাদুবিদ্যায় কার্যকরী দক্ষতা অর্জন করা। বাড়ির ছেলেদের পড়াতেন আর ইংরেজী বইয়ের উপদেশ অনুযায়ী যাদুর কৌশল আর 'ভেনট্রিলোকুইজম' অভ্যাস করতেন। গোপনেই করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারধারে জানাজানি হয়ে গেলো 'মাস্টার সাহেব' অলৌকিক শক্তির অধিকারী যাদুকর, ভূতের সঙ্গেও কথা বলেন। ভূতের সঙ্গে কথা কওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য 'ভেনট্রিলোকুইজম' (স্বরক্ষেপণ)। একদিন ছেলেদের পড়াচ্ছেন, এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে একদল গ্রামবাসী এসে হাজির; তারা যাদু ওস্তাদকে চায়। ব্যাপার কি ? দুদিন হলো তাদের একটি ছেলে কেউটের কামড়ে মরেছে। ওঝা বদ্যি কিছু করতে পারেনি; এখানকার হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছে, হাসপাতালও কিছু করতে পারেনি। যাদুকরের খবর পেয়ে তারা এসেছে তাঁর শরণ নিতে; সাপের কামড়ে মরা ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে যাদুর জোরে।

নাছোড়বান্দাদের সরাসরি বিদায় করা অসম্ভব হলো। ওরা এক রকম জোর করেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলো। গিয়ে তিনি দেখলেন, হাসপাতালের একটি গাছের তলায় মৃত ছেলেটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিলো। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন: "যাত্নকর মরা মানুষ বাঁচাতে পারে না সে কথা এরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না; ভাববে আপনি ইচ্ছে করেই ছেলেটিকে বাঁচাচ্ছেন না। তখন এদের হাতে আপনার প্রাণসংশয় হবে। সুতরাং আপনাকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন আপনি ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করছেন, কিন্তু এদেরই দোষে বাঁচাতে পারলেন না।"

অর্থাৎ পাকা অভিনয় করে সবটা দোষ ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারলে রক্ষা নেই। প্রাণের দায়ে তা-ই অভিনয় করতে হলো যাত্নকরকে। যাত্নকরোচিত রহস্য-গম্ভীরভাবে মৃতদেহের বুকের ওপর রুমাল রেখে তার ওপর কান রেখে কি যেন শোনবার ভঙ্গি করে তারপর মৃতদেহের আচ্ছাদন তুলে দেখলেন সেটি বেশ ফুলে উঠেছে। মৃতদেহের দিকে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ, স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর গভীর হতাশা, গভীর বিরক্তি, গভীর বেদনার ভান করে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "হায় হায়! তোমরা করেছো কি? ছেলেটাকে বাসি করে, পচিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছো? আগে আনতে পারো নি? ছেলেটির পবিত্র আত্মা এখন এই পচা ফুলে ওঠা দেহে ফিরে আসতে চাইছে না। যাত্ন দিয়ে জোর করে তাকে এই পচা গলা দেহে ঢোকাতে গেলে সে ভয়ানক চটে যাবে; এমন কি সে ভূত হয়ে তোমাদের কারও ঘাড়েও চাপতে পারে। সাপে কাটা মড়া টাটকা হলে নিশ্চয়ই বাঁচানো যেতো; এখন আর উপায় নেই। অবিলম্বে গিয়ে এর সৎকার করো, নইলে এর আত্মার মুক্তি হবে না, তোমাদের মহাপাপ হবে।"

অমার্জনীয় অন্যায় করে ফেলেছে ভেবেই হোক, বা ভূতের ভয়েই হোক, তারা মৃতদেহটিকে নিয়ে চলে গেলো। বিষম বেকায়দা থেকে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন যাত্নকর রায়। এর পর আর বেশিদিন সে অঞ্চলে থাকা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। কে জানে ওরা আবার টাটকা মড়া নিয়ে এসে হাজির হবে?

দ্বিতীয় কাহিনীটি ১৯১৯ কি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের। মহাত্মাজীর বাণী 'চরকা

দিয়েই স্বরাজ মিলবে'; ঘরে ঘরে তাঁ ৮এক বৃঘব্‌। চারিদিকে খদ্দর আর গান্ধীটুপির জয়জয়কার।

এমনি সময়ে যাদুকর রায়কে মীর্জাপু। র্তমান উত্তরপ্রদেশে) যেতে হয়েছিলো রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট হলে ইংরেজ দর্শকদের যাদুব খেলা দেখাতে। ইন্‌স্টিটিউট হলটি স্টেশনের ধারেই। যাদু প্রদর্শন শুরু করবার তখনো কিছু দেরি আছে; স্টেশনের সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের এক পাশে যাদুকর বায খাওয়ার পাট সেরে নিচ্ছেন, পরনে ইউবোপীয়ান পোশাক। এমন সময় খদ্দরপরিহিত এবং গান্ধীটুপি মাথায় একদল দেশপ্রেমিকের প্রবেশ। তাঁরা দল বেঁধে কোনো এক কনফারেন্সে যাচ্ছেন, ট্রেন আসবার একটু দেরি আছে বলে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবেন। তাঁদেব দেখে বোঝা গেলো তাঁরা উত্তর-প্রদেশেরই সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন লোক। পুরো স্বদেশী হুজুগের সময়ে একজন ভারতীয়কে পুরো বিদেশী পোশাকে দেখে তাঁরা প্রায় মারমুখো হয়ে উঠলেন। এতোগুলো ক্ষ্যাপা লোকের মাঝখানে একা পড়ে অসহায় বোধ করতে লাগলেন যাদুকর রায়। চাঁদা করে এরা যদি উত্তম মধ্যম লাগায়, তাহলেও কিছু করবার উপায় নেই। সুতরাং এঁদের ভালোভাবে বুঝিয়ে সুঝিযে ঠাণ্ডা করতেই হবে।

বললেন, "বিদেশী বর্জন করে আমাদের টাকা বিদেশীর পকেটে যাওয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু বিদেশীর পকেট থেকে আমাদের পকেটে আনা যায না। বিদেশী পোশাক পরে যদি বিদেশীর পকেট থেকে টাকা আনা যায তাহলে আমারই এই বিদেশী পোশাকে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি থাকবে না?"

শুনে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই থাকবে না। কিন্তু টাকা আপনি আনবেন কি করে?"

যাদুকর বললেন, "আমি একজন বাঙালী যাদুকর। ইংরেজ মহলে এই ইংরেজি পোশাকে যাদু দেখিয়ে বেড়াই। তাঁরা আমাব যাদুর খেলা দেখে খুশী হয়ে টাকা দিয়ে আমার পকেট বোঝাই কবে দেন। ইংরেজরা আমাদের নানা-ভাবে শোষণ করে; আমি এইভাবে তাদের শোষণ করি। এই পোশাক ছাড়া এ কাজ হয় না বলেই এই পোশাকের মায়া এখনো ছাড়তে পারি নি। এখন বুঝতে পারছেন কেন আমার বিদেশী পোশাক পরা?"

বিদেশী পোশাকের সাহায্যে বিদেশীর পকেট মারার পরিকল্পনাটা স্বদেশী-

ওয়ালাদের খুবই মনঃপূত হলো। তাঁরা মহা উল্লাসে সাবাশ দিয়ে উঠলেন। আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেলো। যাঁরা দল বেঁধে মারমুখো হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের সবারই যেন বহুদিনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন যাত্নকর রায়। বেকায়দা থেকে তিনি চমৎকারভাবে রেহাই পেয়ে গেলেন যাত্নকরোচিত উপস্থিতবুদ্ধির জোরে।

১৯২৩ খৃস্টাব্দ। রংপুরের টাউন হলে 'রয় দি মিস্টিক'-এর যাত্নর খেলা চলছে। প্রদর্শনীর তৃতীয় দিনে বেকায়দায় পড়ে গেলেন যাত্নকর। এদিকে তাঁর ভীষণ জ্বর, মাথা তুলতে পারেন না ; ওদিকে দর্শক সমাগম হয়েছে ভালো, খেলা না দেখালে এতো লোককে ফেরাতে হবে। বেকায়দায় পড়ে ১০০ ডিগ্রি জ্বর নিয়েই যাত্নর খেলা দেখাতে স্টেজে উঠলেন। দেখাতে দেখাতে তন্ময় হয়ে ভুলে গেলেন অসুস্থতার কথা। দর্শকরা অবশ্য জানেন অসুস্থ শরীর নিয়েই যাত্নকর খেলা দেখাচ্ছেন।

এলো শেষ খেলা : "শূন্যে ভাসমানা বালিকা"। বালিকাকে হিপনোটাইজ্ (সম্মোহন) করার অভিনয় করে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে যাত্নকর তাঁদের হর্ষধ্বনি এবং করতালির অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, এমন সময় ঐ পাঁচ ছয় ফুট উঁচু থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ করে বালিকাটি স্টেজের ওপর পড়ে গেলো। সম্ভবত অনবধানবশতঃ যান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিলো।

তাড়াতাড়ি সামনের পর্দা ফেলে দেওয়া হলো। দর্শকমহলে গভীর উৎকণ্ঠা : মেয়েটি কি ভীষণ রকম আহত হয়েছে ? মরে যায়নি তো ? অসুস্থ, শ্রান্ত যাত্নকরও তাই ভেবে ভীত হলেন। তাঁর ভাগ্য ভালো, বালিকাটির কিছু হয়নি।

পরদিন দেখা গেলো শহরময় রটে গেছে যাত্নকর অসুস্থতার দরুনই মেয়েটিকে অন্যান্য দিনের মতো নিখুঁতভাবে হিপ্‌নোটাইজ করতে পারেননি ; তাই সেই অসম্পূর্ণ সম্মোহন বালিকাকে বেশিক্ষণ শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে পারেননি। তবু সম্মোহিত ছিলো বলেই বালিকাটি অতো উঁচু থেকে পড়েও আঘাত পায়নি।

'হিতে বিপরীত' বলে একটা কথা শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে যাত্নকর 'রয় দি মিস্টিক'-এর পক্ষে 'বিপরীতে হিত' হলো। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গেলো বালিকাটিকে সত্যি সত্যিই হিপনোটিজম্ বা সম্মোহন শক্তির সাহায্যে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ হিপনোটিজম্ দ্বারাই মাধ্যাকর্ষণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়, এর ভেতর কোনো ফাঁকি বা চালাকি নেই। এর ফলে তাঁর যাত্ন-প্রদর্শনীতে লোক-সমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

কয়েকটি যাদু-খেলার কথা

আজকাল উল্লেখযোগ্য মঞ্চ-যাদুকরদের ভেতর প্রায় সবাই দেখিয়ে থাকেন একটি রোমাঞ্চকর খেলা : Sawing a woman in half, অর্থাৎ একটি রমণীকে করাত দিয়ে দু-টুকরো করা (এবং পরে আবার আস্তো করা)। খেলাটির অবশ্য বিভিন্ন রকম এবং পদ্ধতি আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিরই মূল কথা হচ্ছে একটি জলজ্যান্ত রমণীকে দর্শকদের চোখের সামনে কেটে আবার আস্তো করা।

ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়াব উদঁ্যার (১৮০৫-১৮৭১) "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে এভাবে মানুষ কেটে আবার আস্তো করা খেলার কথা প্রথম পাওয়া যায়। উদঁ্যা লিখেছেন তাঁর গুরুস্থানীয় ফরাসী যাদুকর টরিনি কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ শহরে তুর্কি সুলতানের প্রাসাদে এ খেলা দেখিয়েছিলেন উনিশ শতকের প্রথম দিকে। উদঁ্যার বর্ণনা থেকে যা জানা যায় তা সংক্ষেপে এই রকম :

খেলা দেখাবার সময় টরিনি সুলতানের কাছ থেকে একটি দামী মুক্তার হার চেয়ে নিয়ে সেটি তাঁর (টরিনির) দলের একটি মেয়ের হাতে দিলেন ; দিয়ে বিভিন্ন যাদুর খেলা দেখাতে লাগলেন। খেলার শেষে মেয়েটির কাছে মুক্তার হারটি চাইতেই দেখা গেলো সেটি তার কাছে নেই। সুলতান পরিবারের মুক্তা-হার হারিয়েছে মেয়েটা! ভীষণ চটে উঠে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন যাদুকর টরিনি। আনালেন একটা কাঠের বাক্সো। তার ভেতরে জোর করে মেয়েটিকে পুরে দিয়ে বাক্সো বন্ধ করে দিলেন। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির সে কি ছটফটানি আর চীৎকার! কিন্তু ক্রুদ্ধ যাদুকরের মন গললো না তাতে। তিনি লম্বা একটা করাত নিয়ে তাই দিয়ে বাক্সোটিকে ঠিক মাঝামাঝি কেটে দুভাগ করতে লাগলেন। যাদুকর নির্মম হাতে করাত চালাচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সোর ভেতর থেকে চীৎকার করছে অসহায়া মেয়েটি। জ্যান্ত মানুষকে অমন ভাবে করাত দিয়ে চেরা হতে থাকলে সে বেচারা চেঁচাবে বইকি!

সুলতানের হারেমের অসূর্যম্পশ্যা মহিলারা যাদুকর টরিনির খেলা দেখছিলেন চিকের আড়ালে অদৃশ্য থেকে, অভিভূত হচ্ছিলেন বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে। তাঁরা

এই অমানুষিক বীভৎস ব্যাপার দেখে আতঙ্কে আর সহানুভূতিতে চীৎকার করে উঠলেন। যাদুকর বললেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলে করাত চালানোর কাজ শেষ করলেন, তারপর সেই কাটা বাক্সোর আধখানা একধারে আর আধখানা অন্যধারে উপুড় করে রেখে দিলেন, যেন এধারে আধা বাক্সোর তলায় ঢাকা রইলো সেই মেয়েটির আধখানা, আর ওধারে আধা বাক্সোর তলায় ঢাকা রইলো মেয়েটির বাকি আধখানা। তারপর সেই দুটি ঢাকা তুলে বেরিয়ে এলো—দুটি আধা মেয়ে নয়, একরকম চেহারার দুটি আস্ত মেয়ে! তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়ে সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিলো তাঁর মুক্তার মালা।

উদঁ্যার "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে লিখিত এই কাহিনীটিই সম্ভবত উদ্বুদ্ধ করেছিলো একটি তরুণীকে করাত দিয়ে কেটে দু টুকরো করে আলাদা করে ফেলে আবার তাকেই আস্ত বানানোর খেলার (Sawing a woman in half) সর্বপ্রথম উদ্ভাবক-প্রদর্শক ইংরাজ যাদুকর 'সেলবিট'-কে (Selbit)। 'সেলবিট'-এর আসল নাম ছিল পার্সি টিব্‌লস্‌ (Percy Tibbles); নিজের পদবিটি উল্টে বানান করে তিনি পেশাদারি নামটি পেয়েছিলেন।

সেল্‌বিট তাঁর উদ্ভাবিত এই খেলাটি সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন লণ্ডনের রঙ্গালয়ে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। খেলাটি যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো সাধারণ দর্শকমহলে তা তো বটেই, এমন কি যাদুকর মহলেও, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এ খেলাটি এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুর খেলা।

সেল্‌বিটের খেলাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করি। মেয়েটিকে সটান শোয়ানো হলো তারই সমান লম্বা একটি কাঠের বাক্সের ভেতর। বাক্সোটি অতি সাধারণ, তার ভেতর কোনোরকম চাতুরি নেই। মেয়েটি লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো দুটি হাত গুটিয়ে দু হাতের কব্জি দুটি কাঁধের কাছাকাছি রেখে। বাক্সোটির লম্বার দুধারে দুটি দুটি করে মোট চারটি ছ্যাঁদা রয়েছে দড়ি গলাবার মতো—দুটি ছ্যাঁদা মেয়েটির দুটি পায়ের গোড়ালির কাছাকাছি, বাকি দুটি তার কাঁধের কাছাকাছি। পাঁচ নম্বর ছ্যাঁদাটি বাক্সোটির পিছন দিকে, মেয়েটির গলার কাছাকাছি।

বাক্সোটিকে রাখা হয়েছে দুপাশে রাখা দুটি টুলের ওপর, যাতে বাক্সের তলা দিয়েও পরিষ্কার দেখা যায়। একটুকরো দড়ির এক মাথা মেয়েটির গলায়

জড়িয়ে শক্ত গেরো বেঁধে দড়ির অন্ত মাথাটা পিছনের ছ্যাঁদা দিয়ে বার করে দেওয়া হলো। আরো চার টুকরো দড়ি দিয়ে মেয়েটির দুপায়ের আর দুহাতের কব্জি কষে বেঁধে দড়ির খোলা মাথা চারটি যথাক্রমে চারটি ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে গলিয়ে বাইরে বার করে দেওয়া হলো। দর্শকদের ভেতর থেকে পাঁচজন মঞ্চের ওপর উঠে এসেছেন। এঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দর্শক, যাদুকরের সঙ্গে এঁদের কোনোরকম যোগাযোগ নেই। এঁরা বাইরে থেকে পাঁচটি দড়ির পাঁচ মাথা এমনভাবে টেনে ধরে রইলেন, যে এঁরা এভাবে দড়ি ধবে বসে থাকলে বাক্সোর ভেতর মেয়েটির হাত, পা বা মাথা নাড়বার উপায় নেই—অসহায ভাবে চিৎ হয়ে তাকে শুয়ে থাকতে হবে। বাক্সোটির ডালা বন্ধ করে দেবাব আগে মঞ্চে আমন্ত্রিত পাঁচজন ভদ্রলোকই ভালো করে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন মেযেটি সত্যিই হাত পা আর মাথা দড়ি দিয়ে আটকানো অবস্থায় অসহায়া বন্দিনী, এঁরা পাঁচজন দড়ি টেনে রাখলে তার নড়াচড়া করার উপায় নেই। এই অবস্থায় বাক্সোটির ডালা বন্ধ করে দেওযা হলো, এবং সেই পাঁচজন নিরপেক্ষ দর্শক বাইরে থেকে দড়ি টেনে ধরে রইলেন, এক মুহূর্তেব জন্যেও দড়ির টান এতটুকু আলৃগা হতে দিলেন না।

সেই অবস্থাতেই যাদুকর বাক্সের ঠিক মাঝখানে হাত-করাত চালিয়ে বাক্সোটিকে কেটে দুভাগ করে কাটা দুটি দিক চৌকো চাক্তি দিয়ে ঢেকে বাক্সোর দুটি ভাগ দুদিকে সরিয়ে দিযে মাঝখান দিয়ে হেঁটে দেখালেন দুটি ভাগ সত্যিই বিচ্ছিন্ন। তারপর আবাব বাক্সেব দুটি ভাগ মুখোমুখি যুক্ত করে চৌকো চাক্তি দুটি তুলে নেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সোর ডালা খুলে দেখা গেলো মেয়েটি তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাক্সোর ভেতব; তাব হাত, পা আর গলা তেমনি দড়ির বাঁধনে বাঁধা, পাঁচজন ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্যেও দড়ির টান আল্‌গা করেননি এতটুকু। বন্দিনী মেয়েটির হাত, পা আর গলা থেকে দড়ির বাঁধন কেটে দেওয়া হলো, মেয়েটি সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে নেমে এলো বাক্সোর ভেতর থেকে।

অসাধারণ বিস্ময়কর খেলা। একাধিক যাদুরসিকের মতে এই জাতীয় খেলার ভেতর সেল্‌বিট-এর এই খেলাটিই বিস্ময় সৃষ্টির দিক দিয়ে এবং প্রদর্শকের কৃতিত্বের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় এ খেলার বর্ণনা শুনলেন অসাধারণ যাদুকর হোরেস্ গোলডিন। সেল্‌বিট-এর এই খেলাটিকে একটা যেন চ্যালেঞ্জের

মতো মনে হলো তাঁর। মাথা খাটিয়ে তিনিও এ খেলা দেখাবার নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, সেলবিট-এর পদ্ধতি থেকে আলাদা ধরনের। সেল্‌বিট-এর কয়েক মাস পরেই, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, গোল্‌ডিনের করাতের সাহায্যে তরুণী-কর্তন খেলাটি বিভিন্ন শহরে দেখানো হতে লাগলো। সেল্‌বিট-এর চাইতে অনেক বেশি উদ্যোগী, দ্রুতকর্মী এবং করিৎকর্মা ছিলেন গোলডিন। তাই সেল্‌বিটের চাইতে অনেক বেশি সাড়া জাগিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এবং অনেক বেশি এলাকায় খ্যাতি (এবং অর্থ) অর্জন করলেন তিনি।

সেল্‌বিটের খেলা থেকে বিভিন্নতা বোঝাবার জন্যে গোল্‌ডিনের খেলাটির খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি। একটি টেবিলের ওপর একটি বাক্সো রয়েছে। বাক্সোটি খুলে নিঃসন্দেহে খালি দেখিয়ে দেওয়া হলো। মেয়েটি (যাকে করাত দিয়ে কাটা হবে) সেই খালি বাক্সের ভেতর ঢুকে শুয়ে পড়লো, কিন্তু বাক্সোটি লম্বায় মেয়েটির চাইতে কম বলে তার দুটি পা একদিকে আর মাথা অন্য দিকে বেরিয়ে রইলো। (পা এবং মাথা বাইরে গলিয়ে দেবার জন্য বাক্সের দুধারে গোলাকার ফাঁকের ব্যবস্থা আছে।) এ অবস্থায় টেবিলসুদ্ধ বাক্সোটিকে চারধারে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো কোথাও কোনো চালাকি নেই। দর্শকদের ভেতর থেকে দুজন (বা ততোধিক) প্রতিনিধি এসে পা এবং মাথার দিকে রইলেন; তাঁরা পা এবং মাথা ধরে থাকতেও পারেন। দর্শকরাও সবাই একই সময়ে মেয়েটির পা এবং মাথা বাক্সোর দুধার দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এ অবস্থায় বাক্সোটিকে করাত দিয়ে কেটে দুভাগ করে টেবিলের দুপাশে সরিয়ে দেওয়া হলো, দর্শকেরা সভয়ে দেখলেন বাক্সের দুটি বিচ্ছিন্ন অর্ধাংশের মাঝখানে একহাত ফাঁক। অবশ্য দুটি ভাগ দুপাশে সরিয়ে নেবার আগে বাক্সোর কাটা মুখ দুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছিলো।

তারপর বাক্সোটির কাটা মুখ দুটো আবার মুখোমুখি লাগিয়ে দিয়ে পরে মেয়েটিকে আস্তো এবং অক্ষত দেহেই বাক্সের বাইরে আনা হলো। বাক্সোর দুধারে বেরিয়ে থাকা পা দুটি এবং মাথা সব সময়ে দর্শকদের নজরে ছিলো, বাক্সোটির দ্বিখণ্ডিত অবস্থাতেও। তাহলে কাটা মেয়েটি আবার আস্তো হলো কি করে?

বিস্ময়কর খেলা, সন্দেহ নেই। পরে বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটন (Howard Thurston) এবং ডেনমার্ক-দেশীয় যাদুকর 'দান্তে'-র

(Harry A. Jansen) যাছু প্রদর্শনীতেও এ খেলাটি ছিলো অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এঁরা অবশ্য নিজেরাও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না হোরেস গোল্ডিন। দশ বছর পরে, ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন প্যালাডিয়ামে (Palladium) তিনি সর্বপ্রথম দেখালেন খোলা টেবিলের ওপর শায়িতা তরুণীকে কোনোরকম আবরণ বা আড়াল ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ-চালিত চক্র-করাত (electric circular saw) দিয়ে দুটুকরো করে কেটে আবার আস্ত বানাবার রোমাঞ্চকর খেলা। এ খেলাটিতে বৈদ্যুতিক সুইচ টিপবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বেগে ঘূর্ণায়মান চক্র-করাতটি যখন ভীষণ শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে টেবিলের ওপর ছদ্ম মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহ-মধ্যভাগ লক্ষ্য করে মৃত্যু-দূতের মতো নেমে আসতো, তখন দর্শক মহলে আতঙ্কের শিহরণ জাগা স্বাভাবিক।

এই খেলাটিই পরে বিখ্যাত যাদুকর "ফু মাঞ্চু" (Fu Manchu) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু নতুন এবং শিহরণময় রূপে দেখাতে শুরু করলেন বৈদ্যুতিক চক্র-করাতের বদলে স্টেজের ওপর থেকে দোলানো একটি বিরাট পেণ্ডিউলাম্ (Pendulum) ব্যবহার করে। দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডিউলামের মতো এটিও দুলতো স্টেজের এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে, আর ধীরে ধীরে নেমে আসতো। পেণ্ডিউলামের তলায় ঝুলানো একটি ইস্পাতের তৈরি ভারি ধারালো চাক্তি (circular steel blade)। স্টেজে টেবিলের ওপর শায়িতা একটি তরুণী, টেবিলের সঙ্গে বাঁধা ; তাকেই তার দেহের মাঝামাঝি জায়গায় দুভাগ করে কেটে ফেলতো (?) পেণ্ডিউলামের সেই ধারালো চাক্তিটা। বলা বাহুল্য দ্বিখণ্ডিতা তরুণীটি পুনরায় আস্তো তরুণীতে পরিণত হতেন। এ খেলার পরিকল্পনাটি 'ফু মাঞ্চু' সম্ভবত পেয়েছিলেন মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো-র (Edgar Allan Poe) বিখ্যাত লোমহর্ষক "দ্য পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডিউলাম" (The Pit and the Pendulum) থেকে। এবং খেলাটি বিচ্ছিন্নভাবে একটি যাদুর খেলা হিসেবে না দেখিয়ে তিনি দেখাতেন একটি নাটকীয় নক্শা অভিনয়ে কাহিনীর অঙ্গ হিসেবে।

এখানে বলা অবান্তর হবে না, 'ফু মাঞ্চু'-র আসল নাম ডেভিড ব্যাম্বার্গ (David Bamberg)। ইনি বিখ্যাত ওলন্দাজ যাদুকর 'ওকিতো'

(Okito) অর্থাৎ থিও (Theo) ব্যামবার্গের পুত্র। ওকিতো-র পিতাও ছিলেন হল্যাণ্ডের রাজসভার যাদুকর।

উপরিবর্ণিত বৈদ্যুতিক চক্র-করাতের খেলাটি ভারতীয় যাদুকরদের ভেতর সর্বপ্রথম দেখান পি. সি. সরকার। জনৈক বিশিষ্ট ইংরেজ যাদু-সাহিত্যিক লিখেছেন, "Sorcar, the Indian illusionist, performed it with such zest when he brought his show in London that the audience thought he had sawn the girl in half."

অর্থাৎ "ভারতীয় যাদুকর সরকার যখন তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন, তখন এই খেলাটি এমন তীব্র উৎসাহের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে, দর্শকেরা ভেবেছিলেন তিনি মেয়েটিকে সত্যিই দুটুকরো করে কেটে ফেলেছেন।" এ খেলাটি তারপর দেখান "দেবকুমার", ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত, জি কুমার, এ. সি. সরকার (A. C. Sorcer) প্রমুখ একাধিক যাদুকর। সাম্প্রতিককালে এ খেলাটি যাঁরা দেখাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন যাদুকর কে. লাল (কান্তিলাল গিরধরলাল ভোরা)।

এ খেলায় যাদুকর ডি. সি. দত্ত খোলা টেবিলের ওপর বৈদ্যুতিক করাতের বদলে হাত-করাত ব্যবহার করেন।

'সেলবিট' (Selbit)-প্রবর্তিত খেলাটি (সর্বপ্রথম যেটি বর্ণনা করেছি) সুন্দরভাবে দেখান যাদুকর মৃণাল রায়।

এই সঙ্গে বাংলার যাদু-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি অসাধারণ কৃতিত্বের কথা বলা অবান্তর হবে না, যাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার আগে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন যাদুকর "ভার্জিল"-এর (Virgil) বিরাট যাদু-প্রদর্শনীর অন্তর্গত একটি খেলার কথা বলা দরকার। ভার্জিলের খেলার ফর্দে এ খেলাটির নাম "মনের রহস্য" (Mysteries of the Mind)। এটি তিনি কলকাতার নিউ এম্পায়ার হলে তাঁর যাদুপ্রদর্শনীতে দেখিয়ে গেছেন ১৯৫৪ সালে। তারপর ১৯৫৬ সালে ইংলণ্ড সফর কালে ১৫ই মে তারিখে ব্রাডফোর্ড (Bradford) শহরের আলহামরা থিয়েটারে (The Alhambra Theatre) ভার্জিলের যে যাদু-প্রদর্শনী হয়েছিলো, একজন বিশিষ্ট যাদু-সমালোচক তার বিবরণীতে এ খেলাটির নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

ভার্জিল প্রথমেই মঞ্চে তার যাদুসঙ্গিনী জুলি-কে (Julie) উপস্থিত করে

বলে নেন এটি কোনো চালাকির খেলা নয় (not a trick), স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি মাত্র। স্টেজের ওপর একটি কালো বোর্ডের বুকে দর্শকমহল থেকে আমন্ত্রিত যে কেউ এসে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যা পর পর লিখে ফেলেন। তাবপব বিভিন্ন জিনিসের নাম করা হতে থাকে (বিভিন্ন দর্শকদের দ্বারা, তাঁদেব খুশিমতো এলোমেলো ভাবে), আর সেই জিনিসগুলোর নাম এক একটি সংখ্যাব পাশে (এলোমেলোভাবে, যাঁরা জিনিসের নাম বলছেন তাঁদের খেয়ালখুশি মতো) লেখা হতে থাকে। ভার্জিলেব যাদু-সঙ্গিনী জুলি তখন চোখ বাঁধা অবস্থায় স্টেজের একধাবে বোর্ডের দিকে পেছন ফিবে দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবে কুড়িটি বিভিন্ন জিনিসের নাম কুড়িটি সংখ্যার পাশে লেখা হয়ে যায়। তখন বোর্ডে লেখা যে কোনো জিনিসেব নাম বললেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যাব পাশে লেখা সংখ্যাটি বলে দেন। সর্বশেষে জুলি দ্রুতবেগে সবগুলি জিনিসেব নাম পর পর বলে যান এবং দর্শকবৃন্দের (এই আশ্চর্য খেলা দেখে) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেন।

কুড়িটি জিনিসের নাম ওভাবে মনে রাখা এবং চটপট বলা বাহাদুরি বটে। কিন্তু কুড়ির বদলে সংখ্যাটি যদি হয় ষাট, এবং শুধু জিনিসের নাম না বলে দর্শকরা যদি পৃথিবীব যে কোনো ভাষার যে কোনো শব্দ, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি বলার স্বাধীনতা পান, তাহলে খেলাটি আরো অনেক বেশি কঠিন হয়ে প্রায় অসাধ্য সাধনের পর্যায়েই পড়ে না কি? এই 'অসাধ্য সাধন'-ই করে দেখিয়েছেন যাদুকর মৃণাল রায়, এবং তাঁরই শিক্ষায় তৈরি তাঁর দুই কিশোরী ছাত্রী দীপ্তি দত্ত এবং মৈত্রেষী ঘোষ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্মৃতিশক্তির এই বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে এঁরা বহুজনকে বিস্মিত এবং মুগ্ধ করেছেন। সম্প্রতি স্কুলের ছাত্রী কুমারী দীপ্তি দাঁ মৃণাল রায়ের শিক্ষাধীনে পঁচিশ সংখ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় যাদুকর মৃণাল রায় বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন যাদুকর ভার্জিল-কে অনেকদূব ছাড়িয়ে গেছেন।

ফরাসী যাদুসম্রাট উর্দ্যা প্রসঙ্গে প্রথমেই (পৃষ্ঠা ১৫৯) যে খেলাটির বর্ণনা করেছি—একটি খাড়া ডাণ্ডার মাথায় শুধু এক হাতের কনুই ঠেকিয়ে কাউকে হাওয়ায় (অথবা শূন্যে) ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে লম্বালম্বি শুইয়ে রাখা—সে

খেলাটি যাদুজগতে 'ইথারিয়্যাল বা এরিয়্যাল সাসপেনশন' (Ethereal or Aerial Suspension) নামে পরিচিত।

খেলাটি উদঁ্যা লণ্ডনে দেখিয়েছিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। লণ্ডনেই তাঁর কাছাকাছি সময়ে এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন আরো দুজন বিচক্ষণ যাদুকর: জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন বা 'উইজার্ড অভ দ্য নর্থ' (উত্তর দেশের যাদুকর) এবং কম্পার্স হারম্যান (Compars Herrmann)। যাদুকর হ্যারি হুডিনি লিখেছেন, ঠিক সেই সময়েই এই খেলাটি মার্কিন মুলুকে দেখাচ্ছিলেন আলেক্জাণ্ডার' নামে একজন বিশিষ্ট যাদুকর। তিনি জাতিতে জার্মান, পুরো নাম আলেক্জাণ্ডার হাইমবুর্গার (Alexander Heimburgher)। তাঁর বিভিন্ন কাগজপত্রাদির মধ্যে এক জায়গায় তাঁর প্রদর্শিত শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখার (Suspension) খেলাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

"আমি : খেলাটি দেখাতে শুরু করেছিলাম ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে, ভারতে প্রকাশিত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত একটি বার্ষিকীতে একজন ফকিরের (যাদুকরের) যাদু-খেলার বর্ণনা পড়বার পর। এই ফকিরটি একটি বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে তাঁর এক সঙ্গীকে হাওয়ার (শূন্যের) ওপর বসিয়ে রাখতেন।..."

উনিশ শতকের শেষের দিকের একজন ইংরেজ লেখক উদঁ্যার খেলাটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার সারমর্ম এই: উদঁ্যা ভান করতেন 'ঘনীভূত ইথার'-এর সাহায্যেই তিনি ছেলেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছেন। এ খেলাটা এ ই অন্যভাবে বহু বছর আগে থেকেই দেখিয়ে আসছিলেন ভারতের যাদুকরেরা, (এবং তাঁদের কৌশলটিই উদঁ্যা কাজে লাগিয়েছিলেন), কিন্তু সে সময়ে 'মেসমেরিজম্'-এর হিড়িক বা হুজুগ এমন চালু ছিলো, যে কোনো রকম যান্ত্রিক গুপ্ত কৌশল ছাড়াই একটা খাড়া ডাণ্ডার ডগায় কনুই ঠেকিয়ে উদঁ্যার ছেলেটি শূন্যে ভাসছে, একথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলো, খেলাটির ভিত্তিতে যে যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে সে সন্দেহ কারও মনে জাগেনি, জাগবার সুযোগ পায়নি।

এই খেলার আলোচনায় যাদুকর হ্যারি হুডিনি একজন ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন, উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগে প্রকাশিত একজন ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ থেকে। ১৮৩২ সালে এই ব্রাহ্মণটি মাদ্রাজে দেখিয়েছিলেন শূন্যে বসে থাকার (Suspension) খেলা। তাঁর সরঞ্জামের ভেতর ছিলো চার-পায়াওয়ালা একটি

তক্তা, তার এক ধারে একটি গর্ত (socket)। এই গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে একটি বাঁশের লাঠি খাড়া করে রাখতেন তিনি। এই বাঁশের লাঠির সঙ্গে আটকে দিতেন আরেকটি ছোট ডাণ্ডা, বাঁশের লাঠির সমকোণে অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সামনে একটি পুরু কাপড়ের আড়াল দেওয়া হতো। আড়াল সরিয়ে নিতেই দেখা যেতো ব্রাহ্মণ হাওয়ার ওপর বসে মাটি থেকে গজ দেড়েক উঁচুতে, ডান হাতে কব্জির কাছাকাছি আলগাভাবে ভর করে আছেন ছোট্টো ডাণ্ডাটির ওপর, আর সেই হাতেই জপের মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাম জপ করছেন, বাঁ হাতটা ওপর দিকে তুলে রেখে। তারপর আবার একটু আড়াল দিয়ে সে আড়াল সরিয়ে নিতেই দেখা যেতো যাদুকর ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন মাটির ওপর।

উক্ত ইংরেজ লেখক টমাস্ ফ্রস্ট (Thomas Frost) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন :

"While the conjuring art seemed to be declining in Europe, Indian conjurers were exhibiting in their own land the marvels which have since attracted wondering crowds to the temples of magic which their imitators have set up in the capitals of the West. The aerial suspension was performed half a century ago at Madras by an old Brahmin, with no better apparatus than a piece of plank which, with four legs, he formed into an oblong stool ; and upon which, in a little brass socket, he placed, in a perpeudicular position, a hollow bamboo, from which projected a kind of crutch, covered with a piece of common hide···"

ভাবার্থ : "ইউরোপে যখন যাদু ঝিমিয়ে পড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো, তখন ভারতীয় যাদুকরেরা তাঁদের নিজের দেশে নানা রকম বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখাচ্ছিলেন। ভারতীয় যাদুকরদের সেই সব খেলার নকল করেই তারপর পাশ্চাত্য দেশের রাজধানীগুলোতে পাশ্চাত্য যাদুকরেরা তাঁদের যাদু-মন্দিরে ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্মিত দর্শকদের আকর্ষণ করেছিলেন। মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলা আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে মাদ্রাজে দেখিয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।..." ইত্যাদি।

উদঁ্যা-প্রদর্শিত ধরনে 'শূন্যে শয়ন' (aerial suspension) খেলাটি ভারতে সর্বপ্রথম কে দেখিয়েছিলেন জানি না। আমি সর্বপ্রথম দেখেছিলাম ১৯২৬ সালে, ঢাকা রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটে, যাদুকর "রয় দ্য মিস্টিক"-এর যাদু প্রদর্শনীতে। তিনি যাঁর যাদু প্রদর্শনীতে এই খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাদুকর বৃত্তি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তিনি সেকালের বিশিষ্ট যাদুকর এমিন সুরাবর্দি।

খেলাটি এর পরে আমাদের দেশের যাদুকরদের মধ্যে যাঁরা দেখিয়েছেন অথবা দেখিয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে আছেন পি. সি. সরকার, যতীন সাহা, জি. কুমার, এ. সি. সরকার, 'গোগিয়া পাশা' (ধনরাজ গোগিয়া) প্রভৃতি।

* * *

রবেয়ার উদঁ্যা তাঁর শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখার খেলা (ethereal বা aerial suspension) দেখিয়ে যাবার পর লণ্ডনে সিলভেস্টার (Sylvester) নামে এক ভদ্রলোক "উলু-র ফকির" (Fakir of Oolu) নামে যাদু-প্রদর্শন করতেন। উদঁ্যার খেলাটিকে তিনি মাথা খাটিয়ে আরো চমকপ্রদ বানালেন। উদঁ্যার কায়দাতেই তিনি তাঁর যাদু-সহকারিণী সুন্দরীকে একটি-মাত্র লাঠির ডগায় কনুই ভর করিয়ে শূন্যে শুইয়ে রাখতেন, তারপর তাঁর কনুইয়ের তলা থেকে সেই একমাত্র লাঠিটিও সরিয়ে নিয়ে যেতেন, সুন্দরীকে সম্পূর্ণ শূন্যে ভাসিয়ে রেখে!

এই শূন্যে ভাসিয়ে রাখা (Suspension) খেলাটির আরেক ধাপ ওপরে উঠলেন ১৮৬৭ সালে যাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)। লণ্ডনের এক বিশিষ্ট রঙ্গালয়ে যাদুপ্রদর্শনীতে তাঁর যাদু-সহকারিণী হলেন তাঁর স্ত্রী। শ্রীমতী ম্যাসকেলিনকে সম্মোহিতা করে একটি বেদীর ওপর শোয়ানো হলো। যাদুকরের আদেশে শ্রীমতী ম্যাসকেলিনের সুপ্তদেহ ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে গেলো, তারপর আবার ধীরে ধীরে যথাস্থানে নেমে এলো। এ খেলার নাম 'লেভিটেশন' (levitation) অর্থাৎ 'শূন্যে উত্থান'। 'আগা' (Aga) নামেও এ খেলাটি পরিচিত। এই খেলাটিই (সম্ভবতঃ আবিষ্কারক ম্যাসকেলিনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেই) আমেরিকায় দেখাতে লাগলেন বিখ্যাত যাদুকর হ্যারি কেলার (Harry Kellar); তিনি এই খেলাটির নাম দিয়েছিলেন "Levitation of Princess Karnac" বা "রাজকুমারী কার্ণাকের শূন্যে উত্থান"। কেলার ছিলেন রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। এ খেলাটি তাঁর পরিবেশনে প্রাচীন

মিশরী রহস্যের আবহাওয়া এনে অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করতো। কেলারের পর তাঁর এই খেলাটি দেখাতে থাকেন তাঁর উত্তর সাধক স্বনামধন্য যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন। এ খেলাটি ১৯০৬ সালে এসে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দেখিয়ে সাড়া জাগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শূন্যে ভেসেছিলেন সুন্দরী শ্রীমতী থার্সটন। ম্যাসকেলিন-আবিষ্কৃত এই শূন্যে উত্থানের খেলাটিতে আরেকটি হঠাৎ বিস্ময় যোগ করেছিলেন বিখ্যাত বেলজিয়ান যাদুকর সার্ভে লে-রয় (Servais Lё Roy), ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সেরা যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট-এর (David Devant) প্রথম শিক্ষা-গুরু। এ খেলায় মেয়েটিকে সম্মোহিতা করে শুইয়ে দিয়ে একটি রেশমী চাদর দিয়ে ঢেকে দেওযা হয়। চাদর ঢাকা মেয়েটি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে থাকে। তারপর যাদুকরের আদেশ মাত্রেই চাদরটির তলা থেকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এবং শূন্য চাদরটি পড়ে যায়, অথবা সহসা চাদরটির এক কোণ ধরে টানতেই দেখা যায় যাদুকরের হাতে শুধু চাদরটি আছে, মেয়েটি রহস্যজনকভাবে হাওযায় মিলিয়ে গেছে। এ খেলাটিই "'আস্‌রা' (Asrah) নামে বিখ্যাত।

* * *

ইংরেজ লেখক টমাস ফ্রস্ট Thomas Frost বিখ্যাত "ভারতীয় ঝুঁড়ির খেলা"-র (The Indian Basket Trick) একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন পাদ্রী হোবার্ট কণ্টার-এর (Reverend Hobart Caunter) লেখা থেকে। পাদ্রী কণ্টার ঐ ১৮৩২ সালেরই কাছাকাছি কোনো সময়ে ভারত ভ্রমণ করছিলেন কয়েকজন বন্ধু সহ। মাদ্রাজ শহর থেকে বারো মাইল দূরে খোলা মাঠে খেলাটি দেখে খেলাটিকে যাদুর ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলে মনে হয়েছিলো তাঁর। তিনি বলেছেন:

"একজন মোটাসোটা ভীষণ চেহারার মানুষ এগিয়ে এলো একটা অতি সাধারণ বেতের ঝুড়ি নিয়ে। তারই অনুরোধে আমরা ঝুড়িটাকে খুব ভালো-ভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। লোকটি একটি বছর আটেক বয়সের মেয়েকে ঐ ঝুড়িটা দিয়ে ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ ঐ ঝুড়ি-ঢাকা মেয়েটির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা-বার্তা বললো। আমাদের মাত্র কয়েক ফুট দূরে ঝুড়ির তলা থেকে মেয়েটির কণ্ঠস্বর এমন পরিষ্কার শোনা গেলো যে মেয়েটি যে ঐ ঝুড়ির তলাতেই রয়েছে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই রইলো না।

"অল্প কিছুক্ষণ ধরে তাদের কথাবার্তা চললো। তারপর সেই যাদুকর হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলতে লাগলো মেয়েটিকে সে হত্যা করবে। মেয়েটি কাতর স্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলো। যাদুকর এক পা দিয়ে বেতের ঝুড়িটাকে চেপে রেখে হাতে একটা তলোয়ারের ডগা দিয়ে বারবার ঝুড়ির ভেতর খোঁচা মারতে লাগলো। এসময়ে তার চোখে মুখে ভীষণ অমানুষিক ভাব ফুটে উঠলো। ঝুড়ির তলায় বন্দিনী মেয়েটার চীৎকার এতো বাস্তব, যে কিছুক্ষণের জন্যে আমার শরীরের সব রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেলো। ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে শয়তান লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই—কিন্তু লোকটার হাতে তলোয়ার, আর আমি নিরস্ত্র। আমি আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁরা ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।...

"ঝুড়ির তলা থেকে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগলো। ঝুড়ির তলায় মেয়েটির ছটফটানি আর যন্ত্রণার আর্তনাদ আঘাত করতে লাগলো আমাদের মর্মে এসে। ধীরে ধীরে থেমে গেলো ছটফটানি আর আর্তনাদ, মনে হলো যেন মেয়েটির নিষ্পাপ আত্মা তার রক্তাক্ত দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপরই আমাদের অবর্ণনীয় বিস্ময় আর স্বস্তির পালা। যাদুকর ঝুড়িটা তুলে নিতেই দেখা গেলো মেয়েটি অদৃশ্য! জায়গাটা অবশ্য রক্তে লাল, কিন্তু দেহের এতোটুকু অংশ পর্যন্ত নেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম সেই মেয়েটিই ভিড়ের ভেতর থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বকশিশ চাইছে। খুশী হয়েই আমরা তা দিলাম। ওরাও আশাতীত মোটা বকশিশ পেয়ে খুশী হয়ে চলে গেলো। এ খেলায় সব চেয়ে বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো এই যে যাদুকর লোকটি সব সময়ে দর্শকমণ্ডলী থেকে তফাতে ছিলো, তার কয়েক ফুটের মধ্যেও কেউ ছিলো না।"

পাদ্রী কণ্টার যেমনটি দেখেছিলেন হুবহু তেমনটিই বর্ণনা করতে পেরেছেন, না স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে বাস্তব থেকে তাঁর কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটেছে জানি না, কিন্তু ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ যাদুকরদের প্রদর্শিত এই বিখ্যাত খেলাটির প্রচলিত সাধারণ রূপ এ থেকে একটু আলাদা। বরং রবেয়ার উদ্যাঁ-র ভ্রম দেখাতে গিয়ে যাদুকর হ্যারি হুডিনি খেলাটির যেরূপ বর্ণনা দিয়েছে সেটি সত্যের কাছাকাছি। সেটি খুব সংক্ষেপে এই:

ঝুড়িটি মাটির ওপর চিৎ করে পাতা আছে। ঝুড়িটির মুখের বেড় তলার

ঘেড়ের চাইতে কিছু ছোটো। একটি ছেলেকে ঝুড়ির ভেতর জোর করে চেপে বসিয়ে দেওয়া হলো। দর্শকরা দেখেছেন ঝুড়িটা পুরো ছেলেটির পক্ষে একটু ছোট ; ছেলেটি উপুড় হয়ে ঝুড়ির ভেতর ঢুকতে পারছে না, তার পিঠটা উঁচু হয়ে রয়েছে। ঝুড়ির ঢাকাটা ছেলেটির পিঠের ওপর চাপা দিয়ে সবার ওপর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো।

এইবার যাদুকর সেই চাদর-ঢাকা ঝুড়ির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে নানারকম চীৎকার করে সেই ঝুড়িটির গায়ে নানাভাবে আঘাত করতে লাগলো। ধীরে ধীরে ঝুড়ির ঢাকাটা নেমে গেলো ; শেষ পর্যন্ত মনে হলো ঝুড়িটা খালি হয়ে গেছে। যাদুকর তখন চাদরটা ঠিক রেখে তার তলা থেকে ঝুড়ির ঢাকাটা সরিয়ে ফেলে চাদরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়লো ঝুড়ির ভেতর, আর তার ভেতর ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দেখিয়ে দিলো ঝুড়ি খালি হয়ে গেছে। তারপর ঝুড়ির ভেতরটা জুড়ে বসে পড়লো যাদুকর, কোনো রকমে ঝুড়িটির ভেতর আঁটসাঁট হয়ে। আশ্চর্য, কোন ফাঁকে কোথায় কেমন করে পালিয়ে গেলো ছেলেটা ?

যাদুকর এইবার শূন্য ঝুড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুড়ির মুখের ওপর আবার ঢাকাটা চাপিয়ে দিয়ে সরিয়ে নিল চাদরটা। তারপর সেই মুখ-বন্ধ ঝুড়িটার ভেতর এলোমেলো ভাবে তলোয়ারের খোঁচা এমনভাবে চালাতে লাগলো যে ভেতরে কেউ থাকলে তার আর নিস্তার নেই।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে সেই মুখবন্ধ ঝুড়িটিকে ঘিরে আবার যাদুকরের লম্ফ-ঝম্ফ, চীৎকার, বাজনা, শীস ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেলো ঝুড়িটা দুলতে আরম্ভ করেছে, তারপর ঢাকাটা ওপর দিকে ঠেলে উঠছে সেই ছেলেটি। আশ্চর্য ! উধাও হয়ে চলে গিয়েছিলো, আবার ফিরে এলো কি করে ?

কখনো কখনো খেলার শেষটা অন্যরকম হয়। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছেলেটি আবার ঝুড়ির ভেতর থেকেই বেরিয়ে না এসে দূর থেকে ছুটে আসে।

এ খেলাটি সম্বন্ধে হ্যারি হুডিনি বলেছেন, "The trick is a marvellous deception, but only a Hindoo can do it with success." অর্থাৎ যাদুর খেলা হিসেবে এ খেলাটি অসাধারণ চাতুর্যপূর্ণ, কিন্তু এ খেলাটিকে সফলভাবে দেখানো একমাত্র হিন্দু যাদুকরের পক্ষেই সম্ভব। হিন্দু বলতে অবশ্য হুডিনি 'ভারতীয়' বোঝাচ্ছেন।

হুডিনির এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন কয়েক বছর আগে (১৯৫৪) বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর ভার্জিল এবং তাঁর যাদু-সঙ্গিনী জুলি (Virgil & Julie), কলকাতার খোলা ময়দানে ভারতীয় 'মাদারি'দের এই ঝুড়ির খেলা দেখে, তাদের প্রদর্শন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে।

এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উনিশ শতকের মাঝামাঝি অ্যালফ্রেড স্টোডেয়ার (Alfred Stodare) নামে একজন উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ফরাসী যাদুকর এই ভারতীয় খেলাটির অনুকরণ করেই 'ভারতীয় ঝুড়ির খেলা' (Indian Basket Trick) নামে একটি মঞ্চোপযোগী খেলা লণ্ডনের ইজিপ্‌শিয়ান হলে দেখিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

এ খেলাটির একটি রূপ মঞ্চে দেখিয়ে থাকেন যাদুকর 'গোগিয়া পাশা' (ধনরাজ গোগিয়া)।

* * * *

যাদুর যে খেলাটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত, সে খেলাটি বোধ হয় কেউ কখনো দেখেননি, দেখবেনও না। খেলাটি "ভারতীয় দড়ির খেলা" (The Indian Rope Trick) নামে খ্যাত। কিম্বদন্তীতে যেরূপ শোনা যায়, তাতে খেলাটির বর্ণনা মোটামুটি এই রকম :

কোনো একটি খোলা ময়দান। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, চারধারে গোল করে ঘিরে রয়েছে দর্শকমণ্ডলী। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাদুকর লম্বা একগাছা দড়ি ছুঁড়ে দিলেন আকাশের দিক। দড়িটি—কি আশ্চর্য !—পড়ে না গিয়ে লম্বা লাঠির মতো সোজা খাড়া হয়ে রইলো। সেই দড়ি বেয়ে যাদুকরের দলের একটি বাচ্চা ছেলে উঠে গেলো, আর দড়ির ডগায় পৌঁছেই বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলো। যাদুকরও একটি বড় ধারালো ছুরি মুখে নিয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে মুখ থেকে ছুরিটা ডান হাতে নিয়ে মাথার ওপর চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অদৃশ্য ছেলেটির কাটা হাত, পা, মাথা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃশ্য হয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো। যাদুকর তখন দড়ি বেয়ে মাটিতে নেমে এসে দড়িটা টেনে নীচে এনে গুটিয়ে ফেলে ছেলেটির ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তুলে তুলে একসঙ্গে একটি থলের ভেতর পুরে একটি বাক্সোর ভেতর রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই বাক্সোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ আস্তো ছেলেটি।

রাজা পঞ্চম জর্জ যখন ১৯০২ সালে যুবরাজরূপে ভারতে এসেছিলেন—যাদুবিদ্যায় তাঁর পিতার মতো তাঁরও উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য ছিলো—তখন সারা ভারতে অনুসন্ধান করা হয়েছিলো কোনো যাদুকর তাঁকে এই খেলাটি দেখাতে পারেন কিনা। কিন্তু মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও এ খেলা দেখাতে সক্ষম কোনো যাদুকর পাওয়া যায়নি। এই শতকের প্রথম দিকে লেফটেনাণ্ট ব্র্যান্‌সন (Lieutenant L. H. Branson) নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন নিজেও একজন যাদুকর এবং লণ্ডনের যাদুকর সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। ভারতীয় যাদু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে ঘুরে বহু ভারতীয় যাদুকরদের সঙ্গ করেছিলেন। তাঁরও চেষ্টা এবং মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা ব্যর্থ হয়েছিলো। কোনো যাদুকর তাঁকে এ খেলা দেখাতে পারেনি; এ খেলা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিংবা 'প্রত্যক্ষদর্শীর' মুখে এ খেলার বর্ণনা শুনেছেন, এমন কোনো ব্যক্তিরও তিনি সাক্ষাৎ পাননি। বিখ্যাত ইংরাজ যাদুকর এবং যাদু-রঙ্গালয় 'সেইণ্ট জর্জেস হল' (St. George's Hall)-পরিচালক জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন (১৮৩৯-১৯১৭) ঘোষণা করেছিলেন এ খেলাটি দেখাতে পারেন এমন যাদুকর পেলে—তিনি ভারতীয়ই হন বা অভারতীয়ই হন—তিনি তাঁর এই খেলা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে দক্ষিণা দেবেন প্রতি মাসে এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা। এমন একজন যাদুকরের জন্য ম্যাস্‌কেলিন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ভারতব্যাপী অনুসন্ধান হয়েছিলো, কিন্তু বৃথা।

তা যাই হোক, কিম্বদন্তীট এখনো মরেনি, কিম্বদন্তী সহজে মরে না। কিম্বদন্তীটি প্রথমে কি ভাবে শুরু হয়েছিলো তা অনুমান করা বোধ হয় খুব শক্ত নয়। গুজব কিভাবে ছড়ায় এবং তিল থেকে শুরু হয়ে শেষকালে কিভাবে তালে পরিণত হয়, তার উদাহরণ তো আমরা অনেক পেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে যাদুকর এ সি সরকার সম্পর্কে বছর খানেক আগে শোনা একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে তিনি নাকি পুরো একটি গীটার গিলে ফেলেছিলেন। "গীটার-কণ্ঠ যাদুকর" এ. সি. সরকার শুধু মাত্র কণ্ঠের সাহায্যে (অবশ্য মাঝে মাঝে ঠোঁটে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টোকা মেরে) চমৎকার গীটার বাজনা শোনান এবং নানারকম যাদুর খেলা দেখিয়ে তাক

স্লাগান জানতাম। অনুরোধে ঢেঁকি গেলার গল্পও শুনেছি, কিন্তু যাদুকর এ. সি. সরকার পুরো একখানা গীটার গিলেছেন এ গল্প গেলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। গল্পটি এক ভদ্রলোককে শুনিয়ে মন্তব্য করলাম, "এ গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি বোধ হয় বলবার সময়ে তরল পদার্থের নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন।"

তিনি বললেন, "না, সত্যিই এ. সি. সরকার পুরো গীটার গিলেছিলেন।" তারপর আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে যোগ করে দিলেন "কিন্তু কঠিন (solid) রূপে নয়, তরল রূপে।"

"কি রকম ?"

"গীটারের বাক্সো হাতে স্টেজে এলেন তিনি ; গীটারটি হাতে নিয়ে টুং টাং করে রেখে দিলেন বাক্সোর ভেতর। বাক্সোর একধারে জলের কলের মুখ লাগানো। তার তলায় একটা কাঁচের গ্লাস ধরে কলের মাথার প্যাঁচ খুলে দিতেই বাক্সোর ভেতর থেকে কলের মুখ দিয়ে রঙীন পানীয় এসে গ্লাসটা ভরে ফেললো। এক চুমুকে পান করে ফেললেন যাদুকর। একটু পরে বাক্সো খুলতেই দেখা গেলো ভেতর থেকে গীটার অদৃশ্য হয়ে গেছে। অর্থাৎ তরল হযে চলে গেছে যাদুকর এ. সি. সরকারের পেটে।"

"তারপব ?"

"ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনি গীটার তাঁর পেটে গিয়েও বাজতে শুরু করলো। অর্থাৎ গীটার-কণ্ঠ যাদুকর কণ্ঠে গী া বাজিযে শোনালেন।"

এইবার এ. সি সরকারের গীটার গেলার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। তিনি পুরো একটি গীটার "তরল করে" গিলেছেন', এ কথাটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলো 'তিনি পুরো একটি গীটার গিলেছেন' এই কথায়।

যাদু-খেলা সম্পর্কে এ ধরনের অনেক গুজব রটে, তার কিছু কিছু উদাহরণ আগেও দিয়েছি। "ভারতীয় দড়ির খেলা" সম্পর্কিত কিম্বদন্তীটি সম্ভবতঃ এই ধরনেরই গুজবের ক্রম-রূপান্তরিত পরিণতি।

"ভারতীয় দড়ির খেলা"টি বিভিন্ন 'নকল' রূপে রঙ্গালয়ের মঞ্চে (খোলা ময়দানে নয়) দেখিয়েছেন একাধিক বিশিষ্ট বিদেশী যাদুকর—হোরেস গোল্ডিন, সেসিল লাইল (Cecil Lyle), ম্যাসোনি ("The Great Masoni")

প্রভৃতি। কলকাতার একটি মিশ্র অনুষ্ঠানে যাদুকর ডাক্তার ৺কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ খেলাটি মঞ্চে দেখিয়েছিলেন।

এ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে "হিন্দু যাদুকর" (Hindoo Illusionist) রাজা বোস সেখানকার রঙ্গম.৺ জনৈক মার্কিন যাদুকরের প্রদর্শনীর অন্তর্গত "নীল মুক্তা অপহরণ" ("Theft of the Blue Pearl") নামে একটি ভারতীয় নাট্য-নক্শায় (Indian fantasy) 'ভারতীয় দড়ির খেলা'-র মঞ্চ-রূপায়ণে সহায়তা করেছিলেন।

কিন্তু এ খেলাটি খোলা ময়দানে দেখানো আর মঞ্চে দেখানোর ভেতরে লক্ষ মাইলের তফাত। মঞ্চে অনেক অদ্ভুত বিস্ময়ের সৃষ্টি সহজেই করা যায়, মঞ্চের বাইরে যা অসম্ভব।

* * * *

সম্প্রতি একদিন কলকাতার একটি ছোটো রাস্তা দিয়ে চলছিলাম—দেশপ্রিয় পার্কের অনতিদূরে। চলছিলাম কি একটা কাজের কথা ভাবতে ভাবতে। দেখলাম, ফুটপাথের ওপর ভিড় জমেছে এক জায়গায়। কৌতূহল হলো। ভিড়ের ভেতর না ঢুকে ভিড়ের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় ভিড়ের অন্য সকলের মাথা আমার চাইতে নিচু হওয়ায় সহজেই দেখতে পেলাম ভিড় জমেছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ঘিরে। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝামাঝি এক বছর আটেকের ছোট্টো ছেলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর ফাঁকা জায়গার একধারে ভিড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক ছোকরা মাদারি, অর্থাৎ পথে পথে ভ্রাম্যমাণ যাদুকর। ছোকরা যাদুকরের বয়স মনে হলো আঠারো কি উনিশ, বড় জোর কুড়ি। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কাপড়ের থলি—মাদারিদের যেমন থাকে—, যাদুর খেলার কিছু বিচিত্র সরঞ্জাম, সহৃদয় দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে দর্শনী সংগ্রহ করবার জন্য একটি থালা এবং একটি ডুগডুগি। শেষোক্তটি বাজিয়ে ভিড় জমাতে সুবিধে হয়; এটি হচ্ছে মাদারিদের ভিড় জমানো বাদ্যযন্ত্র। ভিড় জমে গেলেও কখনো কখনো ডুগডুগি বাজানো হয়ে থাকে রহস্য-উত্তেজনা বাড়াবার জন্য।

আমি যখন গেলাম, তার আগেই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে ফেলেছে ছোকরা যাদুকর। এবার শুরু হলো নতুন খেলা, এ খেলা হাত সাফাইয়ের খেলা বা কোনো রকম যান্ত্রিক কৌশলের খেলা নয়।

খেলার আসরের মাঝখানে চিৎ-শযান বালকটির চোখের ওপর পুরু কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো, কিছু যেন সে দেখতে না পায়। ছোকবা যাদুকর তারপর বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একটির পর একটি বিভিন্ন বকমের জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো, আর চোখ-ঢাকা ঐ বাচ্চা ছেলেটা চোখে কিছু না দেখেই প্রত্যেকটি জিনিস নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগলো। শুধু ভেতরে দাঁড়িয়েই নয়, ভিড়েব বাইবে এসেও ছোকরা যাদুকব কযেকজন ভদ্রলোকেব কাছ থেকে ফাউন্টেন পেন, নোট বই, রুমাল, পেন্সিল ইত্যাদি নিয়ে চেঁচিযে প্রশ্ন করতেই ভিড়ের আড়ালে শযান ছেলেটি প্রত্যেকটি জিনিসের এবং তাব মালিকেব চমৎকার বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলো। তরুণ যাদুকবেব প্রশ্ন এবং তাব ঐ বাচ্চা সহকাবীব জবাব অনেকটা এই ধবনেব :

"এটা কি ?"

"লিখ… জিনিস।"

"কি জিনিস ?"

"ফাউন্টেন পেন।"

"কি রং ?"

"লাল।"

"এই বাবু কি রকম ?"

"এ বাবু বহুৎ বঢ়িয়া। ছোটোখাটো, ফবসা।"

"আব ?"

"চোখে চশমা।"

"বাবু কি পোশাক পবে আছেন ?"

"ধুতি। পাঞ্জাবি। পায়ে স্যাণ্ডেল।"

"এ বাবুব পকেট থেকে কি নিলাম ?"

"নোট বই। নীল মলাটেব নোট বই।"

প্রশ্নোত্তরগুলি অবশ্য হিন্দীভাষায় হয়েছিলো ; আমি বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছি। খেলাটি দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ রয়ে গেলাম সেখানে। বাচ্চা ছেলেটির প্রতিটি জবাব নির্ভুল। সে যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে প্রশ্ন শোনামাত্রই অমন নির্ভুল জবাব দিচ্ছিলো কোন যাদুমন্ত্র বলে ?

ব্যাপারটা বিস্ময় উৎপাদন করারই মতো, কিন্তু তেমন বিস্মিত হতে দেখলাম না কাউকে। এ খেলায় ছুটি ছেলেরই—তরুণ যাত্নকরের এবং তার ঐ বাচ্চা সহকারীর যে কৃতিত্ব অসাধারণ, সেটা বুঝবার মতো সমঝদার সেই ভিড়ের ভেতর কেউ ছিলো না। সব সস্তা তামাসা-দর্শকের দল।

অথচ এই ধরনের খেলা দেখিয়েই অসামান্য খ্যাতি এবং অসামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে গেছেন পাশ্চাত্য যাত্ন-জগতে বিখ্যাত জ্যান্‌সিগ (Zancig) দম্পতি—জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ এবং অ্যাগ্নিস (Agnes) জ্যান্‌সিগ। এঁদের জীবন-কাহিনী চমৎকার রোমান্টিক।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ ডেনমার্কের লোক। গরীব পরিবারে তাঁর জন্ম। অন্য কোনো ভালো পেশায় বা ব্যবসায়ে যাবার মতো সঙ্গতি না থাকায় জুলিযাস লোহা গলাবার আর ঢালাই করবার কাজ শেখেন। কাজ শেখা হয়ে গেলে পর তিনি চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; স্বদেশ ডেনমার্কের চাইতে যেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশী।

মার্কিন দেশে গিয়ে জুলিয়াস দেখলেন ডেনমার্কের অনেক ভাগ্যান্বেষীর ভিড় সেখানে। এদেরই এক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হযে তিনি একটি বিকলাঙ্গ তরুণীকে দেখেই চমকে উঠলেন। মেয়েটি বিকলাঙ্গ, চেহারাও তার তাকিয়ে দেখবার মতো নয়, কিন্তু তবু যেন কি কারণে তার দিকে মন আকৃষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অনেক বছর আগে ডেনমার্কে দেখা একটি মেয়ের মুখ। সে মেয়েটির নাম ছিলো অ্যাগ্নিস। খুব ছোট বয়সে ভাব জমেছিলো জুলিযাস আর আগ্নিসের ভেতর, তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিযেছিলো। অ্যাগ্নিস মুছেও গিয়েছিলো জুলিয়াসের মন থেকে। বহুদিন পর বিদেশে এসে এই মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ খুব যেন চেনা চেনা লাগলো।

জুলিয়াস বললো, "অ্যাগ্নিস না?"

মেয়েটি বললো, "হ্যাঁ, আমি অ্যাগ্নিস।"

"আমি জুলিয়াস। মনে আছে আমার কথা?"

"আছে বৈকি। তোমাকে আমি দেখেই চিনেছিলাম।"

বিকলাঙ্গ, বিষণ্ণ মেয়ে অ্যাগ্নিস। রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো মেয়ে নয়। কিন্তু জুলিয়াসের শৈশবের প্রিযা অ্যাগ্নিস। হারিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলো তার কাছ থেকে, আবার কাছে এসেছে বিধাতারই বিধানে। জুলিয়াস দেখলেন

নিদারুণ দারিদ্র্যে দুরবস্থায় দিন কাটছে অ্যাগ্নিসের। একা, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ অ্যাগ্নিস। কোনো আকর্ষণ তার নেই, কে আসবে তার সঙ্গী হতে? অ্যাগ্নিসের প্রতি গভীর মমতায ভরে উঠলো জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের বুক, বহুদিন ভুলে থাকা পুরাতন প্রেম জেগে উঠলো নতুন করে। অ্যাগ্নিসের পাণি প্রার্থনা করলেন জুলিয়াস। মঞ্জুর হলো প্রার্থনা। জুলিযাস এবং অ্যাগ্নিস হলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতি।

একবার একটি সাহায্য-অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগ দেবার অনুরোধ এলো। গাইতেও জানেন না, বাজাতেও জানেন না। কি কববেন? তখন জুলিযাসেব মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। তিনি ভাবলেন গান-বাজনা, নৃত্য, বক্তৃতা— এসব তো মামুলি ব্যাপার; একটা নতুন কিছু দেখাতে হবে, যাতে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়। ভেবে ঠিক করলেন, "চিন্তা পবিচালনা"র (thought trans- feren[illegible] , [illegible]লা দেখিয়ে [illegible]মক লাগাতে হবে। দুজনে মিলে গোপনে অভ্যাস করা চললো।

তাঁদেব প্রথম প্রদর্শিত খেলা খুবই সাধাবণ হলেও অভিনবত্বের জন্যেই বেশ চিত্তাবর্ষক হলো। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা "চিন্তা পরিচালনা"ব খেলা দেখালেন। দর্শকদেব দেওযা এক একটি জিনিস হাতে নিযে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেন জুলিযাস, জুলিয়াসের মগজ থেকে সে চিন্তা পরিচালিত হয়—যেন বেতার তরঙ্গে—দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় অ্যাগ্নিসেব মগজে। আর প্রশ্ন করাব সঙ্গে সঙ্গেই প্র[illegible]কেটি জিনিস [illegible]না করে দেন অ্যাগ্নিস।

খেলাটি জনপ্রিয় করে তুললো এঁদের দুজনকে। কিন্তু [illegible]খনো তাঁরা এটা পেশারূপে গ্রহণ করবার কথা ভাবেননি। জুলিয়াস তখন কাজ করছেন এক লোহা ঢালাইয়ের কারখানায়। বিধাতা যাঁকে টেনে এনে বিখ্যাত করবেন যাদুজগতে, লোহা ঢালাইয়ের জগতে অখ্যাত হয়ে থাকতে তিনি পারবেন কেন? একদিন কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলো, গলানো লোহা হাতে পড়ে ভীষণ রকম আহত হলেন জুলিয়াস। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকে সেরে ওঠার পর ঠিক করলেন কারখানার ঐ বিপজ্জনক কাজে আর [illegible]রে যাবেন না। তার চাইতে অ্যাগ্নিসকে নিয়ে যে "চিন্তা পরিচালনা"র খেলা দেখাতেন, সেটাকেই দুজনে মিলে পেশারূপে গ্রহণ করবেন।

তাই করলেন। আরো মাথা খাটিয়ে তাঁদের প্রদর্শন-পদ্ধতিটিকে আরো ব্যাপক, আরো উন্নত করে তুললেন। চলে গেলেন কোনি আইল্যাণ্ড (Coney Island)। এই দ্বীপটি আমেরিকার একটি জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। এখানে সামান্য দর্শনীতে তাঁরা প্রতিদিন অনেকবার খেলা দেখাতেন। এখানেও বিধাতার লীলা। এখানেই একদিন তাঁদের খেলা দেখলেন বিখ্যাত যাত্নকর হোরেস গোল্‌ডিন (Horace Goldin)। অভিজ্ঞ, দূরদর্শী যাত্নকর গোল্‌ডিন সঙ্গে সঙ্গে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির এই খেলার অসামান্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তিনি উদ্যোগী হয়ে একদিন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির খেলা দেখাতে নিয়ে এলেন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত রঙ্গালয়-পরিচালক এবং প্রমোদ-ব্যবস্থাপক হ্যামারস্টেইনকে (Hammerstein)। ফলে হ্যামার-স্টেইনের উইণ্টার গার্ডেন থিয়েটারে কয়েকমাস খেলা দেখাবার সুযোগ পেলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতি। এতে আয় বাড়লো, খ্যাতি বাড়লো, কিন্তু তবু মন ভরলো না। যাত্নজগতের তীর্থক্ষেত্র লণ্ডনের আসর মাৎ না করা পর্যন্ত তাঁদের তৃপ্তি হবে না। রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনের অভিজাত 'আলহামরা' (Alhambra) রঙ্গালয়ে হলো তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। এতে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "ডেইলি মেল"-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ (Lord Northcliffe) এবং বিখ্যাত "রিভিউ অভ রিভিউজ" ('Review of Reviews) মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক উইকহাম স্টেড। অভিভূত হলেন দুজনেই। দুজনেই নিঃসন্দেহ হলেন, জ্যান্‌সিগ-দম্পতি সত্যি সত্যিই 'সাইকিক' (Psychic) বা আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী—এ ক্ষমতা তাঁদের ঈশ্বরদত্ত। এতে ছল, চাতুরি বা কৌশল কিছু নেই; সত্যি সত্যিই এঁদের দুটি মগজের চিন্তাপ্রবাহে সূক্ষ্ম আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরদিনই বহুলপ্রচারিত "ডেইলি মেল" কাগজে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হলো অসাধারণ আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির বিপুল প্রশস্তি। সারা ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়ে গেলো "এই অসাধারণ দম্পতি"-র খ্যাতি। নিশ্চিত হয়ে গেলো তাঁদের অসামান্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এই অসামান্য মূল্যবান প্রচারের ফলে।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ আমেরিকায় মারা যান ১৯২৯ সালে। তার আগে সস্ত্রীক এই 'আত্মিক' শক্তির খেলা দেখিয়ে তিনি বহুলক্ষপতি হয়েছিলেন।

লর্ড নর্থক্লিফের মতো বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি জ্যান্‌সিগের এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে খাঁটি 'আত্মিক' (psychic) শক্তি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এবং তাঁর বহুলপ্রচারিত খবরের কাগজের মারফত জ্যান্‌সিগের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারিদিকে। জ্যান্‌সিগ স্বীকার করতেন তাঁর বিপুল সাফল্যের মূলে লর্ড নর্থক্লিফের এই মহামূল্যবান সহায়তা।

আসলে কিন্তু জ্যান্‌সিগ-দম্পতির ক্ষমতা ঠিক অলৌকিক বা আত্মিক ছিলো না—অবশ্য অসাধারণ স্মরণশক্তিকে যদি 'সাইকিক' (psychic) বা অলৌকিক আত্মিকশক্তি বলা না হয়। জুলিয়াস এবং অ্যাগ্নিসের ভেতর এমন ব্যাপক 'কোড' (code) বা গুপ্ত সংকেত-ব্যবস্থা ছিলো, যার সাহায্যে জুলিয়াস সংকেতের দ্বারা প্রায় যে কোনো জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ চোখ-বাঁধা অ্যাগ্নিসকে জানিয়ে দিতেন। চোখ দিয়ে দেখা অ্যাগ্নিসের দরকারই হতো না, গুপ্ত সংকেতে জুলিয়াস তাঁকে যে বিবরণ দিতেন, তা থেকেই অতি সহজে প্রত্যেকটি জিনিসের খুঁটিনাটি বর্ণনা করে যেতেন তিনি। সুতরাং এ খেলায় কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রয়োজন হয়নি—যদিও লর্ড নর্থক্লিফ এবং আরো অনেকে এঁদের অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী বলেই ভুল করেছিলেন, অন্য কোনো ভাবে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ভেবে। এ খেলায় প্রয়োজন হয়েছিলো শুধু বেশ ব্যাপক এবং জটিল একটি সংকেত-পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির অগুন্তি সংকেতের প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে মনে রাখার মতো অসামান্য স্মরণশক্তি। তার ওপর চমৎকার অভিনয়-ক্ষমতা এবং উপস্থিত-বুদ্ধি।

লণ্ডনের বিখ্যাত, জনপ্রিয়, হাল্‌কা ধরনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেড় হাজার পাউণ্ড দক্ষিণার বিনিময়ে জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ তাঁর গুপ্ত সংকেত-পদ্ধতিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে রহস্য ভেদ করে দেবার পরও জ্যান্‌সিগ-দম্পতির এই প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা বা সাফল্য কিছুমাত্র কমেনি। সম্ভবত সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে ("Answers") যখন জ্যান্‌সিগ দম্পতির গুপ্ত সংকেতের পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো, তার আগে থেকেই তাঁরা সেই পুরোনো পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নতুন পদ্ধতিতে খেলা দেখানো শুরু করেছিলেন।

এক মন থেকে অন্য মনে অতীন্দ্রিয়ভাবে (অর্থাৎ কোনোরকম ভাষা বা ইঙ্গিত ব্যবহার না করে একেবারে সরাসরি) চিন্তা পাঠানো বা সঞ্চারিত করে দেওয়ার

নাম 'মেণ্টাল টেলিপ্যাথি' (Mental telepathy)। জ্যানৃসিগ-দম্পতির অদ্ভুত কৃতিত্বে হাজার হাজার লোকের মনে বিশ্বাস হলো 'টেলিপ্যাথি' সত্যি সত্যিই সম্ভব। তাঁদের সংকেত-পদ্ধতি প্রকাশিত এবং আলোচিত হবার পরও অনেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি যে, তাঁদের প্রদর্শিত 'টেলিপ্যাথি' খাঁটি অতীন্দ্রিয় টেলিপ্যাথি নয়, নিতান্তই লৌকিক গুপ্ত কৌশলের খেলা, এবং আধুনিক যাদুক্রীড়ার পর্যায়ে পড়ে।

এ ধরনের খেলা বর্তমান যাদু-জগতে—অন্যদিক থেকে বিচার করে—'সেকেণ্ড সাইট' (Second Sight) বা 'দ্বিতীয় দৃষ্টি' নামে পরিচিত। 'দ্বিতীয় দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে দিব্য-দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, অর্থাৎ চর্মচক্ষুর সাহায্য ছাড়াই দেখা। ভাবটা যেন—চোখ বাঁধা অবস্থায় যাদুকরের সহকারী বা সহকারিণী তাঁর 'দ্বিতীয়' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির সাহায্যেই বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন।

প্রথমা পত্নী অ্যাগ্নিস মারা যাওয়ার ফলে জুলিয়াস জ্যানৃসিগ বেশ একটু দমে গেলেন। কিন্তু দমে থাকবার পাত্র নন জুলিয়াস। অ্যাগ্নিসের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য পেলেন 'আডা' (Ada) নাম্নী একটি মহিলাকে। আডা রাজী হলেন জুলিয়াসের জীবন-সঙ্গিনী এবং যাদু-সঙ্গিনী হতে। জুলিয়াস কিছুদিনের মধ্যে তালিম দিয়ে আডাকে তৈরি করে নিলেন। আবার শুরু হলো জ্যানৃসিগ দম্পতির মানসিক যাদু-প্রদর্শন। সাফল্য এলো বটে, কিন্তু আগের মতো নয়, কারণ জুলিয়াসের দ্বিতীয়া পত্নী আডা ব্যক্তিত্বে, উপস্থিতবুদ্ধিতে এবং অভিনয়-ক্ষমতায় অ্যাগ্নিসের কাছাকাছিও যেতে পারেননি।

জুলিয়াস জ্যানৃসিগের অসামান্য সাফল্যের মূলে তাঁর নিজের সাধনা ছিলো, একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, সৌভাগ্য এবং যোগাযোগই তাঁর বরাত খুলে দিয়েছিলো। সে সময়কার সেরা যাদুকর হোরেস গোল্‌ডিনের, এবং তাঁর মাধ্যমে প্রমোদ-জগতের বিখ্যাত প্রযোজক হ্যামারস্টেইনের এবং পরে বহুল প্রচারিত "ডেইলি মেল" পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফের নেকনজরে না পড়লে তিনি এতো খ্যাতি, এতো জনপ্রিয়তা, এতো অর্থ লাভ করতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ নিশ্চয়ই করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে একটু আগেই যাদের কথা বললাম, কলকাতার রাজপথের সেই কিশোর যাদুকর আর তার বালক সহকারীর কথা, যারা ফুটপাথে এই 'টেলিপ্যাথি' বা 'সেকেণ্ড সাইট'-এর খেলাই অতি চমৎকার দেখাচ্ছিলো

নিতান্তই বেরসিক অসমঝদার জনতার সামনে। ওরা ছিলো নিরক্ষর, গরীব, যাযাবর, নিতান্তই সাদাসিধে, সস্তা। ওদের কৃতিত্বে কেউ মুগ্ধ হচ্ছিলো না, বিনা পয়সার তামাশা দেখছিলো সবাই। কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওদের সেই খেলাই জমকালো, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত পরিবেশে, কোনো প্রখ্যাত প্রমোদ পরিবেশকের প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় প্রদর্শিত হলে তার কদর এবং আদর হতো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বিখ্যাত জ্যান্সিগ-দম্পতির খেলাও প্রথমে খুব সামান্য ধরনেরই ছিলো। সেই সামান্য শুরুতেই উৎসাহ পেয়ে তাঁরা তাঁদের সংকেতের পুঁজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে অসামান্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, উক্ত কিশোর যাদুকর তেমন উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তার ঐ বালক সহকারীর সহযোগিতায় ঐ সামান্য খেলাটিকেই আরো বাড়িয়ে তুলে অসামান্য করে তুলতে পারতো। ওর ভেতরে যে জুলিয়াস জ্যান্সিগের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিলো না, কে বলতে পারে ?

কয়েকটি কথা

এবারের মতো মুখ বন্ধ করাব আগে আগে-বলা কথার পুনরুক্তি যথাসাধ্য এড়িয়ে কয়েকটি কথা এলোমেলোভাবে বলি।

কিংবদন্তীতে বাঙালী যাদুকর আত্মারাম সরকারের নাম শোনা যায়। তিনি নাকি অলৌকিক শক্তিধর ভূতসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ভূত দিয়ে নিজের পালকি বওয়াতেন এবং শেষকালে ভূতের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় অলৌকিক যাদু নয়, লৌকিক যাদু—যাতে অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার নেই। তাই শুরু করি মার্কিন যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন-এর (Howard Thurston) ১৯০৬ সালে কলকাতায় যাদু-প্রদর্শন থেকে। থার্সটন এসেছিলেন তাঁর বিরাট দল এবং যাদু-প্রদর্শনী নিয়ে ভারত সফরে। চেহারা, ব্যক্তিত্ব, যাদুদক্ষতা, জাঁকজমক প্রভৃতি সব দিক দিয়েই থার্সটন ছিলেন অতুলনীয়। বাংলার যাদু-উৎসাহীদের যাদু-উৎসাহ বহুগুণ বেড়ে গেলো পৃথিবীর অন্যতম সেরা যাদুকরের খেলা দেখে। তাঁর তাসের খেলা এবং "শূন্যে ভাসমানা সুন্দরী" (Floating Lady) যাদুরসিকদের সব চেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছিলো। প্রমথ গাঙ্গুলি ছিলেন তখন কলকাতার বিশিষ্ট শৌখীন যাদুকর, "প্রফেসর লী" (Prof. Lee) নামে যাদুরসিক মহলে সুপরিচিত। বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ প্রমথ গাঙ্গুলি ছিলেন দামী পাথর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরূপে কলকাতার এক বিশিষ্ট মণিকার (Jeweller) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি তাঁর বাড়িতে একদিন যাদুকর থার্সটন এবং তাঁর দলের সবাইকে একটি পার্টি দিয়েছিলেন। "তাসের খেলার রাজা" (King of Cards) থার্সটন প্রফেসর লী-র তাসের খেলায় দক্ষতা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট কতকগুলো তাসের খেলার ক্রমপদ্ধতি (routine) দেখিয়ে দিয়ে যান। প্রফেসর লী পরে তাঁর যে সব যাদু-শিষ্যদের এই থার্সটনী তালিম দিয়েছিলেন তাঁদের ভেতর আমি পরিচিত হয়েছি প্রবীণ এবং যাদুমঞ্চ থেকে অবসর নেওয়া যাদুকর বাঁশরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হাতের দুদিক বারবার এদিক ওদিক উলটে পালটে সম্পূর্ণ খালি দেখিয়ে শূন্য থেকে তাসের পর তাস ধরা, চোখের পলকে হাতের তাস

হাওয়ায় বিলীন করে দেওয়া, দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে, এক হাতের তাস চোখের পলকে বায়ুপথে অদৃশ্যভাবে অপর হাতে চালান করা—এ হলো থার্সটনের পুরো খেলার বা রুটিনের খানিক অংশ মাত্র। বাঁশরীবাবুর বহুদিন অনভ্যস্ত হাতেও এরই রূপায়ণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলাম তাহলে স্বয়ং থার্সটনের হাতে পুরো খেলাটা কি অবিশ্বাস্য বিস্ময়েরই না সৃষ্টি করতো! আশ্চর্য থার্সটনের উদ্ভাবনী শক্তি! কোনো অলৌকিক মন্ত্র নেই, কোনোরকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই, নিছক হস্ত কৌশলের সাহায্যে এ কি বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি! থার্সটন (১৮৬৯-১৯৩৬) পাদ্রী হবেন বলেই ঠিক ছিলো, কিন্তু আলেকজাণ্ডার হাবম্যানের বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিলো (১৮৯৩), তাঁর জীবনেব একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিলো অদ্বিতীয় অবিস্মরণীয় যাদুকর হওয়া। এবং তাই-ই তিনি হযেছিলেন।

থার্সটন আসবার অনেক আগে থেকেই অবশ্য বাংলা দেশে—প্রধানতঃ কলকাতায়—যাদুর চর্চা চালু ছিলো। উনিশ শতকের শেষ বছরে ফরাসী দেশের রাজধানীতে একটি প্রদর্শনীতে বাঙালী যাদুকর সত্যচরণ ঘোষ যাদু প্রদর্শন করেও এসেছিলেন এবং বিদেশ থেকে কিছু মূল্যবান যাদু-যন্ত্রপাতিও আনিয়েছিলেন। তার আগে কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তখনকার বিশিষ্ট যাদুকর নবীনচন্দ্র মান্না এবং অম্বিকাচরণ পাঠকের উদ্যোগে উইজার্ডস্ ক্লাব (The Wizards' Club) নামে একটি যাদুকর সমিতি স্থাপিত হয়েছিলো। সে সময়ে বাংলায় যাদু-চর্চা সামান্যই হতো, যাদুকরদেব সংখ্যাও [illegible] খুবই কম। উইজার্ডস্ ক্লাবের প্রচেষ্টায যাদুচর্চার কিছু কিছু প্রসার হ[illegible] থাকে। প্রতিষ্ঠাতা দুজনের মৃত্যুর পর যাদুকর নারায়ণচন্দ্র মান্না উইজার্ডস ক্লাবের ভার নেন। নারাযণচন্দ্র মান্নার পুত্র, যাদুকর রাসবিহারী মান্না ("মান্না দি-গ্রেট") এবং অম্বিকাচরণ পাঠকের ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র পাঠক ১৯২১ সালে উইজার্ডস্ ক্লাবে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন। বিশিষ্ট যাদুকর প্রফেসর "রেনন" (রণেন দত্ত) ১৯২২ সালে হলেন এই ক্লাবের সর্বপ্রথম নির্বাচিত সভাপতি। সে সময়ে উইজার্ডস্ ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন গণপতি (তখনকার দিনে 'যাদু সম্রাট' নামে সম্মানিত), বিমল গুপ্ত (একাধারে অসাধার' যাদুশিল্পী, ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট, কৌতুকাভিনেতা, সংগীত শিল্পী এবং সংগীত শিক্ষক—একসঙ্গে এত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ বিরল), 'ওসাক রে' (অশোক রায়), গোলোকবিহারী ধর, 'গসেন'

(নন্তবাবু) প্রমুখ বাংলার বিশিষ্ট যাদুকরবৃন্দ। যাদুকর রাজা বোসও পবে এ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরে (১৯৪৮) এর সভাপতি ছিলেন। সে বছর ২২শে মার্চ সন্ধ্যায উইজার্ডস্ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায কলকাতার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যাদুকর রাজা ে. র পরিচালনায যে যাদু-প্রধান বিচিত্রানুষ্ঠান হযেছিলো, তাতে বিশিষ্ট যাদুক্রীড়া প্রদর্শকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর বেন (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), মেদিনীপুরের যাদুকর অমিযকৃষ্ণ দত্তের প্রিয শিষ্য সাংবাদিক যাদুকর নরেন বোস, চিত্র-শিল্পী যাদুকর দুর্গাপদ পাল, হস্তকৌশল-প্রধান ঘরোয়া খেলায এবং টাকার খেলায অপ্রতিদ্বন্দ্বী—টাকার খেলার জন্যই ভারতে৯ নেলসন ডাউন্‌স্ (Nelson Downs, King of Coins) নামে খ্যাত—'দুর্গাপতি', অর্থাৎ ৺দুর্গাপদ দাস ওরফে ৺ডি. পি. দাস, যাদুকর গণপতির স্নেহভাজন শিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ রাযচৌধুরী. "মান্না দি গ্রেট" এবং সর্বশেষ স্বনামধন্য রাজা বোস। সেই তাঁর সর্বশেষ মঞ্চে আবির্ভাব। সে বছরই তিনি বিদায় নিলেন ইহজীবনের মঞ্চ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পরই উইজার্ডস্ ক্লাব ভেঙে পড়লো বলা চলে।

বাংলায যাদু-চর্চার ইতিহাসে উইজার্ডস্ ক্লাবের স্থান উচ্চ সম্মানেব। এই ক্লাবেব পতাকাতলে সমবেত হযেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ যাদুকরবৃন্দ। এ ক্লাবের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য নরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক এখনো "ভোম্যাক" (Vomaque) নামে যাদু প্রদর্শন কবে বেড়ান। তিনি মঞ্চের বড় খেলা (stage illusions) এবং ছোটখাট ঘরোযা হস্তকৌশলপ্রধান খেলা (conjuring), উভযেই পারদর্শী। এ ক্লাবের আরেকজন বিশিষ্ট সভ্য প্রফেসব 'কুমাব' (গীতেন্দ্রনাথ কুমার)—১৯৩১ সালেব যাদু কুম্ভ মেলা প্রসঙ্গে যাঁর উল্লেখ করা হযেছে। তিনি সুদক্ষ যাদুকর, যাদু বিশেষজ্ঞ, যাদু-যন্ত্রপাতির নির্মাতা এবং যাদু-শিক্ষক। বৃহদায়তন মঞ্চ-যাদুপ্রদর্শনীর ক্ষেত্রে যাদুকর "কে. লাল" সম্প্রতি যে সাফল্য এবং জন-প্রিযতার রাজপথে এসে দাঁড়িযেছেন, প্রোঃ কুমারেব শিক্ষায় এবং পরিচালনাযই তা সম্ভব হয়েছে।

যাদুকর ক্লমিতি প্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্বর্গীয ডাঃ কালীকিংকর ব্যানার্জী, বি. এস-সি. এম. বি. প্রতিষ্ঠিত "আকর্ষণী"-র কথা। ডাঃ ব্যানার্জী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু ও দন্ত বিভাগে বহুদিন কাজ করে পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এ মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগ

দেন এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে থাকেন। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে তাঁর ব্যানার্জী ক্লিনিকে সন্ধ্যায় রোগী দেখা শেষ হবার পর শৌখীন এবং পেশাদার যাদু-রসিকদের বৈঠক এবং আলোচনা হতো। 'আকর্ষণী'র বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী (বর্তমানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেতার-শিল্পী 'কচি বাবু') এবং ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত (সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র)। 'আকর্ষণী'র মুখপত্র রূপে ডাঃ ব্যানার্জী ঐ নামেই (The Akarshani) যাদু-সংক্রান্ত একটি ইংরাজি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হওযায় দুটিরই অবলুপ্তি ঘটে। তাঁর উত্তরসাধক রূপে বাংলার বিশিষ্ট শৌখীন যাদুশিল্পী ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত বিভিন্ন সাহায্য-অনুষ্ঠানে (charity show) ডাঃ ব্যানার্জী উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বনে কয়েকটি খেলা নিয়মিত প্রদর্শন করেন। ডাঃ দাসগুপ্ত যাদুতে প্রথম উৎসাহিত হন পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট যাদুকর ৺গঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্তের যাদুর খেলা দেখে। ৺গঙ্গা-বাবুর পুত্র কে, এন, সেনগুপ্ত বর্তমান বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শৌখীন যাদুকর। ডাক্তার যাদুকর ব্যানার্জীর মতোই ডাক্তার যাদুকর দাসগুপ্তও প্রধানত সাহায্য অনুষ্ঠানেই যাদু প্রদর্শন করে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯৫০ সালে বাস্তহারা-দের সাহায্যার্থে কলকাতা নিউ এম্পায়ার হলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ যাদুপ্রদর্শনী যাদুরসিক মহলে বিশেষ উৎসাহের আলোড়ন এনেছিলো। নাড়ির গতি রুদ্ধ করে মানুষের জিভ কেটে জোড়া লাগাবার খেলা তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে দেখিয়েছিলেন ১৯৪২ সালে মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে। ডাঃ দাসগুপ্ত তাঁর যাদু খেলাগুলিকে প্রধানতঃ প্রচারধর্মী নাটকাকারে পরিবেশন করেন। ডাঃ দাস-গুপ্তের ভগ্নী ও শিষ্যা শ্রীমতী উমা দাসগুপ্তা, বি-এ, একজন বিশিষ্ট শৌখীন যাদুশিল্পী।

ডাক্তার যাদুকর প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী যাদুকর ডাক্তার প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যাদু-জগতে ইনি 'কার্ডো' (Cardo) নামে খ্যাত। ১৯০৭ সালে বারাণসী ধামে এঁর জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে একজন গুজরাটি যাদুকরের খেলা দেখে তিনি যাদুবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছে রুমালের রং বদলাবার খেলা শেখেন। পরে তাঁর বাবা লণ্ডনের বিখ্যাত গ্যামাজ কোম্পানী থেকে কিছু কিছু যাদুখেলার সরঞ্জাম আনিয়ে দেন। নয় বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম যাদু প্রদর্শন করেন তাঁর স্কুলে সরস্বতী পূজো উপলক্ষে। ১৬ বছর

বয়সে তিনি ডাক্তারি পড়তে ইংলণ্ডে যান, এবং সেখানে বিশিষ্ট যাদুকরদের সংস্পর্শে আসেন। বিলিয়ার্ড বলের খেলায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা দেখে হোরেস গোলৃডিন প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত যাদুকর মুগ্ধ হন। পরে তিনি সাত বছর ধরে যাদুকর ম্যাসকেলিন ও ডেভাণ্ট পরিচালিত বিখ্যাত যাদু-রঙ্গালয় ইজিপশিয়ান হলের সঙ্গে (Egyptian Hall) সম্পর্কিত থাকেন। শেফিল্‌ড শহরে তাঁর যাদুপ্রদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের যাদুরসিক যুবরাজ (পরবর্তী অষ্টম এডোয়ার্ড) তাঁকে একটি সিগারেট কেস উপহার দেন। ১৯৩২ সালে ভারতে ফিরে এসে ডাক্তার রূপে তিনি ভারতীয় সেনা বিভাগে যোগ দেন। সেখানে ডাক্তারি ছাড়া যাদুপ্রদর্শন করে চিত্তবিনোদন করাও তাঁর একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। গত যুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯—১৯৪৫) তিনি বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে পীড়িত এবং আহত সৈনিকদের যাদু দেখিযে মুগ্ধ কবে তাদেব দুঃখ ভুলিযে রাখতেন। ১৯৫২ সালে ডাঃ চট্টোপাধ্যায আবাব ভাবত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীব নানা স্থানে যাদু দেখিযে বেড়াচ্ছেন। ভাবতীয় জীবনধারার বৈশিষ্ট্য যাদু খেলাব মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই তাঁব প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য।

প্রবাসী বাঙালী যাদুকর প্রসঙ্গে মনে পড়েছে অমৃতবাজার পত্রিকাব 'প্যাটাব' (patter) খ্যাত রস-সাহিত্যিক শ্রীআশু দে-র (Asude) কথা। তিনি তাঁব কর্মজীবন কাটিয়ে এসেছেন বিহারে। পরে দিল্লীতে। যাদুবিদ্যা তাঁব শখেব ব্যাপার হলেও তাঁর যাদুর নেশা ছিলো প্রচণ্ড, এবং প্রথম শ্রেণীর যাদুকর হিসেবে সারা বিহারে তিনি খ্যাত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আর প্রবাসী নন, কলকাতা বাসী। দীর্ঘদিন যাদু প্রদর্শন থেকে বিদায় নিযেছেন, কিন্তু যাদু সম্পর্কিত আলোচনায় উৎসাহ তাঁর এখনো অসীম। কৌতুকরস-মধুর যাদু-প্রদর্শনে তিনি ছিলেন অনন্য। বাঙালীর যাদু-চর্চার ইতিহাসে আশু দে একটি স্মরণীয় নাম।

হাউয়ার্ড থার্স্টন প্রসঙ্গে শৌখীন বাঙালী যাদুকর প্রফেসর লী-র (প্রমথ গাঙ্গুলী) কথা বলেছিলাম। প্রফেসর লী-র অন্যতম যাদু-শিষ্য পুলকেশ চক্রবর্তী "পুলক্‌স্" (Pullocks) নামে যাদুর খেলা দেখিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাদু থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর শিষ্য যাদুকর সুশীল মুখোপাধ্যায় ছোটোখাটো হাতের খেলায় (Conjuring) পারদর্শী এবং বহুদিন ধরে বিভিন্ন মাদারি অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ভেলূকিওয়ালাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তাঁদের যাদু-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকটি কথা

যাত্নকর তকমাওয়ালা সাঁই-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর কাছ থেকেও অনেক শিখে নেবার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো।

বাঙালী যাত্নকরদের মধ্যে আরেকটি বিশিষ্ট নাম যতীন সাহা। যাত্নকর পি. সি. সরকারের মতো এঁরও জন্ম ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। ১৯০৭ সালে। পেশাদারী যাত্ন-প্রদর্শন ইনি করেছেন বটে, কিন্তু যাত্নকে একমাত্র বা প্রধান পেশা বলে গ্রহণ করেন নি। একটি বিখ্যাত পত্রিকার শিল্প-বিভাগে তিনি উচ্চ বেতনে শিল্পীপদে অধিষ্ঠিত। কয়েক বছর আগে যাত্ন থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর যাত্ন-প্রদর্শনী অত্যন্ত চিত্তা-কর্ষক এবং সুরুচিসম্মত ছিলো। যাত্ন-কৌশলের অসাধু প্রয়োগ করে অসাধু ব্যক্তিরা আমাদের কতভাবে ঠকাতে পারে এবং ঠকিয়ে থাকে, তারই ব্যাখ্যা করে যাত্নকর সাহা যে সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেছিলেন, তা বিশেষ মূল্যবান।

বৃহদায়তন যাত্ন-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্টেজ ইলিউশনিষ্ট (stage-illusionist) হিসেবে বাংলার যাত্নকর ডি, সি, দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। অল্পবয়সে তিনিও যাত্নকর গণপতির প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

যাত্নকর অশোক রায় যাত্ন-মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং "যাত্ন-চক্র" নামক বিশিষ্ট যাত্ন-সংস্থার মাধ্যমে যাত্ন-শিক্ষা এবং যাত্ন-চর্চার প্রচারে ও প্রসারে যত্নবান। তাঁর সম্পাদিত ইংরাজি মাসিকপত্র "Jadu" এবং বাংলা ত্রৈমাসিক "যাত্ন" কিছুদিন যাত্ন-চক্রের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছিলো। বর্তমানে তিনি "যাত্ন-বিজ্ঞান" ক্রমিক গ্রন্থমালা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

যাত্ন-চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন সেকালের বিশিষ্ট যাত্নকর প্রোফেসর এমিন সুরাবর্দি-র (যিনি মেদিনীপুরের বিখ্যাত সুরাবর্দি পরিবারের সন্তান হয়েও যাত্নকর বৃত্তি অবলম্বন করায় পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং যাত্নবৃত্তি ত্যাগ করার পরিবর্তে পারিবারিক পদবি বর্জন করেছিলেন) ভাগিনেয়, বাংলার বিশিষ্ট শৌখীন যাত্নকর মৌলভী মহম্মদ ফৈজুল কাদের। এঁর জন্ম কলকাতায়, ১৮৯৪ সালে। কয়েকবছর হলো যাত্নপ্রদর্শন থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। কৌতুকমধুর বিস্ময় সৃষ্টিতে এঁর কৃতিত্ব ছিলো অসাধারণ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে তিনি কোনো যাত্ন-গুরুর কাছে হাতে-কলমে যাত্নবিদ্যা শেখেন নি (মাতুল প্রোঃ এমিনের যাত্ন দেখে প্রেরণা পেয়েছিলেন মাত্র),

শিখেছেন লণ্ডনের যাদু-শিক্ষক রিউপার্ট হাউয়ার্ডের (Rupert Howard) যাদুশিক্ষার কোর্স (Course) আনিয়ে তারই সাহায্যে।

যাদুকর অশোক সরকার (প্রথম শ্রেণীর যাদুকরোচিত গুণের অধিকারী হয়েও তিনি কিছুদিন করেই যাদু-প্রদর্শন ছেড়ে দিয়েছিলেন) 'Magic' নামে একটি সুন্দর ইংবাজি যাদু-মাসিক প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৮ সালে, কিন্তু প্রথম সংখ্যাই তার শেষ সংখ্যা হযেছিলো। প্রোঃ কুমারের প্রকাশিত যাদু-মাসিকটিও (Magic India, January, 1953) একটি সংখ্যাই বেরিয়ে ছিলো। আর, পি. বোসের পরিচালনায় বাংলা "মাযা-জাল" এবং এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সম্পাদনায় "Magic Net" নামে ইংরাজি যাদু মাসিকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশাখ, ১৩৬৯ থেকে পুরুলিয়ার যাদুকর বি. দাসের সম্পাদনায় "ম্যাজিক" নামে একটি বাংলা যাদু-মাসিক প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় "যাদুবিদ্যা" গ্রন্থ লিখে গেছেন যাদুকর গণপতি। "ভেলকি ও ভোজবাজি" নামক বইটি তার অনেক আগে প্রকাশিত হযেছিলো; সেটি প্রফেসর হফম্যানের বিখ্যাত ইংরাজি যাদু-গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ। বাংলায় যাদু সম্পর্কে বই তারপর লেখেন যাদুকর পি. সি. সরকার, তারপর এ. সি সরকার। বাংলার প্রবীণতম জীবিত যাদুকর "রয় দি মিস্টিক" (সত্তর অতিক্রান্ত শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়) তাঁর বিচিত্র যাদু-জীবনের দীর্ঘ স্মৃতিকথা রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

বাংলার যাদু-জগৎ অবিস্মরণীয়ভাবে ঋণী যাদুকর গণপতির কাছে। তাঁরই দৌলতে যাদুবিদ্যা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনগণের কল্পনাকে নাড়া দিয়েছিলো। 'গণপতি' আর 'যাদু' দুটি শব্দ সেকালে সমার্থবোধক হযে দাঁড়িযেছিলো জনমানসে। তাই বাংলা দেশে গণপতিকে আধুনিক যাদু-চর্চার জনক বলা যেতে পারে।

গণপতি-প্রবর্তিত ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, শুধু তাই নয়, প্রশস্ততর করে দিয়েছেন, বর্তমান ভারতের বৃহত্তম যাদুকর পি সি. সরকার। একালে 'সরকার' আর 'যাদু' জনগণের মনে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র যাদুনিষ্ঠা, অধ্যবসায, সংগঠনী ক্ষমতা, ঝুঁকি নেবার অদম্য সাহস, জনমনস্তত্বে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অসামান্য প্রচার-দক্ষতায় তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর বিপুল সাফল্যের মূলে এই এতগুলো গুণের সমন্বয়, যা একজনের ভেতরে খুব

কমই দেখা যায়। অর্থকরী পেশা হিসেবে যাদুবিদ্যা কতখানি সাফল্য এনে দিতে পারে, সামান্য শুরু থেকে অসামান্য পরিণতিতে পৌঁছে তিনি তার জলন্ত উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিজের জীবনে।

যাদু ও যাদুকর সংক্রান্ত অসামান্য কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কাহিনী, এবং একাধিক বিষয়ের আলোচনা, বর্তমান গ্রন্থে স্থানাভাবে দেওয়া গেলো না; অনেক কথা এবং অনেকের কথাও খুব সংক্ষেপে সারতে হলো। আগামী গ্রন্থে তাদের যথাসাধ্য এবং যথাযোগ্য পরিবেশনের বাসনা রইলো।

সর্বশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্য এবারকার মতো শেষ করবো। আমরা 'শিক্ষিত' সমাজে যে যাদুবিদ্যার চর্চা করি তা প্রধানত পাশ্চাত্য যাদু। ভারতীয় যাদু পদ্ধতির প্রতি আমাদের আরো মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের যে সব ভ্রাম্যমাণ যাদুকরেরা ('মাদারি') যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায় মাঠে-ময়দানে-পথের ধারে, ভারতীয় যাদুর ধারা ওরাই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অনাদরে অবহেলায় ওদের এই ধারা যেন লুপ্ত হয়ে না যায়, যাদুকর এবং যাদুরসিক সমাজের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও নাটককে যেমন স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন, ভারতীয় যাদু-শিল্পকেও তেমনি মর্যাদা দিন, এই প্রার্থনা জানিয়ে এবারের মতো বিদায় নিলাম।